সেবা
প্রকাশনী
রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম
৪/১

ভলিউম ৪

প্রথম খন্ড

তিন গোয়েন্দা

১৯, ২০, ২১

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
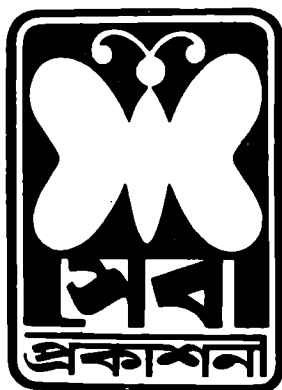
ISBN 984 - 16 - 1301 8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তেত্রিশ টাকা

Volume-4
Part-1
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সস্তায় তিন গোয়েন্দার বই

ভলিউম: একের মধ্যে তিন

ভলিউম ১(১ম খণ্ড)
তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা
ভলিউম ১(২য় খণ্ড)
ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো
ভলিউম ২(১ম খণ্ড)
প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত
ভলিউম ২(২য় খণ্ড)
জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, সবুজ ভূত
ভলিউম ৩(১ম খণ্ড)
হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি
ভলিউম ৩(২য় খণ্ড)
কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি
ভলিউম ৪(১ম খণ্ড)
ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১, ২
ভলিউম ৪(২য় খণ্ড)
ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব
ভলিউম ৫
ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল
ভলিউম ৬
মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর
ভলিউম ৭
পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ
ভলিউম ৮
আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ
ভলিউম ৯
পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল

ভলিউম ১০
বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১
ভলিউম ১১
অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো
ভলিউম ১২
প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া
ভলিউম ১৩
ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু
ভলিউম ১৪
পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন
ভলিউম ১৫
পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর
ভলিউম ১৬
প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ
ভলিউম ১৭
ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ
ভলিউম ১৮
খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড
ভলিউম ১৯
বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া
ভলিউম ২০
খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ
ভলিউম ২১
ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার
ভলিউম ২২
চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত

ভলিউম ছাড়া আলাদা ভাবে স্টকে আছে:

জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো ও উল্কি রহস্য ও নকশা।

ছিনতাই

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৮৮

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন।

সাউথ আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানে চড়ল তিন গোয়েন্দা, সঙ্গে জরজিনা পারকার, যাবে দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিরোতে। এবার ছুটিতে ব্রাজিল দেখবে ওরা। সমস্ত খরচ দিয়েছেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার, এটা তার তরফ থেকে জিনার জন্মদিনের উপহার।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্লেনে নিউইয়র্ক এসেছে ওরা, এখানে প্লেন বদল করতে হয়েছে।

বসার জায়গা দেখিয়ে দিল সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস।

সবাই হাসিখুশি, তবে জিনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, রাফিয়ানের জন্যে দুশ্চিন্তা। মানুষের সঙ্গে একসাথে যাওয়ার নিয়ম নেই, প্লেনে জন্তু-জানোয়ারের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'আমার কুকুরটাকে ঠিকমত তোলা হয়েছে, জানেন?'

'কিচ্ছু ভেব না। তোমাদের মতই আরামে যাবে কুকুরটাও,' আরেকটা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল স্টুয়ার্ডেস।

আশ্বস্ত হলো জিনা। নরম গদিমোড়া সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে চারদিকে তাকাল। জানালার ধারে বসেছে সে। তার পাশে মুসা আমান। ওদের পেছনের সীটে কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড।

যাত্রীরা সব অল্পবয়েসী, কিশোর-কিশোরী, কিংবা আরও ছোট। স্কুল লেভেলের ওপরে কেউ নেই। সবারই ছুটি, কেউ পেয়েছে জন্মদিনের উপহার, কেউ বা পরীক্ষায় ভাল ফল করার প্রেজেন্ট—এই বেড়াতে যাওয়া।

হাসছে, কথা বলছে, উত্তেজনা আর খুশিতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কেউ, কেউ বা গান ধরেছে বেসুরো গলায়। কোলাহল, কলরবে মুখর করে তুলেছে বিরাট বিমানের বিশাল কেবিন।

'খাইছে!' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম নাকিরে বাবা?'

খানিক পর সবাইকে সীট-বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিল স্টুয়ার্ডেস।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল বিমান।

বিমান বন্দরের বড় বড় ভবনগুলো যেন ছুটতে লাগল জানালার পাশ দিয়ে।

আকাশে উঠল বিমান। যাত্রা হলো শুরু।

দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে এল শহর। নদী-নালা মাঠ-বন পেরিয়ে বেরিয়ে এল খোলা সাগরের ওপর। নিচে নীল আটলান্টিক।

শোনা গেল স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠ, চুপ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। সিনেমা দেখানো হবে।

কেবিনের সামনের দিকে ওপর থেকে সাদা পর্দা নেমে এল। নিভে গেল আলো। ছবি শুরু হলো।

সিনেমা শেষে এল খাবার।

খেয়েদেয়ে আবার জাঁকিয়ে বসে গল্প শুরু করল কেউ, কেউ মিউজিক শুনতে লাগল, কেউ ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ বা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। দিগন্ত-জোড়া বিশাল এক নীল চাদর যেন বিছিয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে ছোট-বড় দ্বীপগুলোকে দেখাচ্ছে সবুজ ফুটকির মত। খুব সুন্দর।

স্যান স্যালভ্যাডরে নামল বিমান।

স্টুয়ার্ডেস জানাল, এখানে কিছুক্ষণ দেরি করবে প্লেন, যাত্রীরা ইচ্ছে করলে নেমে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারে, চাইলে এয়ারপোর্ট ক্যাফেটেরিয়া থেকে কোকা কোলা কিংবা মিল্কশেক খেয়ে আসতে পারে। অনেকেই নামল।

তিন গোয়েন্দা বসে রইল, কিন্তু জিনা নামল। অনেকক্ষণ রাফিয়ানকে দেখেনি, আবার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে তার। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দেখে আসবে একবার।

ঠিকই বলেছে স্টুয়ার্ডেস, সত্যি, খুব আরামে রাখা হয়েছে কুকুরটাকে। তার কেবিনে রাফিয়ানই একমাত্র যাত্রী, আর কোন কুকুর কিংবা অন্য জানোয়ার নেই।

ফেরার পথে সরু গলিতে ধাক্কা লাগল একটা লোকের সঙ্গে। দোষটা কার বোঝা গেল না, দুজনেরই তাড়াহুড়ো। জিনা নাহয় উঠেছে কুকুর দেখতে, কিন্তু লোকটা কেন উঠেছে।

জিনা তাকে চেনে, নাম চ্যাকো। বাচ্চাদের দেখেশুনে রাখার জন্যে চারজন লোক দিয়েছে ট্র্যাভেল এজেন্সি, চারজন কেয়ার টেকার, চ্যাকো তাদের একজন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল চ্যাকো। 'দেখে চলতে পারো না?'

'আপনিও তো দেখে চলতে পারেন,' পাল্টা জবাব দিল জিনা।

ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, তারপর জিনাকে অবাক করে দিয়ে হাসল। মাথা নাড়ল আপনমনেই। নেমে চলে গেল একটা সিগারেটের দোকানের দিকে।

ফিরে এসে বন্ধুদেরকে জানাল জিনা।

মুসা আর রবিন দুজন দুরকম মন্তব্য করল।

'ও কিছু না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, যা-তা ব্যাপার নাকি। সব তো বিচ্ছু। ওর জায়গায় হলে আমার মেজাজ আরও আগেই খারাপ হয়ে যেত।'

'কিন্তু তবু,' মেনে নিতে পারছে না জিনা, 'ওভাবে না ধমকালেও পারত।'

'পরে তো আবার হেসেছে,' মুসা বলল। 'তুমিও তো ভাল ব্যবহার করোনি। ধাক্কা মেরেছ, তারপর ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা, মুখে মুখে আবার তর্ক করেছ। তারপরও মেজাজ ঠাণ্ডা হচ্ছে না তোমার। কে বেশি বদমেজাজী? জিনা, কিছু মনে করো না, এ-কারণেই লোকে পছন্দ করে না তোমাকে।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জিনা, 'ওই হারামীটার সঙ্গে আমার তুলনা করছ!'

'আহ্হা,' হাত তুলল কিশোর, 'গেল তো লেগে। জিনা এ-রকম যদি করো, আর কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।'

'কেন, মুসার দোষ দেখছ না? ও আমাকে বাজে কথা বলছে কেন?'

'বাজে বলছে কোথায়? ও-তো তোমাকে বোঝাচ্ছে।'

'থাক! অত বোঝার দরকার নেই আমার,' ঝটকা দিয়ে জানালার দিকে ফিরল সে, তাকিয়ে রইল বাইরে।

আবার ছাড়ল বিমান। নিচে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আলোকিত রাতের শহর। মাঝে আর কোন স্টপেজ ধরবে না, একেবারে রিও ডি জেনিরোতে গিয়ে নামবে প্লেন।

কমে এল কেবিনের শোরগোল, খানিক পরে থেমে গেল পুরোপুরি। হালকা মিউজিক আর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিনা এখনও।

মুসা সীটে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, রবিন ঢুলছে।

কিশোরের ঘুম আসছে না। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল। মন বসাতে পারল না। রেখে দিয়ে শেষে লোকগুলোর দিকে তাকাল। চারজন কেয়ার টেকার এক জায়গায় বসেছে।

চ্যাকো ব্যাটার চেহারা মোটেও ভাল না, ভাবছে কিশোর। মস্ত এক ষাঁড় যেন, গুঁতো মারার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। চারকোণা চোয়াল, আর কি বিচ্ছিরি চওড়া কপাল। ব্যাটার গায়ে মোষের জোর, সন্দেহ নেই, তবে মাথায় ঘিলু কম। বাচ্চাদের পাহারা দেয়ার জন্যে এমন একটা বাজে লোককে কি করে বাছাই করল এজেন্সি?'

দ্বিতীয় লোকটার নাম জিম। বয়েস বাইশের বেশি না। মোটামুটি সিরিয়াস লোক বলে মনে হলো কিশোরের। কারলোর মত ষাঁড় নয়, সুদর্শন। ধোপদুরস্ত পোশাক।

তৃতীয়জন ওরটেগা। বেঁটে, রোগা, চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী। ইংরেজিই বলছে, তবে তাতে কড়া বিদেশী টান, কথা বলার সময় খালি হাত নাড়ে।

'পর্তুগীজ নাকি?' ভাবছে কিশোর। 'ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ। লোকটার কথায়ও পর্তুগীজ টান, ভাষাটা জানে বলেই বোধহয় তাকে বাছাই করা হয়েছে।'

চতুর্থ লোকটার নাম হেনরিক। কিশোরের মনে হলো, ওই একটিমাত্র লোক

সত্যিকারের কেয়ার টেকার, বাচ্চাদের কিভাবে সামলাতে হয় জানে। সারাটা দিন ওদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, ক্লান্ত হয়ে ঢুলছে এখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

অন্য তিনজনের দিকে চোখ ফেরাল আবার কিশোর। তাদের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। 'এত উত্তেজিত কেন ওরা?' ভাবল সে। 'কোন কিছুর অপেক্ষায় আছে?'

হাই তুলতে শুরু করল কিশোর।

হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল তার। লাউডস্পীকারে বেজে উঠেছে ক্যাপ্টেনের গমগমে কণ্ঠ। 'গুড মর্নিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রিও ডি জেনিরোতে নামছি আমরা। দয়া করে...'

কথা শেষ হলো না, থেমে গেল আচমকা, বিচিত্র কিছু ফিসফাস আর খুটখাট শোনা গেল স্পীকারে।

অবাক হলো কিশোর। কিসের শব্দ? যন্ত্রটন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন?

দেখল, চ্যাকো আর জিম নেই, ওরটেগা দাঁড়িয়ে আছে ককপিটের দরজার কাছে। পাহারা দিচ্ছে যেন। দৃষ্টি চঞ্চল, একবার কেবিনের দিকে তাকাচ্ছে, একবার দরজার দিকে।

তাজ্জব ব্যাপার তো! এমন করছে কেন?

একজন স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে কথা বলছে হেনরিক। দুজনকেই চিন্তিত মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ লেগে থাকা হাসি উধাও স্টুয়ার্ডেসের মুখ থেকে। বার বার তাকাচ্ছে স্পীকারের দিকে, হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ আন্দাজ করতে চাইছে।

শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, 'যাই, দেখে আসি কি হলো?'

কিন্তু তাকে ককপিটে ঢুকতে দিল না ওরটেগা।

'যাওয়া যাবে না,' এত জোরে বলল, কেবিনের সবাই শুনতে পেল। 'সীটে গিয়ে বসুন।'

বোকা বনে গেল স্টুয়ার্ডেস। ঢোক গিলে বলল, 'কাকে কি বলছেন? যাওয়া যাবে না মানে? যান, সীটে গিয়ে বসুন। এখানে আসার অনুমতি নেই আপনার, বেআইনী কাজ করছেন।'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। 'কেন বাজে বকছেন? যান, গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপ করে বসুন।'

মৃদু গুঞ্জন যেন ঢেউয়ের মত বয়ে গেল যাত্রীদের মাঝে।

ওরটেগার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল।

স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফেরাল সে নলের মুখ।

দুই

'কি করছেন আপনি, জানেন?' জোর নেই স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠে।
জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ওরটেগা।
ককপিটের দরজায় দেখা দিল চ্যাকো, তার হাতেও পিস্তল।
আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের। ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল, 'হাইজ্যাকার!'
গুঞ্জন বাড়ল। চেঁচিয়ে উঠল একজন। কি হচ্ছে, জানতে চায়। তার সঙ্গে গলা মেলাল আরও কয়েকজন।
লাফিয়ে উঠল হেনরিক। 'কি করছ? ভয় দেখাচ্ছ কেন ছেলেমেয়েদের। এসব রসিকতার কোন মানে হয়?'
এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিল চ্যাকো। 'না, হয় না। কিন্তু রসিকতা করছি না, এটা আসল। বসে থাকো চুপচাপ।'
তর্ক করে লাভ হবে না, বুঝল হেনরিক, আর কথা বাড়াল না।
আতঙ্কিত ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরল চ্যাকো। 'শোনা খোকাখুকুরা,' কর্কশ কণ্ঠ মোলায়েমের ব্যর্থ চেষ্টা করল, 'অনুমান করতে পারছ কিছু?'
'হাইজ্যাক!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্লেন হাইজ্যাক করেছ।'
মুসার বলার ধরন পছন্দ হলো না চ্যাকোর, হাসল বটে, কিন্তু চোখ দুটো শীতল। 'ঠিক ধরেছ। এখন ভাল-মন্দ তোমাদের ওপর। আমাদের কথা শুনলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। যেখানে আছ, থাকো, যা করছিলে করো। গল্প করো, পড়ো, কিংবা মিউজিক শোনো।'
কেবিনে বেরিয়ে এল জিম।
তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল চ্যাকো, 'ওদিকে সব ঠিক আছে?'
'আছে। ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট, রেডিওম্যান, কেউ গোলমাল করবে না।'
'কি করেছ ওদের?' আবার সীট থেকে উঠতে শুরু করল হেনরিক।
'বসো,' পিস্তল নাচাল চ্যাকো।
'মারিনি, বেঁধে রেখেছি। যাতে নড়তে না পারে,' জিম বলল।
'তাহলে কি…'
'হ্যাঁ, অটোমেটিক পাইলটে চলছে প্লেন। এখানকার অবস্থা দেখতে এসেছি। সবাইকে শান্ত করে গিয়ে কন্ট্রোল হাতে নেব। আমিই চালাব প্লেন। চ্যাকো, সরাও।'
সীটের মাঝের গলিপথে আর কেবিনের পেছনে স্থির হয়ে আছে স্টুয়ার্ড-স্টুয়ার্ডেসরা। ওরটেগারের কাছে দাঁড়ানো একজন স্টুয়ার্ডেসের কাছে এগিয়ে গেল চ্যাকো। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'হাঁটো।'

বাথরুম আর রান্নাঘরে বিমানের সমস্ত কর্মচারীদের আটকে রেখে এল হাইজ্যাকাররা। তারপর জিম চলে গেল ককপিটে।

'চালাতে পারবে তো?' বিদ্রূপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। কিশোর বুঝল ওরকম করেই হাসে লোকটা।

'পারবে তো বলল,' জবাব দিল চ্যাকো।

'পারলে ভাল। আমাদের জীবন এখন ওর হাতে। হালকা টুরিস্ট প্লেন ছাড়া আর তো কিছু চালায়নি। এতবড় প্লেন সামলাতে পারলে হয়।'

কড়া চোখে তাকাল চ্যাকো। 'বেশি কথা বলো। জিম যখন বলেছে চালাতে পারবে, পারবেই। খামোখা ভয় দেখাচ্ছে বাচ্চাগুলোকে।'

হাইজ্যাকারদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না জিনা। রোমাঞ্চ ভাল লাগে তার। ভয় পায়নি। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রথম চমকটা কেটে গেছে। শত্রুদের ভালমত লক্ষ করছে এখন জিনা। চ্যাকোকে শুরুতে ভাল লাগেনি তার, নিষ্ঠুর মনে হয়েছে, কিন্তু এখন যতখানি খারাপ লাগছে না। আসলে দেখে যতটা মনে হয়, তত খারাপ নয় বিশালদেহী লোকটা।

একটু আগের কথা কাটাকাটির কথা বেমালুম ভুলে গেল জিনা, আস্তে করে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল মুসার গায়ে। 'কি ভয় পাচ্ছ?'

'ভয়? হ্যাঁ, তা-তো পাচ্ছিই। কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।'

'কি মনে হয়? দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার হবে, না?'

'তোমার কাছে দারুণ লাগছে। আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। হাইজ্যাকারদের বিশ্বাস নেই। আর আমরা এখানে ভাল থাকলেই কি? বাবা-মা চিন্তা করবে না?'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' পেছন থেকে বলল কিশোর। 'রেডিও অপারেটরকে বেঁধে রেখেছে। রিওর কন্ট্রোল টাওয়ার নিশ্চয় যোগাযোগের চেষ্টা করছে প্লেনের সঙ্গে। জবাব পাবে না।'

'হ্যাঁ,' রবিন একমত হলো। 'হাইজ্যাকের খবর সব সময়ই খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে খবর। বাবা, মা, সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা করবে।'

'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত ওরা কি করবে বলো তো?' জিনা বলল। 'ইস্, রাফিয়ান এখন এখানে থাকলে হত। ওরটেগা আর চ্যাকোকে কাবু করে ফেলতে পারতাম। আবার সব ঠিক হয়ে যেত।'

জবাব দিল না তিনজনের কেউ।

বেশি অবাস্তব কল্পনা করছে জিনা। কিন্তু কিশোর আন্দাজ করতে পারছে, কতখানি বিপদে পড়েছে ওরা। প্লেনের সমস্ত কর্মচারী আর যাত্রী এখন হাইজ্যাকারদের হাতের পুতুল, যেভাবে বলা হবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের গুঞ্জনে মনে হচ্ছে, হাজার হাজার মৌমাছি এনে ছেড়ে দেয়া

হয়েছে কেবিনে। কেউ আস্তে কথা বলছে, কেউ জোরে। বেশি বাচ্চা কয়েকজন ফোঁপাচ্ছে নিচুস্বরে, থামানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

সব আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল চ্যাকোর কর্কশ কণ্ঠ, 'এই, চুপ! শুনছ? চুপ! শোনো, আমার কথা শোনো।'

থেমে গেল গুঞ্জন।

'তোমাদের কারও কিচ্ছু হবে না,' বলল চ্যাকো। 'কি করব, সেটা পরে বলছি। কেন করেছি সেটা আগে শোনো। প্লেনটা আমাদের দরকার। কিছু মাল নিরাপদে কলাম্বিয়ায় পার করতে চাই। কাস্টমস গোলমাল করবে, তাই...'

'সোজা করে বলো না,' বাধা দিয়ে বলল ওরটেগা, 'কিছু মাল স্মাগল করব আমরা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল বাচ্চাদের। শুধু হাইজ্যাকারই নয়, চোরাচালানীর পাল্লায় পড়েছে ওরা।

'টাকা নেই আমাদের,' বলে গেল চ্যাকো। 'ভাড়ার পয়সাও নেই। ভাবলাম, একটা প্লেন হাইজ্যাক করতে পারলে কাজ হয়। ঝুঁকিটা নিয়েই ফেললাম। তিনজন কেয়ার টেকারের কাগজপত্র জাল করে তাদের বদলে আমরা উঠেছি, আসল লোকেরা রয়ে গেছে নিউইয়র্কে, এয়ারপোর্টের এক বাথরুমে, আটক। তাই কোন অসুবিধে হয়নি। সন্দেহ হয়নি কারও। বুঝতে পারছি, সফল হব, তবে তার জন্যে তোমাদের সহায়তা দরকার।'

'বাহ্, বড় বেশি আত্মবিশ্বাস দেখছি,' বলে উঠল হেনরিক। 'আমাকে আটকাওনি কেন?'

'তোমাকে এখানে দরকার ছিল। কেয়ারটেকারের ট্রেনিং আছে তোমার, আমাদের নেই। সবাই আনাড়ি হলে মুশকিল। ধরা পড়ে যেতাম,' বলল ওরটেগা।

'নতুন কাজ নিয়েছি ওই ট্র্যাভেল এজেন্সিতে,' বলল হেনরিক। 'এ-লাইনে এটাই প্রথম সফর। অন্য তিনজনকে চিনি না বলেই করতে পারলে।'

'সে-জন্যেই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি,' দরাজ হাসি হাসল চ্যাকো। 'যাকগে। ছেলেরা, যা বলছিলাম। রিওতেই নামব আমরা।'

রিও ডি জেনিরোতে প্লেন নামলে বাঁচার কোন উপায় হয়েও যেতে পারে, ভাবল মুসা।

'নামব,' বলে যাচ্ছে চ্যাকো, 'প্লেনের তেল নেয়ার জন্যে। আর কিছু খাবারও দরকার আমাদের। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলছে ক্যাপটেন, আমাদের কি কি দরকার, জানাচ্ছে। নেমে সব তৈরিই পাব আমরা। এখন আসছি আসল কথায়। শুধু বিমানটা দরকার আমাদের। এর স্টাফ আর যাত্রীদের নামিয়ে দেয়াই বরং আমাদের জন্যে নিরাপদ, ঝামেলা অনেক কমে যাবে।'

ওরটেগা হয়তো ভাবল, এরপরের বিশেষ কথাগুলো তার নিজের বলা দরকার, তাই চ্যাকোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কাজেই, তোমাদের কোন ভয়

নেই। তোমরা গোলমাল না করলে আমরাও করব না। নামিয়ে দেব জায়গামত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাত্রীরা। গুঞ্জন শুরু হলো।

নিচু কণ্ঠে বন্ধুদের বলল মুসা, 'ব্যাটারা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ! যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে উঠবে পুলিশ।'

'আমার তা মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'এত সহজ নয় ব্যাপারটা। এসব ভাবেনি, এত বোকা নয় ওরা। কোন মতলব নিশ্চয় আছে।'

জানা গেল শিগগিরই।

'তবে,' হাত তুলল চ্যাকো, গুঞ্জন থামানোর জন্যে 'নিজেদের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আমাদের। তাই, অন্তত একজন জিম্মি রাখতে হবে।'

'জিম্মি' শব্দটা শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল যাত্রীদের মুখ। কার পালা?

'জিনা, হুঁশিয়ার!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'তোমার দিকে তাকাচ্ছে।'

কালো হয়ে গেল জিনার মুখ। চোখের পাতা কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে।

সরাসরি জিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চ্যাকো। হাসল। তারপর এগিয়ে এল ধীরে পায়ে।

'এই, তুমি উঠে এসো,' ডাকল চ্যাকো।

নড়ল না জিনা।

'কি হলো? আসছ না কেন? জলদি এসো।'

উঠল না জিনা।

এগোল চ্যাকো।

হাত তুলল মুসা। 'দাঁড়ান। জিম্মি হলেই তো হয় আপনাদের। আমি, আসছি।'

পেছন থেকে বলে উঠল রবিন, 'ওরা থাক। আমাকে নিন।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তা চলছে মাথায়।

উঠে দাঁড়াল জিনা, 'না না, কারও দরকার নেই। আমিই আসছি।'

ভুরু কুঁচকে গেছে চ্যাকোর। 'হ্যাঁ, তুমিই এসো। ছেলেদের দরকার নেই আমার। জিম্মি হিসেবে সুন্দরী কিশোরী খুব ভাল হবে। ছবি আর খবর ছাপা হলে নাড়া দেবে সবাইকে।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। 'মিস্টার চ্যাকো, আরেক কাজ করলে তো পারেন। আমরা চারজন এক জায়গা থেকে একই সঙ্গে বেরিয়েছি, আমাদের চারজনকেই নিন। জিম্মি বেশি হলেই তো বরং আপনাদের সুবিধে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল চ্যাকো। কি করবে বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না দেখে শেষে রেগে গেল নিজের ওপরই। ধমক দিয়ে বলল, 'বড় বেশি ফ্যাচফ্যাচ করছ তোমরা। এটা কি সিনেমা পেয়েছ নাকি? বেশি জিম্মি রাখলে ঝামেলা বেশি, একজনকেই রাখব। যাকে নেব ঠিক করেছি, তাকেই শুধু। এই মেয়ে, এসো।'

মুসার সামনে দিয়ে গলিতে বেরিয়ে এল জিনা।
তার হাত ধরতে গেল চ্যাকো।
ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল জিনা। 'খবরদার, ষাঁড়, গায়ে হাত দেবে না! চলো, কোথায় যেতে হবে।'
পিস্তলের ইশারায় ককপিট দেখাল চ্যাকো। 'ওখানে। জিমের পাশে চুপ করে বসে থাকবে।'
ককপিটের দরজা খুলে দিল ওরটেগা। জিনা ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ করে দিল।
'শোনো তোমরা,' যাত্রীদের বলল চ্যাকো, 'সীট-বেল্ট বেঁধে নাও। একটু পরেই ল্যাণ্ড করব। কোন চেঁচামেচি নয়, ধাক্কাধাক্কি নয়। সিঁড়ি দিয়ে একজনের পেছনে একজন নেমে যাবে, শান্তভাবে। আমি আর ওরটেগা পিস্তল নিয়ে পেছনে থাকব। কেউ শয়তানী করলেই গুলি খাবে। পুলিশকে বলবে, ওরা কিছু করার চেষ্টা করলে জিম্মি মেয়েটা মরবে। বুঝেছ? আই রিপীট, মরবে!'

তিন

নীরবে সীট-বেল্ট বেঁধে নিল যাত্রীরা।
এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, টুঁ শব্দ করল না কেউ। নিজেদের কথা ভাবছে ওরা, জিনাকে নিয়ে চিন্তিত নয়—তিন গোয়েন্দার কথা অবশ্য আলাদা। বিপদ যে সামান্যতম কমেনি, এটা বোঝার বুদ্ধি আছে ছেলেমেয়েদের। জিম যদি ঠিকমত প্লেন ল্যাণ্ড করাতে না পারে? যদি ক্র্যাশ করে? যদি নামার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করে পুলিশ?
নিচে রানওয়ে আর বিমান বন্দরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।
নামতে শুরু করল প্লেন। সবাই চুপ। প্রচণ্ড উত্তেজনা। ঠাণ্ডা এয়ারকুলড কেবিনেও দরদর করে ঘামছে অনেকে।
অবশেষে নিরাপদেই নামল বিমান। চারপাশ থেকে ছুটে এল অসংখ্য মূর্তি। তাদের মাঝে ইউনির্ফম পরা পুলিশও রয়েছে।
রেডিওতেই সমস্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে হাইজ্যাকাররা। প্লেনের ধারেকাছে যাতে কোন গাড়ি না আসে, বলে দিয়েছে। গাড়ি এল না। পুলিশদের হাতেও কোন অস্ত্র নেই। একটা বিশেষ দূরত্বে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা।
পরিকল্পনা মাফিকই হচ্ছে সব কিছু। একে একে নেমে গেল ছেলেমেয়েরা, খালি হাতে। তাদের মালপত্র সব রয়ে গেল বিমানে।
বিমানের কর্মচারীদের মুক্তি দেয়া হলো। তারাও নেমে গেল একে একে। কেউ কোন গোলমাল করল না। চ্যাকোর হাতে পিস্তল। ওরটেগা একটা সাব-মেশিনগান বের করে নিয়েছে। তার ওপর ককপিটে জিম্মি রাখা হয়েছে এক কিশোরীকে।

কাজেই কিছু করার চেষ্টা করল না কেউ।

খুব ধীরে ধীরে কাটছে জিনার সময়। দুঃস্বপ্নের মাঝে রয়েছে যেন সে। জিমের পাশে বসে ভাবছে, এরকম বিশ্রী অবস্থায় জীবনে কখনও পড়েনি। এখন পর্যন্ত খারাপ কিছু করেনি হাইজ্যাকাররা, কিন্তু চাপে পড়লে করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়?

জিনাকে অবাক করে দিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল জিম। আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। কোন ক্ষতি হবে না তোমার। দিন কয়েকের মধ্যেই মুক্তি দেয়া হবে।' হাসল সে। 'আমরা অমানুষ নই। বেআইনী কাজ হয়তো করছি, কিন্তু খারাপ লোক নই।'

'জেনেশুনে তাহলে করছেন কেন?'

'একবার খারাপ পথে পা দিলে, ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একটা প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন ক্লাবের ইনস্ট্রাকটর ছিলাম। গাধার মত একদিন ওখানকার ক্যাশ চুরি করে বসলাম। তারপর থেকে জড়িয়ে পড়লাম নানারকম অপরাধের সঙ্গে, আর ফিরতে পারলাম না। এখন তো অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।'

'কে বলল? আমার তা মনে হয় না। ইচ্ছে করলে এখনও ফিরতে পারেন, সময় আছে,' নরম গলায় বলল জিনা। 'সত্যি বলছি, যদি হাইজ্যাকার না হতেন, চোরাচালান না করতেন, আপনাকে আমি পছন্দই করতাম।'

হাসল শুধু জিম, জবাব দিল না। সামনে ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কি হচ্ছে, দেখল।

'একটু বাদেই উড়ব আবার,' বলল সে। 'আমাজনে প্লেন নিয়ে যেতে পারব আশা করছি। ওখানে ল্যাণ্ড করব। অস্থায়ী একটা রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে ওখানে।' একটু থেমে যোগ করল, 'আমাদের বন্ধুরা কাছেই থাকবে। অনেকদিন থেকেই ওরা স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত।'

অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল জিনা। যে কোন মুহূর্তে রিও ছাড়বে প্লেন, একা হয়ে যাবে তখন। বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। হঠাৎ করেই মনে পড়ল রাফিয়ানের কথা। আছে তো, না তাকেও নামিয়ে দিয়েছে? রাফিয়ান সঙ্গে থাকলে অনেক ভরসা পায় জিনা, বিপদে-আপদে সাহায্য পাবে।

জানালা দিয়ে দেখছে জিনা, বাইরে সবাই ব্যস্ত। অসংখ্য পুলিশ ঘিরে রেখেছে প্লেনটাকে, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙা সাপের অবস্থা হয়েছে ওদের, কিছুই করতে পারছে না। অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লেনে তেলভরা দেখছে শুধু।

বিমানের কর্মচারী আর যাত্রীরা ঢুকে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের মেইন বিল্ডিঙে, তাদেরকে ঘিরে রয়েছে এক ঝাঁক রিপোর্টার। নিশ্চয় তাদের মাঝেই রয়েছে কিশোর, মুসা আর রবিন।

আচ্ছা, কিশোর কি করছে? এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার ছেলে তো সে নয়। ক্ষীণ আশা হলো জিনার, কিশোর যখন মুক্ত রয়েছে, কিছু একটা সে করবেই।

জিনাকে উদ্ধার করার সব রকম চেষ্টা চালাবে, বুদ্ধি একটা ঠিক বের করে ফেলবে।

মুসা আর রবিনের কথা ভাবল। কি একেক জন সোনার টুকরো ছেলে। তাকে বাঁচানোর জন্যে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে বিপদে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। আর সে কিনা ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সারাক্ষণ ঝগড়া বাধিয়ে রাখে।

বাবা-মার কথা মনে পড়তেই চোখে পানি এসে গেল জিনার। তাঁরা ওকে কত ভালবাসেন, অথচ সে খারাপ ব্যবহার করে তাঁদের সঙ্গে। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিনা, আর কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করবে না। ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাল হওয়ার কথা তো পরে, আগে এখান থেকে বেরোতে তো হবে। মুক্তি পেলে তবে না···

ককপিটে ঢুকল চ্যাকো, তার পেছনে ওরটেগা।

'এবার যাওয়া যায়, জিম,' চ্যাকো বলল।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল প্লেন। দুরুদুরু করছে জিনার বুক। সময় অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

অবশেষে মাটি ছাড়ল প্লেন, দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল।

জিম ঘোষণা করল, 'অলটিচিউড বারো হাজার মিটার। স্পীড এক হাজার কিলোমিটার।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল চ্যাকো আর ওরটেগা।

'সেরে দিলাম কাজ!' হাসি ফুটল ওরটেগার মুখে। 'নিরাপদ। জিনাকে ধন্যবাদ। ওর জন্যেই কেউ পিছু নিতে সাহস করবে না।'

জিনাকে বলল চ্যাকো, 'ইচ্ছে করলে ঘোরাঘুরি করতে পারো। বলেছি না, তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

কেবিনের দরজা খুলে দিল সে।

জিনা বেরোল। চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা! তোমরা এখানে!'

চিৎকার শুনে দরজায় উঁকি দিল চ্যাকো। তাজ্জব হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই ছেলে তিনটে, জিনার বন্ধু। বোধহয় সীটের নিচে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। বেশ খুশি খুশি লাগছে ওদের।

'যাওনি?' কেবিনে নামল চ্যাকো।

'নাহ্,' যেন কিছুই না এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর। জিনাকে দেখিয়ে বলল, 'ও রয়ে গেছে। ফেলে যাই কি করে?'

'ছিলে কোথায়?'

'সীটের নিচে।'

'হুঁ, এত ব্যস্ত ছিলাম, গুণে দেখার কথা মনে হয়নি। তাছাড়া ভাবতেও পারিনি, ঝুঁকি নিয়ে কেউ রয়ে যাবে প্লেনে। শুধু বন্ধুর সঙ্গে থাকার জন্যেই রয়ে গেলে?'

'একসঙ্গে বেরিয়েছি,' রবিন বলল, 'একসঙ্গে যাব। বিপদের মোকাবেলা করতে হলেও একসঙ্গেই করব। একা রেখে গেলে ওর বাপ-মাকে গিয়ে কি জবাব দেব?'

প্রশংসা ফুটল চ্যাকোর চোখে। 'কাজটা বোধহয় ভাল করলে না। যাকগে, আমাদের কি? ঝামেলা বাড়ল বটে, কিন্তু সুবিধেও হলো।' নিজেকে বোঝাচ্ছে সে। 'একজন জিম্মির চেয়ে চারজন…'

'পাঁচ,' শুধরে দিল জিনা। 'যদি রাফিয়ানকে নামিয়ে না দিয়ে থাকেন?'

'রাফিয়ান?' কুঁচকে গেল চ্যাকোর ভুরু।

'আমার কুকুর। আপনার সঙ্গে যে ধাক্কা লাগল, ওকেই তখন দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি গিয়েছিলেন কেন?'

হাসল চ্যাকো। 'জানোয়ারের ঘরের পাশেই বিমানের ভাঁড়ার। অস্ত্রপাতিগুলো ওখানেই রেখেছিলাম।'

আর কিছু না বলে ককপিটে চলে গেল সে। জিম আর ওরটেগাকে খবরটা জানানোর জন্যেই হয়তো।

কিশোরের হাত ধরল এসে জিনা। 'থ্যা-থ্যাংকিউ…'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'যেন শুধু কিশোরই থেকেছে। আমরা থাকিনি?'

হাসল জিনা। মুসা আর রবিনেরও হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। ধন্যবাদ দিল বার বার। ওরা রয়ে যাওয়ায় সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে, জানাল নির্দ্বিধায়।

সহজ হয়ে গেল পরিবেশ।

পরের কয়েক ঘণ্টায় হাইজ্যাকারদের সঙ্গেও সম্পর্ক সহজ করে নিল চার অভিযাত্রী। বাবুর্চি আর স্টুয়ার্ডের দায়িত্ব নিল চ্যাকো। ট্রেতে খাবার সাজাতে গিয়ে ভুলভাল করে ফেলল। হেসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। দুজনে মিলে খাওয়া সরবরাহ করল সবাইকে।

জিমের পাশে খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল রবিন।

'থ্যাংকস,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিম। 'অন্ধকার হয়ে যাবে শিঘ্রী। তখন আর খেতে পারব না। এতবড় প্লেন এর আগে কখনও চালাইনি তো, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হচ্ছে।'

'তিনজনের কাজ একা করছ, আর কি?' সাহস দিল ওরটেগা। 'ভালই তো চালাচ্ছ।'

'আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে,' চ্যাকো বলল। 'পারবে তো?'

'চেষ্টা তো করতেই হবে,' বলল জিম। 'রেডিওতে যোগাযোগ করতে হবে ওদের সঙ্গে। নামার নির্দেশ চাইব। না না, এখন না, আরও অনেক পরে।'

'আমাদের কখন যেতে দেবেন?' জিজ্ঞেস কবল কিশোর। 'আমাজনের ওদিকে তো ঘোর জঙ্গল। সভ্য লোকালয় আছে?'

'ভেব না,' জবাব দিল ওরটেগা। 'জঙ্গলের মাঝে মিশনারিদের ক্যাম্প আছে। ওখানে দিয়ে আসব। ওরাই তোমাদের পৌঁছে দেবে লোকালয়ে।'

সংবাদটা বিশেষ আশাব্যঞ্জক মনে হলো না ছেলেদের কাছে, কিন্তু কি আর করা এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রাত নামল। জিনা বলল, 'এসো, ঘুমাই। দুশ্চিন্তা কমবে।'
কেবিনের সীটে বসে ঘুমানোর চেষ্টা করল ওরা।
সবাই ঘুমাল, কিন্তু জিনার চোখে ঘুম নেই। রাফিয়ানের কথা ভাবছে। কয়েকবার চ্যাকোকে অনুরোধ করেছে সে, রাফিয়ানকে কেবিনে নিয়ে আসার জন্যে। রাজি হয়নি চ্যাকো, কুকুর পছন্দ করে না।
সামনের দিকে একটা সীটে চ্যাকোর নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।
নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জিনা। চুপি চুপি চলল কেবিনের পেছন দিকে।
তখন প্লেনের পেছনের দরজা দিয়ে উঠেছিল রাফিয়ানের কামরায়। এদিকের পথ চেনে না। কিন্তু থামল না জিনা। একের পর এক দরজা খুলে উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। ভাঁড়ারটা পেল। চ্যাকো বলেছে, ভাঁড়ারের সঙ্গেই রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের ঘর।
কি করে জানি টের পেয়ে গেল রাফিয়ান, জিনা কাছাকাছি রয়েছে। বোধহয় গন্ধ পেয়েছে। চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল সে।
দরজা খুলে ছুটে গিয়ে রাফিয়ানের গা ঘেঁষে বসে পড়ল জিনা। পিঠে হাত বুলিয়ে, মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে আদর করতে লাগল। 'রাফি, কষ্ট পাচ্ছিস? তোর তো পাওয়ার কথা না। আরামেই আছিস। আমরাও অবশ্য খুব একটা খারাপ নেই, হাইজ্যাকাররা লোক ভাল। বুঝলি রাফি, এবার আর কোন রহস্যের সমাধান নয়। অ্যাডভেঞ্চার, পিওর অ্যাডভেঞ্চার।'
'হউ!' লেজ নেড়ে বলল রাফিয়ান, একমত হলো যেন জিনার কথায়। 'হউ! হউ!'
রাফিয়ানের মুখের দিকে তাকাল জিনা। 'ঠিক বলেছিস। অ্যাডভেঞ্চার মানেই অ্যাকশন। দাঁড়া, আগে নেমে নিই। তোর সাহায্যে হাইজ্যাকারদের ফাঁকি দিয়ে পালাব আমরা। ও হ্যাঁ, কিশোর, মুসা আর রবিনও আছে। আমাদের ছেড়ে যায়নি।'
'হউ!' বলল আবার রাফিয়ান।
কুকুরটার বাঁধন খুলে দিল জিনা। তাকে নিয়ে ফিরে এল কবিনে। কিন্তু নিজের সীটে পৌঁছার আগেই ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। তাল সামলাতে না পেরে, উল্টে পড়তে পড়তে একটা সীট খামচে ধরে সামলে নিল সে কোনমতে।
'হলো কি?' সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল জিনা।
জেগে গেছে চ্যাকো। লাফিয়ে উঠল।
ধাক্কার চোটে তিন গোয়েন্দাও জেগে গেল।
আবার কেঁপে উঠল বিমান, গা ঝাড়া দিচ্ছে যেন দুরন্ত ঘোড়া।
ককপিটের দিকে ছুটল চ্যাকো। ছেলেরা পিছু নিল।
রেডিওর কাছ থেকে উঠে গিয়ে জিমের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ওরটেগা, নজর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে জিম।

'কি হলো?' জিম উদ্বিগ্ন।

ফিরে তাকাল না জিম। এই সময় আবার কেঁপে উঠল প্লেন, প্রচণ্ডভাবে। সামান্য কাত হয়েই আবার সোজা হলো। 'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। 'কিছু একটা...'

কথা শেষ করতে পারল না, দুলে উঠল বিমান ভীষণভাবে।

সোজা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল জিম, কিন্তু এবার আর ঠিক হতে চাইছে না বিমান। 'গোলমাল একটা কিছু হয়েছে। কি, বুঝতে পারছি না। চালানোয় কোন ভুল হয়নি আমার।'

চ্যাকো আর ওরটেগার মুখ কালো। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন ছেলেরা। রাফিয়ানও উদ্বিগ্ন, অদ্ভুত কোন উপায়ে টের পেয়ে গেছে বিপদ।

'মরব না তো, জিম?' ওরটেগার গলা কাঁপছে। 'নামাতে পারবে তো?'

'কন্ট্রোল কথা শুনতে চাইছে না,' জিম জানাল। 'খারাপের দিকেই যাচ্ছে।' জোর নেই গলায়। 'জাদু তো আর জানি না, অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারব না।'

ঝাঁকুনি দিয়ে নাক নিচু করে ফেলল প্লেন। গাঢ় অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে মাটির দিকে ছুটে চলল।

চুপ করে রয়েছে ছেলেরা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের হাত ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন শক্তি সঞ্চয় করছে। রাফিয়ান জিনার পা ঘেঁষে রয়েছে।

কন্ট্রোলের ওপর আরও ঝুঁকে গেছে জিম। তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চ্যাকো আর ওরটেগা, আতঙ্কিত।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেরোল, কিন্তু ওদের মনে হলো, কয়েক যুগ।

অবশেষে মাথা সোজা করল জিম। 'জলদি গিয়ে সীটে বসে সীট-বেল্ট বাঁধো। ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। চলেছে জঙ্গলের ওপর দিয়ে, নামতে পারলে হয় এখন,' গোপন না করে সত্যি কথাই বলল সে।

সবাই বুঝল, বাঁচার আশা কম।

'আরে, মুখ অমন কালো করে রেখেছ কেন?' হাসার চেষ্টা করল কিশোর, সীট-বেল্ট বাঁধছে। 'আগেও বিপদে পড়েছি, উদ্ধারও পেয়েছি, নাকি?'

'কই, কালো কই? এই তো হাসছি,' কিন্তু জিনার হাসিটা কান্নার মত দেখাল।

সাধ্যমত চেষ্টা করছে জিম। অলটিমিটারের ওপর চোখ, প্লেনের নাক সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোজা হলে গতি অন্তত সামান্য কমবে, তাতে নাক সোজা করে মাটিতে গিয়ে গাঁথবে না প্লেন।

কিন্তু কথা শুনল না প্লেন, খামখেয়ালির মত চলেছে। নাক তো সোজা করলই না, বিপদ আরও বাড়ানোর জন্যেই যেন বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল একপাশে। কোথায় যাচ্ছে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জিম।

পাহাড়-টাহার নেই তো? তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না। পাহাড়ের

ধাক্কা খেলে···আর ভাবতে পারল না সে।

পরের কয়েকটা মুহূর্ত ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মাঝে কাটল যেন ওদের। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সামনে ঝুঁকে গেল সবাই, টান টান হয়ে গেল সীট-বেল্ট। আরও কাত হয়ে পুরো আধচক্কর ঘুরল বিমান, সোজা হলো সামান্য, পরক্ষণেই তার ধাতব শরীর ছেঁড়ার তীক্ষ্ণ চড়চড় শব্দ কানে এল। আরেকবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল—নাক নিচে, লেজ ওপরে তুলে।

আরও কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়ল না।

সবার আগে সামলে নিল জিনা। না না, ভুল হলো, রাফিয়ান। তাকে কোলে নিয়ে দুহাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে জিনা। তার গাল চেটে দিল কুকুরটা। লেজ নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খউ! খউ!'

'রাফি, সব ঠিক হয়ে গেছে, না?' দুর্বল লাগছে জিনার, সারা শরীর কাঁপছে। রাফিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে কাঁপা হাতে বেল্ট খুলল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলো নিভে গেছে। অন্যেরা ঠিক আছে তো?

এই সময় সাড়া দিল মুসা, 'আল্লাহ্রে! দুনিয়ায় আছি, না দোজখে?'

'মুসা, তুমি ভাল আছ?' উৎকণ্ঠায় ভরা জিনার কণ্ঠ।

'তা আছি। তবে দুনিয়াতে, না আল্লাহ্র কাছে, বুঝতে পারছি না। তুমি?'

'দুনিয়াতেই আছ। আমি ভাল। কিশোর আর রবিনের কি খবর?'

ওরাও সাড়া দিল, ভাল। তবে পুরোপুরি অক্ষত কেউই নয়, কমবেশি আহত হয়েছে সবাই। কারও চামড়া ছড়েছে, কেউ কনুই কিংবা হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে।

অন্ধকারে চ্যাকো আর ওরটেগার কথা শোনা গেল। ওরাও ঠিকই আছে বোঝা গেল। কিন্তু জিমের কি অবস্থা?'

ককপিটে গিয়ে ঢুকল তার দুই সহকারী। জিমের নাম ধরে ডাকল চ্যাকো। সাড়া নেই। বিড়বিড় করে কিছু বলে একটা টর্চ খুঁজে বের করে জ্বালল।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রয়েছে জিম। দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল ওরটেগা। না, মরেনি, বেহুঁশ হয়ে গেছে।

'কপাল কেটেছে। বাড়ি খেয়েছে ভালমতই।···এই যে, হুঁশ ফিরছে।'

চোখ মেলল জিম, আপনাআপনি হাত চলে গেল কপালের কাটায়। প্লেন অনড় হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে হাসল, 'পেরেছি তাহলে।'

'হ্যাঁ, পেরেছেন,' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর। ওরাও এসে ঢুকেছে ককপিটে। 'দারুণ দেখিয়েছেন। আগুন ধরছে না কেন এখনও?'

'আর ধরবেও না। ভাগ্য ভাল আমাদের। ধরলে নামার সময় ধাক্কা যখন লেগেছে, তখনই ধরে যেত।'

'প্লেনের বিশ্বাস নেই,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জিনা। ধরে যেতেও পারে। চলুন বেরিয়ে যাই।'

'না, ধরবে না,' বলল জিম। 'বাইরে যাব কোথায়? যা অন্ধকার, আর জঙ্গল।

কি বিপদ রয়েছে কে জানে। তার চেয়ে এখানেই আপাতত নিরাপদ। ভোরে উঠে বেরোব। তখন দেখব কোথায় পড়েছি, কিভাবে উদ্ধার পাব।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো কিশোর।

খুঁজে ফার্স্ট-এইড কিট বের করল জিনা। জিমের কপালের রক্ত পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

সীটগুলোকে মেলে বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ঘুমাতে পারলে ভাবনা অনেকখানি দূর হবে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারবে। তাছাড়া যা ধকল গেছে সারাটা দিন, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

কিন্তু নরম গদিতে আরামে শুয়েও সহজে ঘুম আসতে চাইল না। নানারকম ভাবনা ভিড় করে আসছে মনে।

সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার। বাইরে উজ্জ্বল দিন, জানালা দিয়ে আলো আসছে। আশেপাশে চেয়ে দেখল, তার বন্ধুরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। তিন হাইজ্যাকারের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেটে পড়ল নাকি?'

রেডিওর কাছ থেকে শোনা গেল ওরটেগার গলা, যন্ত্রটাকে গালমন্দ করছে। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়, চালু করতে পারছে না। টুঁ শব্দও তো করছে না। করি কি এখন?'

এই সময় হাজির হলো জিম আর চ্যাকো। বাইরে বেরিয়েছিল। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খবর ভাল না।

কিশোর, জিনা আর রবিনেরও ঘুম ভাঙল। ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল জিনা।

'খালি জঙ্গল,' জানাল জিম। 'তবে এই জঙ্গলই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের। কাদামাটি বেশি, জলাভূমিই বলা চলে। কলামবিয়ার বর্ডার থেকে দূরে, ইঁয়াপুরার কাছে রয়েছি, আমাজন এলাকার মধ্যে। সভ্যতা অনেক দূর। ওরটেগা, রেডিওর খবর কি? কাজ করছে?'

'না, ফিসফাসও করে না। ভাল আটকান আটকেছি। এ-থেকে বেরোতে পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'কাছেই একটা ছোট পাহাড় আছে,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'টিলা বলাই ভাল। ওতে চড়ে দেখা দরকার, কোন দিকে কি আছে। তারপর ঠিক করা যাবে কি করব।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' জিম বলল।

'আমরা আসি?' অনুরোধ করল কিশোর। 'হাত-পা সব শক্ত হয়ে গেছে, একটু নাড়াচাড়া দরকার।

হাত নাড়ল জিম। 'ক্ষতি কি? এসো।'

ওরটেগাকে রেডিওর কাছে রেখে বাকি সবাই নেমে এল বিমান থেকে।

চার

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেরা।

এমন জঙ্গল আর কখনও দেখেনি। বড় বড় গাছ, এত উঁচু আর এমনভাবে ডালপালা ছড়িয়েছে, সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না ঠিকমত। পায়েরতলায় ভেজা নরম মাটি, জলাভূমি বলা না গেলেও কাদাভূমি বলা চলে। তার ওপর সবুজ শ্যাওলা। কাদায় পা দেবে যায়। সাবধানে চলতে হচ্ছে। কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে চোরাকাদার মরণফাঁদ।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর মাটি শক্ত হয়ে এল।

যে পাহাড়টার কথা বলেছে চ্যাকো, আসলেই ওটাকে টিলা বলা উচিত। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে খুব সামান্যই উঠেছে। পাথুরে, খুদে কৃত্রিম পর্বত যেন। রাফিয়ান পাহাড়ে চড়তে পারে না বিশেষ, কিন্তু এটাতে চড়তে তারও অসুবিধে হলো না।

চূড়াটা চোখা নয়, বিশাল ছুরি দিয়ে পোঁচ মেরে কেটে ফেলা হয়েছে যেন, সমান। দাঁড়ানোর চমৎকার জায়গা। নিচে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারল না ওরা। অস্ফুট শব্দ করে ফেলল কেউ কেউ। ঠিক যেন তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়াপুর নদী, পুবে। নদীর দুই তীরে চওড়া চরা, হলুদ বালি চিকচিক করছে রোদে। তিন কিলোমিটার মত উঁচু উঁচু পাথরের চাঁইয়ের মাঝে ঢুকে হারিয়ে গেছে নদীটা। তার পরে ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড় শ্রেণী, মহান অ্যাণ্ডিজের বিশাল পার্বত্য এলাকা।

অপরূপ সে সৌন্দর্য থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে হলো। একে অন্যের দিকে তাকাল অভিযাত্রীরা, নীরবে। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। জীবনের সাড়া নেই। চারপাশে গাছপালার বিস্তারের মাঝে এমন জায়গায় হারিয়েছে ওরা, পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

'বললাম না, ভাল আটকান আটকেছি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'বেরোনোর পথ নেই। রেডিও খারাপ, এসওএস পাঠাতে পারব না। খাবার-দাবার যা আছে, খুব তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যাবে। তিন-চারজনের আন্দাজ নিয়েছিলাম, তাতেও বেশি দিন চলত না। তার ওপর আরও তিন-চারটে মুখ যোগ হয়েছে।' এমন ভাবে তাকাল সে, কুঁকড়ে গেল ছেলেরা।

কি আছে চ্যাকোর মনে? তাদেরকে এই জঙ্গলে ফেলে চলে যাবে না তো।

ছেলেদের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসল জিম, 'ভয় পেয়ো না। তোমাদের ফেলে যাব না। ভাগাভাগি না হয়ে জোট বেঁধে এই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করব।' পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বলল, 'ধরা যাক, আমরা ভ্রমণকারী, নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছি। হাহ্-হা।'

হাসল বটে জিম, কিন্তু তার চোখের উৎকণ্ঠা দূর হলো না।

নীরবে পাহাড় বেয়ে নেমে আবার ফিরে চলল ওরা।

বাতাসে আর্দ্রতা এত বেশি, অসহ্য মনে হচ্ছে গরম। চটচটে ঘাম, যেন আঠা মাখিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে। অস্বস্তিকর। ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে হিংস্র সব নাম-না-জানা জানোয়ার, যে কোন মুহূর্তে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

বিমানে ফিরে দেখল হতাশ হয়ে বসে আছে ওরটেগা।

'নাহ্, হলো না,' দেখামাত্র বলল সে। 'অনেক সময় লাগবে মেরামত করতে, আদৌ যদি মেরামত হয়। কয়েক দিন এমন কি কয়েক হপ্তাও লাগতে পারে। ততদিনে না খেয়েই মরে যাব।'

'এত ভেঙে পড়লে চলবে না,' জিম বলল। 'প্ল্যান করে এগোতে হবে। এখনই বাঁচার আশা ছেড়ে দিলে মরবই তো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাল ছাড়ব না কিছুতেই।' উপযুক্ত লোক জিম, নেতা হওয়ার গুণ তার আছে।

'প্লেনটা আমাদের হেডকোয়ার্টার,' বলল সে। 'এখান থেকেই আশপাশে অভিযান চালাব, পথ খুঁজে বের করব।'

'খাবারের কি হবে?' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠিক,' কিশোরও বলল, 'খাবার?'

'কিছু খাবার তো আছে। ওগুলো থাকতে থাকতে রেডিও ঠিক হয়ে গেলে, বেঁচে যাব।'

এরপর কাজে লাগল জিম। সব খাবার বের করে নিজের দায়িত্বে নিল। হিসেব করে খেতে হবে।

'ফুরিয়ে গেলে কি করব?' প্রশ্ন করল চ্যাকো।

'পানির ভাবনা নেই,' বলল জিম। 'নদীর পানি এনে ভালমত ফুটিয়ে খেলেই অসুখের ভয় থাকবে না। তবে হ্যাঁ, শিকার একটা বড় সমস্যা।'

কয়েকটা পিস্তল আর একটা সাব-মেশিনগান ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই হাইজ্যাকারদের কাছে। ফাঁদ পাততে জানে না। বলতে গেলে, জঙ্গলে টিকে থাকার কোন অভিজ্ঞতাই তাদের নেই।

আলাপে কান না দিয়ে নতুন রেডিও মেরামতে মন দিল ওরটেগা। বুঝতে পারছে, তাদের সবার জীবন এখন ওই যন্ত্রটার ওপর নির্ভর করছে, যে ভাবেই হোক সারাতে ওটাকে হবেই। কিন্তু এমন ভাঙা ভেঙেছে, সারানোও খুব কঠিন। কিছু স্পেয়ার পার্টস আছে প্লেনের যন্ত্রপাতির ইমারজেন্সি বক্সে। আর কিছু বদলাতে পারবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি থেকে খুলে এনে। কিন্তু তারপরেও ঠিক হবে তো? তেমন ভাল টেকনিশিয়ান নয় ওরটেগা।

কাজ মোটামুটি ভাগ করে নিয়েছে ওরা। চ্যাকো রান্না করে, তাকে সাহায্য করে রবিন আর জিনা। জিমের সঙ্গে শিকারে যায় মুসা, পাওয়া যায় না প্রায় কিছুই,

তবু রোজ বেরোয়। ওরটেগা রেডিও নিয়ে থাকে, তাকে সহায়তা করে কিশোর। রাফিয়ানও অকেজো থাকে না। শিকারে যায়, রাতে পাহারা দেয়। তার খাবারটা সে অর্জন করেই নেয়।

হাইজ্যাকার আর জিম্মিদের মাঝের ফারাকটা আর নেই, বন্ধু হয়ে গেছে ওরা।

কয়েক দিন চলে গেল, কিন্তু রেডিও ঠিক হলো না। হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ওরটেগা, 'আমার ক্ষমতায় কুলাবে না।'

'খাবারও ফুরিয়ে এসেছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'জিম, কিছু একটা করো। আর তো দেরি করা যায় না।'

কিছু একটা করা দরকার, তাড়াতাড়ি, সবাই একমত হলো এতে। কিন্তু কি করবে। রেডিও অচল, হাইজ্যাকাররা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। বাইরে থেকে সাহায্য আসার কোন আশা নেই। একটাই পথ আছে, বেরিয়ে পড়া। তারপর ভাগ্য ভাল হলে বাঁচবে, নইলে মৃত্যু। বিকল্প আর কিছু নেই।

খাবার যা অবশিষ্ট আছে গুছিয়ে নেয়া হলো। ফার্স্ট-এইড কিট, কয়েকটা কম্বল, রান্নার সরঞ্জাম আর আরও দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিস বেঁধে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল ওরা, বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

কয়েক দিন প্লেনটাই ছিল তাদের ঘর, এখন ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে। বার বার পেছনে ফিরে তাকাল ওরা। আর যাই হোক, নিরাপদ আশ্রয় তো অন্তত ছিল।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা, সাতজন মানুষ আর একটা কুকুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ইয়াপুরার তীরে।

কিশোর পরামর্শ দিল, 'নদী ধরেই এগোনো যাক। খাবার আর গোসলের পানি পাব। সবচে বড় কথা, পথ হারানোর ভয় থাকবে না। নদীর ধারে মানুষের বসতি থাকার সম্ভাবনাও বেশি।'

সবাই রাজি হলো। নদীর ধার ধরেই এগোল ওরা।

খোলা চরা, গাছপালার ছায়া নেই। কড়া রোদ। ভীষণ গরম। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ল সকলে। ঝামেলা বাড়াল রবিন। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে পায়ে ব্যথা পেল। ওই পা-টা অনেক দিন আগে একবার ভেঙেছিল পাহাড়ে চড়ার সময়, আবার চোট লাগল ওটাতেই। খোঁড়াতে শুরু করল সে।

জোর করে রবিনের বোঝা ভাগ করে নিল মুসা আর কিশোর।

দাঁতে দাঁত চেপে চলেছে জিনা। ঘোড়ায় চড়া আর ব্যায়ামের অভ্যাস আছে বলে হাঁটতে পারছে এখনও। মুসা কষ্ট সহ্য করতে পারে, কাজেই কিশোর কিংবা জিনার মত হাঁপিয়ে ওঠেনি সে।

বেচারা রবিনের অবস্থা করুণ। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, পায়ের গোড়ালি ফুলে গেছে, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবু টুঁ শব্দ করছে না, এগিয়ে চলেছে সবার সাথে, কিন্তু খুব মন্থর।

'ইস্‌সি, দেরি করিয়ে দেবে দেখছি,' বলল চ্যাকা।

রবিনের দিকে ফিরে হাসল জিম। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যতক্ষণ পারো, হাঁটো। না পারলে বয়ে নিয়ে যাব। ভয় নেই।'

রোদ যতই চড়ছে, গরমও বাড়ছে সেই অনুপাতে। দুপুরের দিকে তো মনে হলো, সেদ্ধ হয়ে যাবে একেকজন। থামল। কাপড় খুলে ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা।

একে একে সবাই নামল।

অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল ওরা। তারপর গাছের ছায়ায় খেতে বসল। ড্যাপসা গরম না থাকলে, আর পর্যাপ্ত খাবার থাকলে পিকনিক ভালই জমত।

বিকেলের দিকে যেন সহ্যশক্তির পরীক্ষা শুরু হলো। বিরূপ প্রকৃতি যেন দেখতে চায়, তার দাপট কতখানি সইতে পারে অভিযাত্রীরা। রাফিয়ানের পর্যন্ত জিভ বেরিয়ে গেল।

রবিনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ডাল কেটে, তাতে কম্বল বেঁধে স্ট্রেচার বানিয়ে বয়ে নেয়া হচ্ছে তাকে। খুব লজ্জা পাচ্ছে রবিন, নিজেকে দোষারোপ করছে। আছাড় খেয়ে পা ভাঙার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছে।

পায়ের মাংসপেশীতে খিঁচ ধরে গেছে জিনা আর কিশোরের। আধমন ভারি মনে হচ্ছে একেকটা পা।

সামান্যতম প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এ-এক অদ্ভুত জঙ্গল। ভয় ভয় লাগে। নীরবতা যেন ভারি হয়ে ঠাঁই নিয়েছে এখানে। কথা বলতে অস্বস্তি লাগে।

হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাত। সাঁঝ প্রায় হলোই না, এই দেখা গেল শেষ বিকেল, পরক্ষণেই ঝপাত করে রাত্রি।

'থামো,' বলল জিম। 'এখানেই রাত কাটাব।'

দিনটা যেমন গরম গেছে, রাতটা তেমনি ঠাণ্ডা হবে, গত কদিনে বুঝে গেছে ওরা। শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালল জিম। কয়েকটা কাঁচা ডাল কেটে তাতেও আগুন ধরাল। জ্বলবে ধীরে, ধোঁয়া হবে বেশি। মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এই ধোঁয়ায় কি আর মশা যায়? ভারি চাদরের মত ঝাঁক বেঁধে এসে অভিযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে রাতের খাওয়া সারল ওরা। সবাই বিষণ্ন। মন হালকা করার জন্যে রসিকতা করল কিশোর, 'আমি যখন দাদা হব, তিন কুড়ি নাতিপুতি হবে, তাদেরকে এই অভিযানের গপ্পো শোনাব। চোখ এত্তো বড় বড় করে শুনবে ওরা। বিশ্বাস করতে পারবে না। বাবা-মাকে গিয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করবে, সত্যি কিনা। ওরা ধমক দিয়ে বলবে, বাজে বকিস না। বুড়োহাবড়াটার সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেগুলোর মাথাও গেল। খালি মিছে কথা। হি-হি।'

কেউ হাসল না।

মুসা বলল, 'ইস্, কি আমার গল্পরে! তা-ও যদি ইনডিয়ানরা আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যেত, শেষে অনেক কষ্টে পালাতাম, নাহয় এককথা ছিল। প্লেন থেকে নেমে

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, রাতে মশার কামড় খাওয়া, হলো নাকি কিছু এটা? যা জঙ্গল, বাঘ তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও নেই।'

'এত বড় বড় কথা বোলো না,' অন্য ধার থেকে হুঁশিয়ার করল চ্যাকো। 'ইনডিয়ান নেই কে বলল তোমাকে? সিনেমায় যেমন দেখো, তেমনটি হয়তো নেই। কিন্তু যারা আছে, তারাও কম হারামী না।'

'আছে নাকি এদিকে?' চিত হয়ে ছিল, কনুয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো রবিন।

'আছে। জিভারো ইনডিয়ানদের এলাকা এটা।'

'জিভারো?' জিনা মুখ তুলল।

'হ্যাঁ, জিভারো। অনেক ইনডিয়ানদের মত ওরাও নরমুণ্ডের ট্রফি রাখে। যদি টের পায় আমরা আছি, চোখের পলকে এসে হাজির হবে। কিছু বোঝার আগেই দেখব আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

'থাক থাক, আর বলবেন না,' হাত নাড়ল মুসা। 'পরক্ষণেই হয়তো দেখব বর্শার মাথায় আমাদের কাটা মুণ্ডগুলো শোভা পাচ্ছে!' ভয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল সে। 'আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ *টক্কো, টক্কো* করে বিচিত্র একটা শব্দ হলো। ঝট করে জঙ্গলের দিকে তাকাল ছেলেরা। কিসের শব্দ?

'সর্বনাশ, জিভারো!' ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন চ্যাকো, এমনি ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, 'জঙ্গলের মধ্যে একজন আরেকজনকে সঙ্কেত দিয়ে জানাচ্ছে, শিকার পাওয়া গেছে।'

আবার শোনা গেল টক্কো টক্কো। আরও কাছে।

'আহ্, তোমরা কি শুরু করলে?' মৃদু ধমক দিল জিম। 'খামোকা ভয় দেখাচ্ছ ছেলেগুলোকে!'

'খামোকা ভয়?' জিমের কথা বুঝতে পারল না মুসা।

'জিভারো না ঘোড়ার ডিম, ওরটেগার শয়তানী···' কথাটা শেষ করল না জিম। 'এই, কম্বল খোলো। শোয়া দরকার।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' মুসার মত জিনাও অবাক। 'শব্দ তো একটা হয়েছে। সবাই শুনেছি আমরা। শয়তানীটা কিসের?'

'ভেনট্রিলোকুইজম!' বুঝে ফেলেছে কিশোর। 'ওরটেগা এই বিদ্যে জানে। আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে সে-ই করেছে ওই শব্দ।'

ও, এই ব্যাপার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মুসা। বুকে ফুঁ দিতে দিতে বলল, 'ইস্, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

কম্বলের বাণ্ডিল খুলছে ওরটেগা। শব্দ করে হাসল।

চ্যাকোও হাসল।

কম্বল খোলা শেষ হলে ওরটেগা ডাকল, 'এসো, শুয়ে পড়া যাক।'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল জিম। 'একজনকে পাহারায় থাকতে হবে। পালা

করে পাহারা দেব। ওরটেগা, শুরুতে তুমি থাকো। মাঝরাতের দিকে আমাকে তুলে দিয়ো। শেষরাতে আমি চ্যাকোকে তুলে দেব।'

'আমি আর মুসাও পাহারা দিতে পারব,' কিশোর প্রস্তাব রাখল।

'না না, দরকার নেই। তোমরা ঘুমাও। প্রয়োজন হলে বলব।'

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে ছেলেরা। জিনার গা ঘেঁষে আছে রাফিয়ান। চোখ বোজা, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই জেগে যাবে।

কিন্তু এতবড় একটা জঙ্গলেও জাগিয়ে দেয়ার মত কোন শব্দ ঢুকল না রাফিয়ানের কানে। খালি মশার বিরক্তিকর একঘেয়ে গান, আর আগুনে কাঠ পোড়ার মৃদু চড়চড় ছাড়া আর কোন আওয়াজই নেই। ও হ্যাঁ, আছে, নিঃশ্বাসের শব্দ। আর মশার ঘ্যানর ঘ্যানরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে চ্যাকো।

কমে আসছে দেখে আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলল ওরটেগা। পাহারা দেবে কি? সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে তার চোখও ঢুলুঢুলু, টেনে চোখের পাতা খোলা রাখতে পারছে না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, টেরও পেল না।

ঘুম ভেঙে গেল মুসার। মাথা তুলে রাফিয়ানের দিকে চেয়ে দেখল, সে-ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। চোখ মেলা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জঙ্গলের দিকে তাকাল মুসা। কিছুই দেখল না। শব্দ একটা হয়েছে, সে নিশ্চিত। নাহলে ঘুম ভাঙল কেন?

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো না। চারপাশে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল জঙ্গল।

ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল একদল মানুষ। সে-কি বিকট চিৎকার ওদের। হাতে বল্লম। কয়েকজনের কাছে পুরানো আমলের বন্দুক। ঘিরে ফেলল অভিযাত্রীদের।

'জিভারো!' ফিসফিসিয়ে বলল আতঙ্কিত চ্যাকো। এবার আর রসিকতা নয়।

কিছুই করতে পারল না অভিযাত্রীরা। দেখতে দেখতে বুনো লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো ওদের। দুই হাত দুই পাশে রেখে বুক আর পিঠের ওপর দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে, হাত নড়ানোরও উপায় রইল না।

পাঁচ

ভয়ে দুরুদুরু করছে সবার বুক। কিন্তু রাফিয়ানের কথা আলাদা। সে ভয় পেল না। বন্ধুদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে ভীষণ রেগে গেল। লাফিয়ে পড়তে গেল একজন ইনডিয়ানের ওপর।

'না, রাফি, না!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'রাফি, খবরদার, মেরে ফেলবে!' চোখের সামনে তার প্রিয় কুকুরটাকে খুন হতে দেখতে পারবে না সে।

কি বুঝল রাফিয়ান কে জানে, আর আক্রমণের চেষ্টা করল না।

বন্দিদের দিকে চেয়ে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ইনডিয়ানদের। বিজাতীয়

ভাষায় কথা বলছে, তার এক বর্ণও বুঝল না অভিযাত্রীরা।

জংলীদের সারা গা খালি, কোমরের কাছে কিছু পাতা বেশ কায়দা করে জড়িয়েছে, সুন্দর ঝালরের মত ঘিরে রেখেছে সেই বিচিত্র পোশাক। ঝালর বানানোর আগে পাতাগুলোকে লাল আর হলুদ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে। একই ধরনের ছোট ঝালর জড়িয়েছে গোড়ালি আর বাজুতে। একজনের মাথায় লতার বন্ধনীতে পাখির দুটো পালক গোঁজা। বোঝা যাচ্ছে, সে দলটার নেতা। লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জিম, 'কি চাও?'

ইংরেজি বোঝার কথা নয় জংলীটার, কিন্তু বোধহয় অনুমান করে নিয়েই জঙ্গলের দিকে হাত তুলে তার ভাষায় বলল কিছু। তারপর ইশারায় হাঁটার নির্দেশ দিল বন্দিদের।

ইনডিয়ানদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আলোয় বুনোপথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জিনা। 'ওদের রাজার কাছে?'

'তাছাড়া আর কোথায়?' তিক্ত হাসি হাসল ওরটেগা। নিজের ওপর মহা-খাপ্পা। 'শালার ঘুম আর রাখতে পারলাম না। তা না হলে...'

'তা না হলেও কিছু করতে পারতেন না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'এটা এবং ভালই হলো। জেগে থাকলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন, আরও খারাপ হত তাহলে।'

ঠিকই, কিশোরের কথা মেনে নিল ওরটেগা, দলে অনেক ভারি ইনডিয়ানরা।

ঘন বনের ভেতর দিয়ে সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। বিশ্রাম নেয়ায় রবিনের পায়ের ফোলা অনেক কমেছে, কিন্তু সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছে। তার মনে হলো, শ-খানেক বছর একটানা চলে লক্ষ লক্ষ মাইল বুনোপথ পেরোনোর পর একটা খোলা জায়গায় বেরোল। ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে, গাছের ডালপাতা দিয়ে তৈরি। জিভারো ইনডিয়ানদের গ্রাম।

মাঝখানের কুঁড়েটা আশপাশেরগুলোর চেয়ে বড়। বন্দিদেরকে ওটার দিকে নিয়ে চলল জংলীরা।

বিশাল এক ইনডিয়ান বেরিয়ে এল বড় কুঁড়েটার দরজায়, গায়েগতরে যেন একটা দৈত্য। মাথায় টিউকান পাখির পালক গোঁজা। বোঝা গেল, সে-ই রাজা কিংবা সর্দার।

তার দিকে বন্দিদের ঠেলে দিল জংলীরা।

লোকটার বয়েস যে কত হয়েছে কে জানে, একশো থেকে দেড়শোর মাঝে যা খুশি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হয়েছে সে। তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আদেশ দিল কিছু। গমগমে ভারি কণ্ঠ, মেঘ ডাকল যেন।

দু-দলে ভাগ করে ফেলা হলো বন্দিদের। হাইজ্যাকাররা একদিকে, ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে। দু-দিক থেকে প্রত্যেকেরই হাত চেপে ধরল দুজন করে ইনডিয়ান। বন্দিরা ভাবল, তাদের শেষ সময় উপস্থিত। ভয়ে আতঙ্কে কাঁপছে সবার বুক।

কিন্তু মারল না তাদেরকে ইনডিয়ানরা। টেনে নিয়ে চলল। একটা খালি কুঁড়েতে ছেলেদের ঠেলে দেয়া হলো, হাইজ্যাকারদেরকে আরেকটা কুঁড়েতে। তারপর বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল জংলীরা।

তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গেই রয়েছে রাফিয়ান।

গোটা দুই ছোট মশাল জ্বলছে কুঁড়েতে। আঁধার কাটছে না। সেই ম্লান আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল চারজনে।

'ভাল বিপদে পড়েছি,' মুখ খুলল মুসা। 'বেরিয়েছিলাম বেড়াতে…আহ্, কি একখান বেড়ান বেড়াচ্ছি। স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও এরকম হবে, তাহলে কি আর বেরোই? প্লেন হাইজ্যাক, জঙ্গলের মাঝে ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং তারপর এসে পড়লাম নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে।

'তো-তুমি কি সত্যি মনে করো…' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের, 'ওরা আমাদের মাথা কেটে ট্রফি বানাবে?' পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাল সে।

'তোমার কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'বইয়ে তো পড়েছি অন্যরকম,' এক মুহূর্ত চুপ রইল রবিন। 'কিন্তু বইয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি আছে কে জানে। আজকাল নাকি নরমুণ্ড শিকারী আর নেই। জিভারোরা মানুষের মাথার ট্রফি এখনও রাখে শুনেছি—কিন্তু অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীদের ধারণা, সেগুলো জ্যান্ত মানুষের মাথা কেটে নয়, যারা মরে যায়, তাদের।'

'আমিও শুনেছি,' কিশোর বলল। 'মরা মানুষেরই হোক আর জ্যান্ত মানুষেরই হোক, ব্যাটারা ট্রফি বানায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিউজিয়মে ওরকম একটা ট্রফি দেখেছি, অনেক পুরানো মানুষের। মাথার আসল আকার নেই, ছোট করে ফেলেছে, একটা টেনিস বলের সমান।'

'মারছে রে! দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুব খারাপ। গা গুলিয়ে ওঠে।'

'অত ছোট করে কি করে?' জিনা জানতে চাইল।'

'হাড়-মগজ-মাংস সব বের করে ফেলে। চুল ঠিকই রাখে। তারপর চামড়া শুকাতে শুকাতে এমন অবস্থায় নিয়ে আসে…'

'থাক থাক, আর বলার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে,' বাধা দিল মুসা। 'আমাদের পালানো উচিত, যত জলদি পারা যায়। জংলীদের বিশ্বাস নেই। মরা মানুষের মাথা কাটে বলেছে তো? আমিও বিশ্বাস করি। কাজটা খুবই সহজ। জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেললেই মরে যায়, তখন আর মাথা কেটে নিতে অসুবিধে কোথায়।

বই লেখে যারা, ওসব ধড়িবাজ শিকারী আর ভ্রমণকারীদের কথা ছাড়ো।'

'কিন্তু পালাই কিভাবে?' নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। 'পালিয়ে যাবই বা কোথায়? বড়জোর গিয়ে প্লেনটায় উঠতে পারব। জিম আর তার সঙ্গীদেরও বের করে নিয়ে যেতে হবে। ওদেরকে ছাড়া মাইলখানেকও টিকব না এই জঙ্গলে। ধরো, এত কিছু করে পালাতে পারলাম। কিন্তু তারপর কি হবে? আমাদের পিছু নিয়ে ঠিক প্লেনের কাছে হাজির হয়ে যাবে ইনডিয়ানরা, আবার ধরে আনবে।'

'কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকলে তো হবে না। কিছু একটা করা দরকার।'

'দেখো আগে এ ঘর থেকেই বেরোতে পারো কিনা,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'তারপর তো অন্য কথা।'

দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল জিনা আর মুসা। কিশোর আর রবিন বসে রইল, অযথা কষ্ট করতে গেল না। ইনডিয়ানদের এসব কুঁড়ে সম্পর্কে প্রায় সবই জানা আছে ওদের, বইয়ে পড়েছে। শক্ত সোজা গাছ কেটে গায়ে গায়ে লাগিয়ে গভীর করে মাটিতে পোঁতা হয়। ওগুলোকে মজবুত করে বাঁধা হয় পাকা বেত দিয়ে। বোমা মারলেও ওই গাছের বেড়ার কিছু হবে কিনা সন্দেহ, আর ছেলেদের সঙ্গে তো রয়েছে শুধু সাধারণ ছুরি। বেতই কাটতে পারবে না, থাক তো গাছ কাটা।

মাটির মেঝে, কিন্তু নিয়মিত লেপে লেপে সিমেন্টের মত শক্ত করে ফেলা হয়েছে। সুড়ঙ্গ কেটে যে নিচ দিয়ে বেরোবে, তারও উপায় নেই।

বেড়া দেখা শেষ। বাকি রইল দরজা।

কিন্তু দরজায় ঠেলা দিয়েই অবাক হয়ে গেল জিনা। খোলা। শুধু ভেজিয়ে রেখে গেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আস্তে করে ঠেলে ফাঁক করল খানিকটা। উঁকি দিয়ে দেখল, অনেক কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বলছে। লালচে আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো এলাকাটা।

খুব সাবধানে, নিঃশব্দে দরজা আরেকটু ফাঁক করল জিনা। বাকি তিনজনও এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, না না, চারজন, রাফিয়ানও।

এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে বাইরে পা রাখল মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ছায়া থেকে উদয় হলো একটা মূর্তি। একজন জিভারো যোদ্ধা। আগুনের আলোয় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে, তাতে ভয়াল কিছু নেই, শান্ত।

আবার পিছিয়ে এসে কুঁড়েতে ঢুকল মুসা। কেন দরজা বন্ধ করেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল।

দরজাটা ফাঁকই রইল। ছেলেরাও বন্ধ করল না, পাহারাদারও না।

'বুঝলে তো?' কিশোর বলল। 'পালাতে পারব না।'

বন্ধ কুঁড়েতে রাফিয়ানের আর ভাল লাগল না। দরজা খোলা পেয়ে লে

নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসার জন্যে। ফিরেও তাকাল না পাহারাদার। তার ওপর নির্দেশ রয়েছে ছেলেদের দেখে রাখার জন্যে, কুকুর থাকল না গেল, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

একটা মতলব এল কিশোরের মাথায়।

'শোনো,' নিচু স্বরে বলল সে। 'রাফিকে দিয়ে জিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি আমরা।'

'কি ভাবে?' প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল অন্য তিনজন।

'সহজ। একটা নোট লিখে রাফির গলায় বেঁধে দেব। বললেই দিয়ে আসবে সে।'

'কি লিখব, আমরা পালানোর ঝুঁকি নিতে চাই? আমার বিশ্বাস, ওদের দরজাও আটকানো নেই। কি নীরব দেখছ না? ইনডিয়ানরা সব ঘুমাচ্ছে, মাত্র দুজন পাহারাদার ছাড়া সবাই। একজন আমাদের কুঁড়ে পাহারা দিচ্ছে, আরেকজন ওদের। একই সঙ্গে দুজনকে ধরে যদি কাবু করে ফেলতে পারি, তাহলেই হলো।'

'খুব রিস্কি মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'যে অবস্থায় পড়েছি, রিস্ক তো নিতেই হবে।' পাহারাদারকে কাবু করার কথা বলল বটে কিশোর, কিন্তু কিভাবে করবে সেটা এখনও জানে না। আক্রান্ত হলে নিশ্চয় চেঁচামেচি করবে সে, সারা গ্রাম জাগিয়ে ছাড়বে। তখন?

সেটা পরে দেখা যাবে, ভেবে পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল কিশোর। লিখে, কাগজটা ভাঁজ করে জিনার হাতে দিল।

আস্তে শিস দিয়ে রাফিয়ানকে ডাকল জিনা। কুকুরটা ফিরে এলে তার কলারে শক্ত করে কাগজটা আটকে দিল। 'রাফি, এটা জিমকে দিয়ে আয়।'

একবারেই বুঝল বুদ্ধিমান কুকুরটা। বেরিয়ে গেল। ফিরে এল খানিক পরে। কলারে আটকানো আরেকটা কাগজ।

খুলে জোরে জোরে পড়ল কিশোর :

> 'হুট করে কিছু কোরো না। যেখানে রয়েছ, থাকো। আমরা পালানোর উপায় খুঁজছি। আধঘন্টা পর রাফিকে পাঠাবে।'

অপেক্ষার পালা।

আধ ঘন্টাই অনেক বেশি মনে হলো। রাত বেশি বাকি নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে না পারলে পরে কঠিন হয়ে যাবে পালানো।

অবশেষে রাফিয়ানকে আবার পাঠানোর সময় হলো।

আরেকটা নোট নিয়ে ফিরে এল রায়িান। খুলে পড়ে বোকা হয়ে গেল ছেলেরা। জিম লিখেছে:

> আমরা তিনজন যাচ্ছি। তোমাদের নিতে পারছি না, কারণ, তাতে আমাদের চলা ধীর হয়ে যাবে। নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব। পারলে, যত তাড়াতাড়ি পারি সাহায্য

গিয়ে ফিরে আসব তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে। চিন্তা কোরো না। সাহস হারিয়ো না।'

'ইয়াল্লা!' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুসা। 'আর কোন উপায় নেই। আংলীদের ট্রফির জন্যে মাথাটা বুঝি খোয়াতেই হলো!'

অন্য সময় হেসে ফেলত ওরা, কিন্তু এখন ভাবনা বড় বেশি।

পালানোর আশা শেষ। চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এই অবস্থায় ঘুম আসার কথাই ওঠে না। বেড়ায় হেলান দিয়ে কান পেতে রইল ওরা, হাইজ্যাকারদের পালানোর শব্দ শোনার জন্যে।

সময় গেল। নীরবতায় কোন রকম ছেদ পড়ল না। তাহলে কি পালানোর চেষ্টা করছে না ওরা? নাকি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে, নিঃশব্দে?

পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা গেল। ফিকে হতে শুরু হলো অন্ধকার, ভোর হয়ে আসছে। জিভারোদের কুঁড়ের সামনে আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, কয়লাগুলোতে কাঠ ফেলে আবার বাড়িয়ে দেয়া হলো। কেউ কেউ আর ঘরে ঢুকল না, হাঁটাহাঁটি করতে লাগল, ভোরের তাজা হাওয়া গায়ে মাখছে।

আলো বাড়ল।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে পাল্লা পুরো খুলে গেল। কুঁড়েতে ঢুকল একটা মেয়েলোক। হাতে বেতের ঝুড়িতে ফল। নীরবে ঝুড়িটা ছেলেদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'এসো, নাস্তা,' ডাকল কিশোর। 'ইস্, এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি পেতাম।'

'যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ কি?' দুহাতে দুটো ফল তুলে নিল মুসা, কটাস করে এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে নিয়ে চিবাতে শুরু করল। 'আঁউম, বেশ মিষ্টি,' মুখ খাবারে বোঝাই থাকায় শোনাল 'বেম্মিট্টি'।

হঠাৎ শোনা গেল চেঁচামেচি। মেয়ে কণ্ঠ। কথা বোঝা গেল না অবশ্যই।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ছেলেরা, কয়েকজন যোদ্ধা ছুটে যাচ্ছে খানিক দূরের আরেকটা কুঁড়ের দিকে। ওটাতেই রাখা হয়েছিল হাইজ্যাকারদের। শোরগোল বাড়ল। দেখতে দেখতে পুরো গ্রাম এসে ভিড় জমাল কুঁড়ের সামনে।

'পালিয়েছে তাহলে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা। 'দেখেছ কেমন রেগে গেছে? সব ঝাল না এসে আমাদের ওপর ঝাড়ে এখন ব্যাটারা।'

ছয়

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে ছেলেরা, ইনডিয়ানরা কি করে।

একদল জিভারো যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। কেন গেছে, সেটা আর বলে দিতে হলো না ছেলেদের, বুঝল। পলাতকদের কি

ধরতে পারবে?

জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল যোদ্ধাদের শোরগোল। গাঁয়ের লোকেরা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হলো। কেউ এল না ছেলেদের ঘরের দিকে। আস্তে আস্তে অস্বস্তি দূর হলো ওদের।

মেয়েলোকটা নিশ্চয় বলেছে যে, ছেলেরা কুঁড়েতে রয়েছে। যুক্তি মানে, এমন কেউ ভাববে না, তিনজন লোকের পালানোর ব্যাপারে ছেলেদের কোন যোগসাজশ রয়েছে। কিন্তু কথা হলো, যুক্তি কতখানি মানে কিংবা বোঝে জিভারোরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'আল্লাই জানে কি হবে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গতরাতে যে পাহারায় ছিল, সেই লোকটা এল। চেহারা দেখে ভালমন্দ কিছু বোঝা গেল না। ইশারায় বাইরে বেরোতে বলল তাদেরকে।

কুঁড়ে থেকে বেরোল ছেলেরা। লোকটার পিছু পিছু সর্দারের কুঁড়ের দিকে এগোল।

কিন্তু সর্দারের কুঁড়েতে না গিয়ে কাছের আরেকটা বড় কুঁড়েতে তাদেরকে নিয়ে এল লোকটা। কুঁড়ের কাছ থেকে বড় জোর দশ কদম দূরে রয়েছে ওরা, এই সময় দরজায় দেখা দিল অদ্ভুত দর্শন এক মূর্তি।

আর দশজন সাধারণ জিভারোর চেয়ে লম্বা, বিকট মুখোশে মুখ ঢাকা। মাথার বন্ধনীতে লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। জানোয়ারের চামড়ায় তৈরি বিচিত্র পোশাক পরনে। পালক আর পশুর দাঁতের তৈরি লম্বা মালা কয়েক প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে গলায়।

রবিন জানে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ওই ধরনের পোশাক, মুখোশ আর মালা পরে জংলী ওঝারা। তাহলে এখন কি কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হবে? কি সেটা? ইনডিয়ানদের নিষ্ঠুর কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে বন্দিদের?

অনেকক্ষণ নীরবে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইল ওঝা। তারপর এগিয়ে এসে আস্তে করে হাত রাখল কিশোরের মাথায়। তার ব্যবহারে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। একে একে, মুসা, রবিন আর জিনার মাথায়ও একইভাবে হাত রাখল সে।

আর দাঁড়াল না পাহারাদার, বোধহয় থাকার প্রয়োজন মনে করল না। ঘুরে চলে গেল।

ওঝার সঙ্গে বন্দিরা একা। অনুমান করতে কষ্ট হলো না, ওই অদ্ভুত লোকটা তাদেরকে তার ছত্রছায়ায় নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে এখুনি খুশি হওয়ার কিছু নেই। কেন নিয়েছে কে জানে?

কুঁড়ের সামনের আঙিনায় লোকের ভিড়, মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চারা সবাই চেয়ে রয়েছে এদিকে। ইশারায় গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে দিল ওঝা, বন্দিদেরকে তার দায়িত্বে নিয়েছে।

তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করল মুসা, 'মাকড়সা বলছে মাছিকে : আমার বাড়ি এসো বন্ধু বসতে দেব...' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বোঝা গেল না। তারপর ওঝার দিকে চেয়ে বলল, 'গলায় যা একেকখান দাঁত ঝুলিয়েছ না, জংলীদাদা। মানুষের গোশত খাওয়ার সময় ওগুলো লাগিয়ে নাও নাকি?'

'আহ্, চুপ করো!' বিরক্ত হয়ে ধমক দিল কিশোর। 'বিপদ আরও বাড়াবে দেখছি!'

ছেলেদেরকে তার কুঁড়েতে নিয়ে এল ওঝা। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে নানা আকৃতির অসংখ্য মুখোশ, একেকটার মুখভঙ্গী একেক রকম। আরও নানারকম অদ্ভুত জিনিস রয়েছে, তার মাঝে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানদের তৈরি মানুষের মাথার সঙ্কুচিত ট্রফিও আছে।

'এই গল্প নিয়ে দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম করতে পারবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,' মুসা বলল।

'তা পারবেন,' মাথা দোলাল জিনা। 'কিন্তু আগে আমাদের বেঁচে ফিরে তো যেতে হবে?'

অপার্থিব লাগছে ঘরের পরিবেশ। ওঝাকেও কেমন যেন মেকি মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে। কেন, বলতে পারবে না। পুরো ব্যাপারটাই যেন সাজানো, অভিনয়।

ঘরে দুজন ইনডিয়ান মেয়ে আছে। কর্কশ কণ্ঠে তাদের কিছু বলল ওঝা।

হাত ধরে নিয়ে ছেলেদের বসাল ওরা। প্রত্যেকের গালে লাল আর হলুদ রঙের আলপনা এঁকে দিল। চামড়ার তৈরি খাটো আলখেল্লা পরতে দিল, সেগুলোতেও লাল-হলুদ আঁকিবুঁকি। রাফিয়ানের মুখেও কয়েকটা রঙিন পোঁচ লাগিয়ে দিল একটা মেয়ে।

সাজানো শেষ হলে ছেলেদের আবার বাইরে নিয়ে এল ওঝা, অপেক্ষমাণ জনতাকে দেখাল।

সন্তুষ্টির গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে।

কুঁড়েতে ফিরে গেল আবার ওঝা।

যার যার কাজে গেল জনতা। একা হয়ে গেল ছেলেরা। কেউ নেই তাদের কাছে, কোন পাহারাদার নেই।

'ব্যাপার কি?' মুসা না বলে থাকতে পারল না। 'মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝছি না।'

'মুক্তি দিল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ। নিশ্চয় কোন কারণ আছে এসবের।'

'মরুকগে!' মুখ ঝামটা দিল জিনা। 'গালে রঙ চড়চড় করছে। চলো, ধুয়ে ফেলিগে।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর। 'অযথা লাগায়নি এগুলো। হয়তো কোন ধরনের ছাড়পত্র। এসো, পরীক্ষা করে দেখি।'

ধীরে ধীরে হেঁটে গাঁয়ের একদিকের সীমানায় চলে এল ওরা। তারপরে জঙ্গল। সেদিকে পা বাড়াতেই পথরোধ করে দাঁড়াল পাহারাদার। চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর নেই তার, কিছু বললও না।

সেদিক থেকে ফিরে এল ছেলেরা।

চারদিকেই গিয়ে দেখল। সব জায়গায় একই ব্যাপার ঘটল। বোঝা গেল, গাঁয়ের মধ্যে ওরা স্বাধীন, কিন্তু সীমানার বাইরে বেরোতে দেয়া হবে না।

'যাক,' কিশোর বলল, 'কিছুটা স্বাধীনতা তো মিলল। সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করব।'

নতুন জীবনে মানিয়ে নিতে বাধ্য হলো অভিযাত্রীরা। প্রথম দিনের সেই কুঁড়েটাতেই ঘুমায়। দিনের বেলা গ্রামের এখানে ওখানে কাটায়। কেউ কিছু বলে না।

তিন দিনের দিন তাদের ডাক পড়ল সর্দারের কুঁড়েতে। ওঝা তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এক এক করে তাদের মাথায় হাত রেখে দ্রুত কিছু বলল সর্দারকে। একটা শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করল 'হামু।' কিশোরের ধারণা হলো, হামু সর্দারের নাম। সর্দারও একটা শব্দ বার বার বলল : বিট্‌লাঙগোরগা।

'মারছে রে! ওঝার নাম…' নিচু স্বরে বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল কিশোর।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো, সর্দারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ওঝার। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ওঝা আবার ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এল। খুশি খুশি মনে হলো তাকে।

কুঁড়েতে ফিরে কিশোর বলল, 'ওঝার ব্যাপারে অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছ?'

'কিছু কি? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'পুরোটাই অদ্ভুত। ওরকম অদ্ভুত মানুষ জিন্দেগীতে দেখিনি।'

'ওকথা বলছি না। জিভারোদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ওর, ঠিক মেলে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'আমিও খেয়াল করেছি।'

'তা-তো হবেই,' মুসা বলল 'আলাদাই যদি না হলো, ওঝা কিসের? বিচিত্র পোশাক, অদ্ভুত ব্যবহার আর একটু রহস্য রহস্য ভাব যদি বজায় না রাখে, কেন ভয় করবে লোকে?'

'আমার মনে হয়েছে,' গাল ফুলিয়ে ভেঙচাল জিনা, 'আস্ত একটা ভাঁড়। একটা রামছাগল। শুধু জিভারো যোদ্ধাদের সঙ্গেই যা কিছুটা মিল রয়েছে…'

'কই আর মিল?' মুসা বলল। 'সেজেগুজে যেতে দেখলাম তো কয়েকটাকে সেদিন।'

ফিরে এল যোদ্ধারা। খালি হাতে। হাইজ্যাকারদের ধরতে পারেনি।

আশা হলো ছেলেদের। হয়তো সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবে জিম। তাহলে সাহায্য আসবে।

ওঝাকে নিয়ে আবার কথা উঠল।

'আমি আসলে বোঝাতে চাইছি,' কিশোর বলল। 'এ-গাঁয়ের জিভারোরা সাধারণ মানুষ। মনও তাদের ভাল। কিন্তু ওঝার স্বভাব, চালচলন কেমন যেন অন্যরকম। আর, সারাক্ষণ মুখে মুখোশ পরে রাখে কেন?'

'ওর চেহারা খুব কুৎসিত,' মুসা বলল। 'কিংবা মুখে বাজে কোন চর্মরোগ আছে। অথবা মুখে খোলা বাতাস লাগানো পছন্দ করে না সে।'

'এমনও হতে পারে, কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যেই মুখোশ পরে সে,' রবিন বলল। 'কিংবা অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে ওটার।'

এসব ওঝাদের চিন্তার ধার দিয়ে গেল না জিনা, সাফ বলে দিল, 'ওর মুখটা আসলে তাপিরের মত, তাই ঢেকে রাখে।'

বিকেলে গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে বেরোল ওরা। ওঝার কুঁড়ের ধার দিয়ে যাচ্ছে, এই সময় দুজন মেয়ের একজন বেরিয়ে হাত নেড়ে ডাকল তাদের।

দরজায় দেখা দিল ওঝা বিট্‌লাঙগোরুগা। ইশারা করল।

'বিট্‌লা ডাকছে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'বিট্‌লামী করার জন্যে,' জিনার জবাব।

'তোমরা বেশি কথা বলো!' কড়া ধমক লাগাল কিশোর।

যেতে দ্বিধা করছে ছেলেরা।

'ভয় কি? এসো,' ইংরেজিতে বলল কেউ।

ঝট করে তাকাল সবাই। কে? ওঝা ছাড়া ধারেকাছে তো আর কেউ নেই? কানাডিয়ান মেয়েটাও ঢুকে গেছে আবার কুঁড়েতে।

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ওঝা। ছেলেদের ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। তারপর মেয়েদুটোকে কিছু বলল, বেরিয়ে গেল ওরা।

ছেলেরা ঢুকলে দরজা লাগিয়ে দিল ওঝা। আস্তে করে খুলে আনল মুখোশ।

'ইওরোপীয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল বিস্মিত মুসা।

'আপনি ইংরেজি বলেছেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'কে আপনি?' জানতে চাইল জিনা।

কিশোর তেমন অবাক হয়েছে মনে হলো না, এ-রকম কিছুই যেন আশা করছিল সে।

হাসল ওঝা। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, ধূসর চুল, হাসি হাসি নীল চোখ। মুখের চামড়া ফ্যাকাসে, সর্বক্ষণ মুখোশ পরে থাকে বলেই হয়তো। 'খুব চমকে দিয়েছি, না? আসলে আমি বিট্‌লাঙগোরুগার অভিনয় করছি, বিট্‌লা নই।' শব্দ করে হাসল সে।

কত কত বাজে কথা বলেছে ভেবে লজ্জা পেল মুসা আর জিনা, চোখ তুলে

তাকাতে পারল না।

'আমার নাম কারলো ক্যাসাডো। ছিলাম বৈমানিক, কপাল-দোষে হয়ে গেলাম জিভারোদের ওঝা।'

'আপনাকে আমি চিনেছি, স্যার,' কিশোরের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আপনিই সেই বিখ্যাত কারলো ক্যাসাডো, দুর্ধর্ষ বৈমানিক হিসেকে যাঁর অনেক নামডাক। আপনার অনেক অভিযানের কাহিনী আমি পড়েছি। আপনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদও...'

'পড়েছ, না? এই ব্রাজিলের জঙ্গলেই হারিয়েছি আমি,' বিষণ্ন শোনাল বৈমানিকের কণ্ঠ।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'এঞ্জিনের গোলমাল। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল প্লেন। বেঁচে যে আছি এটাই আশ্চর্য। প্যারাসুটও আটকে গিয়েছিল, খুলল শেষ মুহূর্তে। আরেকটু দেরি হলেই গেছিলাম। পড়লাম একেবারে জিভারোদের সর্দার হামুর কুঁড়ের সামনে। ভেবেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেটে ফেলবে। তা-তো করলই না, আমাকে তোয়াজ শুরু করল। পরে বুঝেছি, নীল চোখ আর আকাশ থেকে পতনই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমাকে ওরা কালুম-কালুম ভেবেছে।'

'কালুম-কালুম!' মুখ বাঁকাল মুসা।

'জিভারো ইনডিয়ানদের পবন,' কিশোর বলল তাকে। 'বাতাসের দেবতা।'

'বাহ্, বুদ্ধিমান ছেলে,' প্রশংসা করল ক্যাসাডো। 'অনেক কিছু জানো।'

'ইনডিয়ানরা প্লেন দেখেনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখে, মাঝে-সাঝে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু ওগুলো কি জিনিস, জানে না ওরা। সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় নেই। আর প্যারাসুট তো দেখেইনি। আমার প্লেনটা গিয়ে পড়েছে ওখান থেকে অনেক দূরে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'ওদের ভুল ধারণা ভাঙলেন না কেন?'

'চেষ্টা করেছি, মানতে রাজি নয়। ওদের ধারণা, দেবতারা সহজে মানুষের কাছে ধরা দেয় না, তাই নানা রকম বাহানা করে। আমি কালুম-কালুম যদি না-ও হই, তার প্রেরিত দূত যে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওদের।'

হেসে বলল মুসা, 'বাঘের সাজে যে সাজিয়েছেন আমাদের, আমরা তাদের কাছে কী? হালুম-হালুম?'

হেসে ফেলল ক্যাসাডো। 'হালুম-হালুম না হলেও অনেকটা ওরকমই। দেবতার বাচ্চা।'

'ওদের ভাষা শিখলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পর্তুগীজ ভাষার কিছু শব্দ মিশে গেছে ওদের ভাষায়। কিছু কিছু জিভারো জানতাম। শুরুতে কাজ চালিয়ে নিয়েছি। থাকতে থাকতে এখন পুরোপুরিই শিখে ফেলেছি।'

'আপনি চলে যান না কেন?'

'যেতে দেয় না। আমি নাকি ওদের সৌভাগ্যের ধারক। চলে গেলে আবার ওদের দুর্ভাগ্য এসে ভর করে?'

'ওদের এ-বিশ্বাসের কারণ?' রবিন জানতে চাইল।

'আমি নেমেছিলাম সর্দারের কুঁড়ের সামনে। এমন এক সময়, যখন জংলীদের দুঃসময় চলছে। বনে শিকার নেই, প্রচণ্ড খরা। এমনিতেই খাবারের খুব অভাব। বেচারাদের, খরা কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়। খাওয়ার অভাব, লোক মরছে। ঠিক তখন আমি নামলাম। যেদিন এলাম, অনেক দিন পর সেদিনই পাঁচটা হরিণ মেরে আনল শিকারীরা, তার পরদিন থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। আসলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হোলেই বনে জন্তু-জানোয়ারেরা ফিরে আসা শুরু করেছিল। ইনডিয়ানরা ভাবল, সব আমার দয়া। আমি বলেছি বলেই খাবার আর পানি দিয়েছে কালুম কালুম। এ রকম একজনকে কেন ছেড়ে দেবে ওরা?'

'তা তো ঠিক,' মুসা বলল। 'আমরা কালুম-কালুমের ছেলে, বলেছেন বুঝি ওদের?'

'তোমাদের ভালর জন্যেই বলতে হয়েছে,' হাসল বৈমানিক।

'সারাক্ষণ মুখোশ পরে থাকেন কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'থাকতেই হবে যখন, ভাবলাম ক্ষমতা নিয়েই থাকব। দেবতারা নাকি সহজে নিজেদের চেহারা মানুষকে দেখতে দিতে চায় না। তাই মুখোশ বানালাম। একমাত্র হামুর সামনে ছাড়া আর কারও সামনে খুলি না। এতে হামুও খুব খুশি, তাকে অনেক বড় সম্মান দেয়া হয়েছে বলে।'

'পালানোর কথা ভাবেন না?'

'ভাবি না মানে? পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এই গভীর জঙ্গল পেরিয়ে একা যাব কি করে? সভ্যতা অনেক দূর। সাহস হয় না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'কিন্তু তোমাদের কথা তো কিছু জানা হলো না? কে তোমরা? কি করে এলে?'

খুলে বলল সব কিশোর। মাঝে মাঝে কথা যোগ করল অন্য তিনজন।

'জিম, চ্যাকো আর ওরটেগা ফিরে যেতে পারলে আমাদের উদ্ধার করবে,' সব শেষে বলল জিনা।

'অনেকগুলো *যদি* আছে তাতে। যদি ফিরে যেতে পারে, যদি উদ্ধার করার ইচ্ছে থাকে, এবং যদি ওরা আসার আগেই আমাদের বলি না দিয়ে দেয় ইনডিয়ানরা,' মুসা বলল।

'অত নিরাশ হও কেন?' সান্ত্বনা মুসাকে নয়, নিজেকেই দিল আসলে কিশোর।

দীর্ঘ নীরবতা।

ক্যাসাডো ভাবছে।

রবিন চুপ।

জিনা চিন্তিত।

মনিবের চেহারা দেখে রাফিয়ানও বিষণ্ন হয়ে উঠেছে, লেজ নাড়ছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ক্যাসাডো, 'আমার প্লেনের রেডিওটা যদি খালি পেতাম। এসওএস পাঠানো যেত।'

'আমরা যে প্লেনে এসেছি,' কিশোর বলল, 'তাতেও আছে রেডিও। ভাঙা, অর্ধেক মেরামত হয়েছে।'

সাত

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকাল ক্যাসাডো। 'রেডিও?'

'অনেক চেষ্টা করেছি আমি আর ওরটেগা,' জানাল কিশোর। 'ঠিক করতে পারিনি।'

'আমি একবার দেখতে পারলে হত,' বলল ক্যাসাডো।

'এখান থেকে অনেক দূরে,' বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না জিনা।

'না, বেশি দূরে নয়। প্লেনটা কোথায় পড়েছে, অনুমান করতে পারছি। ওই ইয়াপুরা নদী আর পাহাড়ের কথা যে বলছ, আমার চেনা। শর্টকাট আছে, এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। অনেক এগিয়ে গিয়েছিলে তোমরা, ঘুরপথে, পিছিয়ে আনা হয়েছে আবার। আমি যাব প্লেনটা দেখতে।'

'বললেন না বেরোতে দেয় না?' কিশোর মনে করিয়ে দিল।

'দেয় না মানে, জিভারোদের ছেড়ে চলে যেতে দেবে না। কিন্তু গাঁয়ের বাইরে বেরোনোতে নিষেধ নেই, অবশ্য একলা বেরোতে দেবে না। কতবার শিকারে গেছি ওদের সঙ্গে। অনেক জায়গা চিনেছি।'

'তাহলে একলা যাবেন কি করে? আটকাবে না?'

হাসল ক্যাসাডো। 'আসলে একা বেরোনোর চেষ্টাই করিনি কখনও। একলা পালাতে পারব না, জঙ্গলে মরব, তাই। তবে চেষ্টা করলে যে ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারব না, তা নয়।'

গত কয়েক দিনের তুলনায় সে-রাতে ভাল ঘুম হলো ছেলেদের।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর-মন নিয়ে ঘুম ভাঙল।

রোজ নাস্তা নিয়ে আসে সে মেয়েমানুষটা, সে-ই নিয়ে এল সে-দিনও। ঝুড়ি নামিয়ে রেখে চলে গেল।

একটা পেঁপের নিচে ভাঁজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল। ক্যাসাডো লিখেছে :

কাল রাতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। প্লেনটা খুঁজে পেয়েছি। একটা ভুল করেছিল ওরটেগা, রেডিওর একটা পার্টস উল্টো লাগিয়েছিল, ফলে ঠিক হয়নি। সেটা মেরামত করেছি। রেডিও কাজ করছে এখন। এসওএস-ও পাঠিয়েছি একটা। জবাব পাইনি। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। আবার গিয়ে মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করব।

ক্যাসাডো।

খবর শুনে এত খুশি হলো, বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ নেচে নেয়ার লোভ সামলাতে পারল না মুসা আর জিনা। তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরে কুঁড়ের বাইরে বেরোল। নাচতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাফিয়ান। তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, সেই সাথে ঘেউ ঘেউ। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার যোগাড় কিশোর আর রবিনের।

এই মজার কাণ্ড ইনডিয়ান ছেলেমেয়েদেরও দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওরা। কাছে এসে সাহস পেয়ে তারাও যোগ দিল নাচে।

দল সর্দার ডাম্বুর ছেলে পুমকা। বয়েস ষোলো। খুব ভদ্র, শান্ত। তাকে অপছন্দ করার জো নেই। সে ও নাচতে শুরু করল, হাসছে হা-হা করে।

এত হই হল্লা কিসের! সর্দার মনে করল, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। কুঁড়ের দরজায় উঁকি দিল সে। দেখল, দেবতার ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলের ভাব হয়েছে। খুব খুশি হলো সে। হেসে, আপনমনে মাথা দুলিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল।

নাচতে নাচতেই কনুই দিয়ে মুসার পাঁজরে গুঁতো মারল জিনা। 'বোঝো ব্যাপার। এদের ভয়েই কিনা আমরা কেঁচো হয়ে ছিলাম। এই জিভারোদের মত ভদ্র জাতি---আর হয় না।'

'তা হোক,' মুসা বলল। 'তবু আমি থাকতে চাই না এখানে। দেখা যাক, ক্যাসাডোর এসওএস-এর জবাব আসে কিনা।'

কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা। ফলে মনের ভার অনেকখানি হালকা হয়েছে। সহজ ভাবে ইনডিয়ানদের সঙ্গে মিশতে পারছে।

প্রায় প্রতিদিনই ক্যাসাডোর সঙ্গে তার কুঁড়েতে দেখা হয়। আলাপ-আলোচনা হয়। সুযোগ পেলেই প্লেনে গিয়ে এসওএস পাঠায় বৈমানিক। যদিও একটা জবাবও আসেনি এখনও।

সময় কাটাতে এখন আর তেমন অসুবিধে হয় না গোয়েন্দাদের। ইনডিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে পুমকার সঙ্গে। তার কাছে জিভারো ভাষা শিখছে ওরা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ চালানোর মত ভাষা শিখে ফেলল দু-তরফই। মোটামুটি আলাপ করতে পারে। আর এই আলাপের মাধ্যমেই একদিন অদ্ভুত কিছু কথা শুনল অভিযাত্রীরা।

ভালমত বুঝিয়ে বলতে পারল না পুমকা, তত শব্দ দু-তরফের কারও স্টকেই জমা হয়নি এখনও। স্পষ্ট বোঝা গেল শুধু চারটে শব্দ : গুপ্তধন, মন্দির, চাঁদ এবং উপত্যকা।

কান খাড়া হয়ে গেল কিশোর পাশার। অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করল পুমকাকে, বোঝানোর চেষ্টা করল।

পুমকা বুঝল ঠিকই, কিন্তু বলতে পারল না। আবার একই কথা বলল, 'হ্যাঁ

হ্যাঁ, গুপ্তধন। মন্দির। চাঁদ।'

'নাহ্, হবে না,' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। 'ক্যাসাডোকে জিজ্ঞেস করে দেখি, কিছু বলতে পারেন কিনা।'

ছেলেদের আগ্রহ দেখে হাসল ক্যাসাডো।

'পুরানো একটা জিভারো কিংবদন্তী,' বলল সে। 'সব কিংবদন্তীই তিল থেকে তাল হয়, তবে তিল একটা থাকে। এটাতেও বোধহয় রয়েছে। কোন্ কথাটা সত্যি আর কোনটা রঙ চড়ানো বোঝা মুশকিল। জঙ্গলের পরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় অনেক পুরানো একটা মন্দির আছে, নাম চন্দ্রমন্দির। ইনকাদের মত একটা সভ্য জাতির বাস নাকি ছিল ওখানে, এখনও আছে ধ্বংসস্তূপ। সেখানেই আছে গুপ্তধন বা মূল্যবান কিছু। সম্ভবত দামী ধাতুর তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি।

'দারুণ তো!' জিনা বলল।

'হউ!' তার সঙ্গে একমত হলো রাফিয়ান, চোখে কৌতূহল।

'বা-বা, আলোচনায় যোগ দিতে চাস মনে হয়? আরও শুনবি?' হেসে বলল ক্যাসাডো। 'পুরানো কিংবদন্তী, অথচ অনেক চেষ্টা করেও এতদিন গুপ্তধন খুঁজে পায়নি কেউ। এখন আর উৎসাহ নেই কারও। তাছাড়া গুপ্তধন দিয়ে করবেটাই বা কি তারা? কেউ আর খুঁজতে যায় না। ওসব ধনরত্ন কিংবা সোনাদানার চেয়ে শিকার খোঁজাই অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজন ওদের।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তারমানে, গুপ্তধনের ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করতে চাইলে, এমন কিছু বলতে হবে, যাতে স্বার্থ থাকবে জিভারোদের।'

'হ্যাঁ। এটাই তোমাদের সুযোগ। ওদের বোঝানো সহজ হবে, কারণ...' নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ হয়ে গেল সে, চোখ টিপল। আগ্রহ বাড়াচ্ছে ছেলেদের।

'কারণ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'জলদি বলুন!'

'কারণ, কিংবদন্তী আরও বলে, ওই গুপ্তধন খুঁজে পাবে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।'

'বলেন কি?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রবিনের। 'তাহলে তো মস্ত সুযোগ। আজই গিয়ে বলুন না সর্দারকে, আমরা গুপ্তধন খুঁজতে যেতে চাই। বলবেন ওই গুপ্তধনের মধ্যে রয়েছে ওদের সৌভাগ্য।'

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল। 'অন্যভাবেও বলতে পারেন। বলবেন, ওই গুপ্তধনে রয়েছে কালুম-কালুমের আশীর্বাদ। আমরা থাকলে যতখানি সৌভাগ্য আসবে, গুপ্তধনগুলো তার চেয়ে বেশি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। তাছাড়া ওগুলো অমর। দর কষাকষি করবেন, আমরা ওগুলো খুঁজে বের করে দেব, বিনিময়ে আমাদের মুক্তি দিতে হবে।'

'আস্তে, এত উত্তেজিত হয়ো না,' হাত তুলল ক্যাসাডো। 'গুপ্তধন খুঁজে পাবেই, এত শিওর হচ্ছ কেন? মন্দিরটার কাছে হয়তো নিয়ে যেতে পারবে জিভারো গাইড, কিন্তু গুপ্তধন বের করবে কি ভাবে? কোথায় খুঁজবে?'

'কোন নির্দেশ নেই?'

'আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে মুখে মুখে ফিরেছে কথাগুলো, কিছু বাদ পড়েছে, কিছু রঙ চড়েছে, বিকৃত হয়েছে। আসল সত্য বের করে নেয়া খুব কঠিন। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।'

'তবু, চেষ্টা করতে দোষ কি?' রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর পাশা, তাকে থামানো এখন আরও অসম্ভব—কিন্তু সেকথা জানে না ক্যাসাডো। 'জায়গাটা নিশ্চয় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাহলে জিভারোদের কানে আসত না। মিস্টার ক্যাসাডো, আপনি গিয়ে বলুন সর্দারকে। চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হয় হবে।'

হাসল বৈমানিক। 'তা নাহয় বলব। কিন্তু লাভ কতখানি হবে জানি না। এমনও হতে পারে, বলতে পারে, হাতে যা আছে তা-ই ভাল, যেটা নেই সেটার পেছনে ছোটাছুটি করার দরকার নেই।'

'কিন্তু ওগুলো পাওয়ার পর তো আর "নেই" থাকবে না।'

'হুঁ, নাছোড়বান্দা ছেলে। ছেলেমী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিকই বলেছ, চেষ্টা করতে দোষ কি? কথায় আছে : ফরচুন ফেভারস দা ব্রেভ। হাহ্।'

পর দিনই হামুর সঙ্গে দেখা করতে গেল বিট্‌লাঙগোরগা।

অধীর হয়ে কুঁড়ের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেরা।

অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে এল ওঝা। মুখোশের জন্যে তার মুখ দেখা গেল না, দীর্ঘ আলোচনার ফল কি হয়েছে, আন্দাজ করা গেল না।

ইশারায় ডাকল ওঝা। ছেলেদের নিয়ে আবার কুঁড়েতে ঢুকল।

মাদুরে বসে রয়েছে সর্দার। পাশে তার ছেলে পুমকা, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল বিদেশী বন্ধুদের দিকে।

উঠে এসে এক এক করে চারজনের গায়েই এক আঙুল রাখল সর্দার, কয়েকবার করে মাথা নাড়ল, সম্মান দেখাল দেবতার বাচ্চাদের।

পুমকাও উঠে এসে হাত মেলাল ইউরোপীয়ান কায়দায়, বন্ধুদের কাছে শিখেছে।

ব্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেল তার বাবার মুখ, চোখ বড় বড়। স্বর্গের রীতি শিখে ফেলছে তার ছেলে। ছেলের এত বড় সম্মানে গর্বে আধ হাত ফুলে উঠল হামুর বুক। সরল হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'মনে হয় খবর ভাল,' ফিসফিস করে বলল জিনা।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে ছেলেদের নিয়ে তার কুঁড়েতে চলে এল ক্যাসাডো। মুখোশ খুলে হাসল।

সর্দারের সঙ্গে কি কথা হয়েছে শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ছেলেরা, রাফিয়ানও যেন খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। সে-ও বসল ছেলেদের পাশে, গম্ভীর ভাবভঙ্গি।

'হামুকে বুঝিয়ে বললাম,' ক্যাসাডো বলল। 'বললাম, তোমরা স্বর্গ থেকে এসেছ কালুম-কালুমের নির্দেশ নিয়ে। কিংবদন্তীর গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্যে।

প্রথমে বিশেষ গায়ে মাখল না হামু। তার কাছে গুপ্তধনের কোন মূল্য নেই। শেষে বললাম, কাল রাতে কালুম-কালুমের আদেশ পেয়েছি আমি।

'আল্লাহ্‌রে, কি কাণ্ড!' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। 'এক আমেরিকায়ই মানুষে মানুষে কী ফারাক! এক অঞ্চলের মানুষ পাড়ি দিচ্ছে মহাশূন্য, আরেক অঞ্চলের মানুষ এখনও পড়ে আছে সেই গুহামানবের যুগে।'

'তা কি আদেশ এল কালুম-কালুমের কাছ থেকে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কালুম-কালুম তো বাতাসের দেবতা, নাকি?' ক্যাসাডোও হাসছে। 'গত রাতে ঝড়ো হাওয়া বয়েছে, টের পেয়েছ? সেটাই বললাম হামুকে : বাতাসের মধ্যে রয়েছে জিভারোদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। ওগুলো একবার এনে তুলতে পারলে, শিকারের আর কোন দিন অভাব পড়বে না, দীর্ঘজীবী হবে জিভারোরা, শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতিবারেই জিতবে—কখনও হারবে না।'

'তারমানে আমরা এখন খুব দামী বস্তু হয়ে গেলাম ওদের কাছে,' রবিন মন্তব্য করল। 'এ-জন্যেই এত সম্মান দেখিয়েছে মিস্টার হামু।'

'হ্যাঁ।'

'আসল কথা কি বলল?' আর তর সইছে না কিশোরের। 'যেতে দেবে?'

'যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়, দেবে মুক্তি। পথ দেখিয়ে উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক দেবে। এত উত্তেজিত হয়েছে, মোটেই দেরি করতে চায় না, পারলে এখুনি রওনা হয়। পাওয়া গেলে কথা রাখবে হামু, জঙ্গল পেরোতে সাধ্যমত সাহায্য করবে তোমাদের। তখন কোন একটা ছুতোয় আমিও সঙ্গে যাব তোমাদের।'

খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক হামু। কোন ব্যাপারে হুট করে উত্তেজিত হয় না। ভেবে-চিন্তে কাজ করে। কিন্তু কোন ব্যাপারে যদি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সেকাজ থেকে আর ফেরানো যায় না তাকে, শেষ না দেখে ছাড়ে না।

বিট্‌লাঙগোরগা বলেছে, ছেলেরা এসেছে গুপ্তধন খুঁজে বের করে জিভারোদের চিরসৌভাগ্য বহাল করার জন্যে, এর চেয়ে খুশির খবর আর কি হতে পারে হামুর জন্যে?

এতবড় দায়িত্ব, যাকে তাকে সঙ্গে নেয়া যায় না। বেছে বেছে লোক ঠিক করল হামু। সবাই ভাল যোদ্ধা, তার খুব বিশ্বস্ত। পুমকাকেও নেবে সঙ্গে।

আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল পুমকা। গাঁয়ের ছেলেরা তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। সেদিন থেকে অভিযাত্রীদের কাছছাড়া হয় না সে পারতপক্ষে, ওরা যেখানে যায়, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

'একেবারে আরেক রাফিয়ান,' জিনা মন্তব্য করল।

কিন্তু এসব হালকা রসিকতায় কান দেয়ার মানসিকতা নেই কিশোরের। রবিন আর মুসাও বুঝতে পারছে, কতখানি জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

'গুপ্তধন পাওয়া গেলে তো খুবই ভাল, বাঁচলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু যদি না

পাই, কি হবে ভেবে দেখেছ? ক্যাসাডোর কি অবস্থা হবে? হামু ধরে নেবে, তার সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়েছে, তাকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে, ঠকানো হয়েছে। ঠাণ্ডা মানুষ রাগলে ভয়ানক হয়ে যায়। দেবতার কাছ থেকে এসেছি আমরা, সে-বিশ্বাস হারাবে হামু। ধরে সোজা বলি দিয়ে ফেলবে তখন।'

'তাই তো, এটা তো ভাবিনি!' নিমেষে হাসি হাসি মুখটা কালো হয়ে গেল জিনার।

'যা হবার হবে,' মুসা বলল। 'আমার বিশ্বাস, তুমি ওগুলো খুঁজে পাবেই।'

'বেশি ভরসা করছ মুসা,' কিশোর বলল। 'যদি সত্যি থাকে, হয়তো পাব। কিন্তু যদি না থাকে?'

আট

ধাঁধার তিনটে অংশ, সাবধানে নোট করে নিল কিশোর। ক্যাসাডোর মুখে শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছে, তবু লিখে নিল। অনেক সময়, লেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক জটিল রহস্যের গিঁট খুলে যায়, কিশোরের বেলায়ই কয়েকবার ঘটেছে এই ঘটনা।

বন্ধুদেরকে নিয়ে গাঁয়ের ধারে বিশাল এক গাছের ছায়ায় এসে বসল সে। ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করবে। খানিক দূরে বসে উৎসুক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল রাফিয়ান আর পুমকা।

দূরে কুঁড়ের দরজায় বসে এদিকেই ফিরে রয়েছে ক্যাসাডো। সে কি ভাবছে, জানে না ছেলেরা। সে ভাবছে, কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নিজের ওপরই রেগে গেছে। যাওয়ার সব যোগাড় করে ফেলেছে হামু, এখন তাকে আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না, কিছু বলেই বোঝানো যাবে না। যেতে না চাইলে খারাপ অর্থ করবে। ভাল বিপদেই পড়া গেছে। কেন যে বাচ্চাদের কথায় নাচলাম! ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা তো আমিও অনেক করেছি। পেরেছি? কয়েকটা ছেলে পারবে, কেন বিশ্বাস করতে গেলাম?

ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে কিশোর। সামনে খোলা নোটবুক। 'পুকুরের ঠিক মাঝখানে পড়বে সূর্য,' বিড়বিড় করল সে। 'তারপর পশ্চিমে দেখতে পাবে অস্তপ্রায় চন্দ্র। তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে। মানে কি?'

কেউ জবাব দিল না।

'তিনটে ধাঁধা,' আবার বলল সে, 'একটার সঙ্গে আরেকটা কোনভাবে গাঁথা।'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'দ্বিতীয় ধাঁধাটা শুরু হয়েছে *তারপর* দিয়ে। তৃতীয়টা শুরু হয়েছে *তারও পরে* দিয়ে। সিরিয়াল ঠিকই আছে।'

'হুঁম!' মাথা দোলাল জিনা।

মুসা কিছুই বলল না। মাথাখাটানো নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তার, ধাঁধা আর বুদ্ধির কচকচি ভালও লাগে না।

'পুকুর তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু তাতে সূর্য পড়ে কিভাবে?'

'সূর্য ডোবার কথা বলেনি তো?' রবিন বলল।

'সেটাও অসম্ভব, পুকুরে সূর্য ডোবে না।'

'তাহলে কথাটা হয়তো অন্য কিছু ছিল, মুখে মুখে বিকৃত হয়েছে।'

'তা হতে পারে,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কথাটা হয়তো ছিল রোদ পড়ে···না না, তা-ও না, রোদ পড়লে শুধু মাঝখানে পড়বে কেন? সারা পুকুরেই পড়বে। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, পুকুরের মাঝখানে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়াকে বুঝিয়েছে। তীরে দাঁড়িয়েই হয়তো দেখা যায় সেটা।'

'ঠিক বলেছ!' নিজের উরুতে চাপড় মারল রবিন। 'দুপুর বেলা পুকুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়তেই পারে। পুকুরটা খুঁজে বের করব। তারপরের ধাঁধাটা?'

'তারপর পশ্চিমে দেখতে পাবে অস্তপ্রায় চন্দ্র,' পড়ল কিশোর।

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। 'এইটা কি ভাবে সম্ভব? এর কোন মানেই হয় না। ধরা যাক, পুকুরটা আমরা খুঁজে পেলাম, যাতে ঠিক দুপুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু ওই সময় চাঁদ দেখব কি করে, তা-ও পশ্চিমে, আবার অস্তগামী? তারও ওপর রয়েছে জঙ্গল, উঁচু উঁচু গাছ, সত্যি সত্যি যখন অস্ত যায়, তখনও তো দেখা যাবে না।'

'ভূগোলের কোন গোলমাল হয়তো আছে ওই এলাকায়,' মিনমিন করে বলল মুসা।

'আরে দূর!' ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল যেন রবিন। 'যত ভৌগোলিক গোলমালই হোক, দুপুরবেলা চাঁদ ডুবতে দেখা যায় না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'কিশোর, কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না। এখানে বসে মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে না। পুকুরটা খুঁজে বের করার পর হয়তো কিছু বোঝা যাবে।'

'ওটা কোথায় আছে, কি করে জানছ?'

'ক্যাসাডো বলল না, এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা জলা জায়গা আছে। পুকুরটা সম্ভবত ওখানে। চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রাখলে রোদই পড়বে না ঠিকমত, থাকত সূর্যের প্রতিবিম্ব।'

'কিন্তু ওখানে যাওয়া খুব কঠিন, ক্যাসাডো একথাও বলেছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, নানারকম হিংস্র জানোয়ার আছে, বিষাক্ত পোকামাকড় আছে। যেতে অনেক সময়ও লাগবে।'

'লাগুক না,' কিশোর বলল। 'সময়ের তোয়াক্কা কে করছে? সময়টা আমাদের জন্যে কোন সমস্যা না, যত খুশি লাগুক। হ্যাঁ, এবার তৃতীয় ধাঁধাটা কি বলে দেখি।'

নোটবুকটা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে পুমকা। সাদা কাগজে বিজিবিজি কালো অক্ষরগুলো খুদে গোবরে পোকার মত লাগছে তার কাছে, ব্যাপারটা ভারি মজার আর রহস্যময় মনে হচ্ছে।

তার হাত থেকে নোট বই নিয়ে ধাঁধাটা বের করে পড়ল কিশোর, 'তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।'

'এটা সহজ,' জিনা বলল।

'তাই মনে হচ্ছে?' মুসার কাছে সহজ লাগছে না।

'তাই তো।'

'কি?'

'গুপ্তধন। হলুদ দেবী মানে হলুদ কোন মূর্তি-টুর্তি হবে, আইডল্।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' জিনার কথায় সায় দিল রবিন। 'হলুদ বলেছে তো, তার মানে সোনার মূর্তি।'

'আর সবুজ চোখ কোন মূল্যবান পাথর?' মুসার প্রশ্ন।

'সম্ভবত পান্না,' কিশোর জবাব দিল। 'ব্রাজিলে এক সময় খনি থেকে দারুণ দারুণ পান্না তোলা হত। হয়তো প্রাচীন সেই সভ্যতার যুগে…'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না মুসা। 'হুররে!' বলে চেঁচিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। 'হয়ে গেছে কাজ। সমাধান করে ফেলেছি আমরা।'

কিছুই বুঝল না পুমকা, কিন্তু মুসার আনন্দ সংক্রামিত হলো তার মাঝে। সে-ও লাফাতে শুরু করল। যোগ দিল রাফিয়ান। জিনা আর বসে থাকে কি করে? রবিনই বা কেন বসে থাকবে? বসে রইল শুধু কিশোর। সে বুঝতে পারছে, আসলে কোন সমাধান হয়নি। এত সহজ নয় ব্যাপারটা। কিন্তু সেটা বলে বন্ধুদের আনন্দে বাধা দিতে চাইল না।

কুঁড়ের দরজায় বসে ছেলেদের আনন্দ দেখে ক্যাসাডোর মুখও উজ্জ্বল হলো। সে ধরেই নিল, ধাঁধার সমাধান হয়ে গেছে। উঠল। পায়ে পায়ে এগোল সে, জানার জন্যে।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। হামু দলবল নিয়ে তৈরি।

ওঝা বিট্‌লাঙগোরগার নির্দেশ মত শুভদিন শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ল দলটা।

জিভারো গাঁয়ের মাইল কয়েক পর থেকেই শুরু হলো ঘন জঙ্গল। লতা এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হাঁটাই মুশকিল।

শুরুতে যা ছিল, তার চেয়ে গতি অনেক কমে গেল।

আগে আগে চলেছে কয়েকজন জিভারো যোদ্ধা, ওরা পথ-প্রদর্শক। তাদের পেছনে সর্দার হামু আর তার ছেলে, ঠিক পেছনেই ওঝা। তার পরে মালপত্র বাহকদের সঙ্গে ছেলেরা। রাফিয়ান তাদের পাশেই চলছে।

ওরা যেদিন রওনা হয়েছে, তার আগের দিন প্লেনে গিয়ে শেষবারের মত এস ও

এস পাঠিয়েছে ক্যাসাডো, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোন জবাব মেলেনি।

'হলো না!' ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলেছে বৈমানিক। 'যাকগে, যা হওয়ার হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না আমাদের। ফিরে এসে আবার যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাব। অবশ্য যদি ফিরতে পারি। যা ভয়ানক জঙ্গল।'

সামনে যারা চলেছে, তাদের হাতে ভোজালির মত বড় ছুরি। ওগুলো দিয়ে ঘন ঝোপ আর লতা কেটে পথ করে নিচ্ছে। খুব কষ্টকর আর ধীর কাজ।

অসহ্য ভ্যাপসা গরমে ঘামছে ছেলেরা। আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে সে ঘাম, ভীষণ অস্বস্তি হয়।

রাফিয়ানেরও জিভ বেরিয়ে পড়েছে, হাঁপাচ্ছে। এই গরম সে-ও সইতে পারছে না।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কুঁজো করে ফেলেছে পিঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে, চাপা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।

কুকুরটার মতই দাঁড়িয়ে গেছে জিভারোরা। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। রাফিয়ানের মতই বিপদের গন্ধ পেয়েছে ওরাও।

'জাগুয়ার!' ফিসফিস করে বলল ক্যাসাডো।

'ব্রাজিলের জঙ্গলের ভয়ঙ্করতম জানোয়ার জাগুয়ার,' বলল মুসা। ইদানীং জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। কারণও আছে। তার বাবা মিস্টার রাফাত আমানের মাথায় ঢুকেছে, জানোয়ারের ব্যবসা সাংঘাতিক লাভজনক। দেশবিদেশ থেকে দুর্লভ জানোয়ার ধরে এনে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জন্তুজানোয়ার পোষার সংগঠনগুলোতে বিক্রি করা যায়, যথেষ্ট চাহিদা। লস অ্যাঞ্জেলেসে মাত্র একজন ব্যবসায়ী আছে, তা-ও খুব ভাল ব্যবসায়ী নয়, চাহিদামত সরবরাহ করতে পারে না। ব্যবসাটা খুব মনে ধরেছে মুসার বাবার। সেটা আবার কথায় কথায় জানিয়েছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাকে। ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসার দিকে এমনিতেই ঝোঁক রাশেদ চাচার, মুসার বাবার কথায় লাফিয়ে উঠেছেন, পার্টনারশিপে ব্যবসা করবেন দু-জনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী বোরিস আর রোভারের সাহায্যে অনেকখানি জায়গার জঞ্জাল পরিষ্কার করে সেখানে জানোয়ার রাখার খাঁচাও বসাতে শুরু করেছেন। পড়াশোনা শুরু করেছেন মিস্টার আমান, তাঁর দেখাদেখি মুসাও। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে যত বই পাচ্ছেন সব কিনে এনে পড়ে ফেলছেন। কিভাবে ধরতে হবে, সেটা জানার জন্যে, 'প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং' নিচ্ছেন মাস্টার রেখে। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে মুসা। এই জন্তুজানোয়ার ধরে এনে বিক্রি করার ব্যবসা কতখানি লাভজনক হবে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোর বা মুসার, কিন্তু সাংঘাতিক সব অভিযানে বেরোতে পারবে বুঝতে পেরে ভীষণ আগ্রহী হয়েছে ওরাও। রাশেদ চাচার সংগ্রহ করা বইগুলো প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে কিশোর।

'কত বড় হয়?' জানতে চাইল জিনা।

'পূর্ণবয়স্ক জাগুয়ার দেড়শো কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়,' গড়গড় করে মুখস্থবিদ্যা ঝাড়ল মুসা। 'প্রচণ্ড শক্তি। গতি আর ক্ষিপ্রতা চমকে দেয়ার মত। আর রঙ...রঙ... চিতার মত। চিতা বাঘের মত ফুটকি...'

ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। তুলনা করা কঠিন। নাম শুনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি ছেলেদের, কিন্তু ডাক শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। ডাকই যার এমন, কতখানি ভয়ানক জানোয়ার সে!

ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে বলে হাতের রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরল হামু। পা টিপে টিপে এগোল চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

ভেবে অবাক হয় ক্যাসাডো, রাইফেল আর গুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করে হামু? অনেক চেষ্টা করেছে বৈমানিক, রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে তার কাছে। জানতে পারেনি।

পাথর হয়ে গেছে যেন সবাই। চোখের পাতা নাড়তে ভয় পাচ্ছে। এক চিৎকারেই কাঁপুনি তুলে দিয়েছে জাগুয়ার।

গোঁ গোঁ করেই চলেছে রাফিয়ান, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। শক্ত করে তার কলার চেপে ধরে রেখেছে জিনা। কোনভাবেই গোঙানি থামাতে না পেরে শেষে মুখ চেপে ধরল।

একটি মাত্র গুলির শব্দের পর অখণ্ড নীরবতা।

হাসিমুখে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হামু।

এই হাসির অর্থ জানা আছে জিভারোদের। শোরগোল তুলে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের ভেতরে। বেরিয়ে এল খানিক পরেই। টানতে টানতে নিয়ে এসেছে শিকার।

জানোয়ারটা আসলেই বড়!

অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে সর্দারের প্রশংসা করল যোদ্ধারা। তারপর জাগুয়ারের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল।

আবার শুরু হলো চলা। জাগুয়ারের ডাক আর চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে ছেলেরা, চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত। শুরুতে যে হাসি হাসি ভাবটা ছিল, এখন আর নেই।

দুই দিন পর শুরু হলো জলাভূমি।

গত দু-দিনের যাত্রাটা সুখকর হয়নি মোটেও। আঠাল গরম, ভেজা পথ, মশা তাড়ানোর জন্যে রাতে ক্যাম্পের আগুনের ধোঁয়া, সারাক্ষণ হিংস্র জানোয়ারের আনাগোনা, ভাল লাগার কথাও নয়। জাগুয়ারটা মারার পর থেকে হাঁটার সময়ও স্বস্তি পায়নি ছেলেরা। মনে হয়েছে, এই বুঝি অন্ধকার কোন ঝোপ থেকে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ল আরেকটা জাগুয়ার।

ব্রাজিলের জঙ্গলের জলা কেমন, অস্পষ্ট ধারণা আছে বটে ছেলেদের, কিন্তু

এতখানি খারাপ, কল্পনাও করেনি। এখনও ভালমত শুরু হয়নি জলাভূমি, তাতেই এই অবস্থা, আসল জায়গায় গেলে কেমন হবে ভেবে ভয় পেল ওরা।

বড় বড় গাছ ডালপাতা ছড়িয়ে রেখেছে, প্রায় প্রতিটি গাছের নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নালা, নালার জাল বলা চলে। বনতলে আবছা অন্ধকার, বাষ্প উঠছে। এত আঠা করে দেয় শরীর, গায়ে জামাকাপড় রাখাই দায়—কেন শুধু পাতার আচ্ছাদন কোমরে জড়ায় এখানকার ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল। যেখানে পানি নেই, সেখানটাও শুকনো নয়, প্যাচপেচে কাদা। পচা পাতার গন্ধে বাতাস ভারি। ওসব পাতার ভেতরে ভেতরে কিলবিল করছে জোঁক আর নানারকম পোকামাকড়, কোন কোনটা সাংঘাতিক বিষাক্ত।

'আস্ত নরক!' নাক কুঁচকাল জিনা। 'এসব জায়গায় মানুষ আসে নাকি!'

'তাহলে আমরা এলাম কেন?' ভুরু নাচাল মুসা, 'আমরা কি মানুষ নই?'

'আমরা কি আর ইচ্ছে করে এসেছি? ঠেকায় পড়ে।'

জবাব নেই মুসার। চুপ হয়ে গেল।

চওড়া একটা খালের ভেজা তীর ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে লাফিয়ে সরে এল রবিন। ঝপাং করে গিয়ে পানিতে পড়ল একটা জীব। গাছের গুঁড়ি মনে করে ওটার ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল সে।

'অ্যালিগেটর!' আবার বিদ্যা ঝাড়তে শুরু করল মুসা। 'খুব পাজি জীব। দেখেশুনে পা ফেলবে।'

কিন্তু খানিক পরেই মুসা নিজে যখন একটা অ্যালিগেটরের ওপর পা ফেলল, আর ঝাড়া দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে পালাল ওটা, হাত ধরে টেনে তুলে গম্ভীর মুখে বলল রবিন, 'অ্যালিগেটর যে কুমিরের এক প্রজাতি, তা কি জানো? বড়গুলো মানুষখেকোও হয়। ঠিকই বলেছ, খুব পাজি জীব। সুতরাং, সাবধান, কানার মত পা ফেলো না। শেষে অ্যালিগেটরের নাস্তা হয়ে যাবে।'

হেসে উঠল জিনা আর কিশোর, খুব একহাত নিয়েছে রবিন।

ক্যাসাডোও হাসি চাপতে পারল না।

ইনডিয়ানরা তো দাঁত বের করে হাসছে মুসার অবস্থা দেখে।

বেশ অনেকখানি পথ পেরোল সেদিন দলটা। খালের পাড়ের কুচকুচে কালো মাটি নরম, স্পঞ্জের মত, পা পড়লে দেবে যায়। তোলার সময় আবার কামড়ে ধরে রাখে। কলা পাতা কেটে আনল ইনডিয়ানরা। সেগুলো দিয়ে পা মুড়ে লতা দিয়ে বাঁধল। এই আদিম জুতো বেশ কাজের। কাদা লাগে না, মাটির কামড় বসে না। তাছাড়া পোকামাকড়ের কামড়ও ঠেকায়।

রবিনের আহত গোড়ালি আবার ব্যথা শুরু করেছে। জ্বর জ্বর লাগছে তার।

'পুকুরটা কোথায় পাওয়া যাবে?' বিকেলের দিকে বলল সে। 'আর তো পারি না। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার অবস্থা।

'ডজন ডজন পুকুর আর ডোবা তো পেরিয়ে এলাম,' বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' কিশোর চিন্তিত। 'ওগুলোর কোনটাই নয়। এত কালো আর ঘোলা ওগুলোর পানি, চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রেখেছে, ওগুলোতে রোদই পড়ে না ঠিকমত। মাঝদুপুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে কি করে? তাছাড়া ওগুলোর ধারেকাছে কোন পাহাড় নেই।'

'তবে,' রবিন বলল, 'মনে হয়, পেয়ে যাবই। কিশোর, আরেকটা কথা ভেবেছ? ধাঁধা অনেক পুরানো। যখনকার কথা, তখন হয়তো পুকুরপাড়ে গাছ ছিল না। কিন্তু এতদিনে কি জন্মায়নি? কে সাফসুতরো করে রাখতে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাসাডো। 'যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু আমার ধারণা, আরও বড় কোন পুকুর, কিংবা ছোটখাট হ্রদের কথা বলা হয়েছে। যা দেখলাম ওগুলো সবই প্রায় ডোবা। যারা এই ধাঁধা বানিয়েছে, তারা যে বুদ্ধিমান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন দেখল, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে, গুপ্তধনগুলো লুকিয়ে ফেলল। সেই *তারা* বোধহয় চন্দ্রমন্দিরের ধর্মগুরুর দল। কেন লুকিয়েছে, তারাই জানে। তবে নিশ্চয় এমন কোথাও লুকায়নি, সহজেই যেখানকার চিহ্ন মুছে যাবে, অল্প কিছুদিন পরেই আর চেনা যাবে না। তারমানে, ধরে নেয়া যায়, এমন কোথাও লুকিয়েছে, অনেক বছর পরেও যে জায়গাটা নষ্ট হবে না।'

'সেটা হলেই ভাল,' জিনা বলল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' ক্যাসাডোকে বলল কিশোর। 'তা-ই করা হয়েছে।'

পরদিন ইয়াপুরার একটা শাখা-নদীর তীরে পৌঁছল ওরা।

সরু নদী, খালই বলা চলে। এক ধারে জলা, অন্য ধারে ঘন জঙ্গল, কোথাও কোথাও অনেক সরে গেছে গাছপালা। ওসব জায়গায় বনের সীমানা আর পানির সীমানার মাঝে শুকনো চরা, আঠাল মাটির নাম নিশানাও নেই। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। একই জায়গায় শতরূপ।

গত কয়দিনে কাহিল হয়ে পড়েছে গোয়েন্দারা। সেটা দেখে হামুর সঙ্গে পরামর্শ করল ক্যাসাডো। সর্দার দেখল, শুধু দেবতার ছেলেরাই নয়, তার নিজের ছেলেও কাহিল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া খাবার ফুরিয়ে এসেছে, শিকার করা দরকার। ভেবেচিন্তে পুরো একটা দিন বালির চরায় বিশ্রামের কথা ঘোষণা করল হামু। ছেলেরা বিশ্রাম করবে, তাদের সঙ্গে থাকবে কুলিরা। যোদ্ধারা শিকারে যাবে।

দলবল নিয়ে শিকারে চলে গেল হামু।

আগুন জ্বেলে রান্নায় ব্যস্ত হলো কুলিদের কেউ, কেউ স্রেফ হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইল।

জায়গাটা সুন্দর। ঝকঝকে সাদা বালি। নদীর পানিও টলটলে পরিষ্কার।

ক্যাসাডো আর মুখোশ রাখতে পারছে না মুখে। কত আর পারা যায়? গাঁয়ে থাকতে তো রাতের বেলা অন্তত খুলে রাখতে পারত। কিন্তু অভিযানে বেরোনোর পর সবার সঙ্গে একসাথে ঘুমাতে হয়, ফলে খুলতে পারে না।

কিন্তু এই গরমের মধ্যে নদীর পানির হাতছানি আর ঠেকাতে পারল না। কুলিদের কাছ থেকে সরে এল। এক জায়গায় পুমকা আর ছেলেরা বসে আছে। সেখানে এসে মুখোশ খুলে ফেলল সে।

ওঝার মুখ দেখতে পারায় নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করল পুমকা।

'গোসল করবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাসাডো।

ছেলেরাও সে-কথাই ভাবছিল, সে বলার পর আর দেরি করল না। জিনা ছাড়া বাকি সবাই টান দিয়ে দিয়ে কাপড় খুলে ফেলল। পুমকার কাপড়ই নেই, কোমরের আচ্ছাদন খোলার দরকার হয় না। কাপড়ের মত ভেজে না। পানি লাগলে ঝাড়া দিলেই পড়ে যায়।

নদীতে নামার আগে ভালমত দেখে নিল ওরা, নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে ওখানে অ্যালিগেটর নেই।

দাপাদাপি শুরু করল সবাই। ডুব দিচ্ছে, একে অন্যকে পানি ছিটাচ্ছে।

সব চেয়ে বেশি খুশি রাফিয়ান।

'কুত্তাটা খুব ভাল,' বলল পুমকা।

খুশি হলো জিনা। 'একটা ডাল ছুঁড়ে দিয়ে দেখো না, কেমন সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে। যত দূরেই ফেলো, নিয়ে আসবে।'

নতুন ধরনের একটা খেলা পেয়ে গেল পুমকা। বার বার ডাল ছুঁড়ে ফেলে পানিতে, সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে রাফিয়ান। নদীটা তেমন চওড়া নয়। জোরে একটা ডাল ছুঁড়ে মারল পুমকা। অন্য পাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল ডালটা। চেঁচিয়ে বলল পুমকা, 'যাও তো দেখি, নিয়ে এসো। বাপের ব্যাটা বলব তাহলে।

এটা একটা কাজ হলো নাকি? এত সহজেই যদি 'বাপের ব্যাটা' হওয়া যায়, ছাড়ে কে? রওনা হয়ে গেল রাফিয়ান। হাসিমুখে চেয়ে আছে সবাই।

অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে রাফিয়ান, হঠাৎ হাসি মুছে গেল পুমকার মুখ থেকে।

তার এই পরিবর্তন লক্ষ করল জিনা। পুমকার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে তারও মুখের রঙ পাল্টে গেল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, তাতে আতঙ্ক।

মস্ত এক সাপ। একটা গাছের ডাল থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে রাফিয়ানের দিকে। কুকুরটা টের পায়নি।

মুসাও দেখেছে সাপটা। 'অ্যানাকোণ্ডা!' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সাপ। এক নম্বর হারামী।'

'ক্যানোডি! ক্যানোডি!' অ্যানাকোণ্ডার জিভারো নাম। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে পুমকার, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান, দেখে ফেলেছে সাপটাকে।

'খালি সাপের বয়ান দিচ্ছ তোমরা,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কিছু একটা করা দরকার।'

পাঁচ-ছয় মিটার লম্বা হবে সাপটা। ভীষণ মোটা। জলপাই-সবুজের ওপর কালো ফুটকি।

'জলদি!' মুসা বলল। 'পুমকা, কুলিদের ওখান থেকে লাঠি নিয়ে এসো কয়েকটা। কুইক!' বইয়ে পড়েছে কি করে বড় সাপ তাড়াতে হয়।

এক দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা লাঠি নিয়ে এল পুমকা।

একটা লাঠি নিয়ে বলল মুসা, 'আমি যা করব, সবাই করবে। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করব।'

লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে পানি পেটাতে শুরু করল ছেলেরা, ক্যাসাডোও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল সকলেই।

'মুসা, অযথা চেঁচাচ্ছি,' জোরে বলল রবিন। 'সাপের কান নেই, শব্দ শোনে না।

'তাই তো! ঠিক আছে, পেটানো থামিও না। কম্পন টের পাবে। ভড়কে যেতে পারে।

ঠিকই বলেছে মুসা।

সাপটা বোধহয় ভাবল : *আহ্, এ-কি জ্বালাতন! কি কাঁপাটাই না কাঁপছে পানি। ঝড় উঠল নাকিরে বাবা? শুরু করেছে কি দু-পেয়ে জীবগুলো? যে চারপেয়েটাকে ধরতে যাচ্ছি, সেটাকেও তো চিনতে পারছি না। বানর কিংবা শুয়োরের মত মোটেও নয়। খেতে কেমন লাগবে কে জানে?*

দ্বিধা করছে সাপটা। তারপর সিদ্ধান্ত নিল : *এই জঘন্য জায়গা থেকে চলে যাওয়াই ভাল। খাওয়ার সময় এত গণ্ডগোল ভাল লাগে? যাই, অন্য কোথাও গিয়ে কিছু ধরে শান্তিতে খাই।*

গাছের ডালে আর ফিরে গেল না সাপটা। পানিতে নেমেছে তো নেমেছেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেসে চলল ভাটির দিকে।

জিনার ডাকে ফিরে আসছে রাফিয়ান, নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে।

মোড়ের কাছে গিয়ে কোণাকুণি সাঁতরাতে শুরু করল সাপটা। দ্রুত হারিয়ে গেল ওপাশে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। 'মুসা, তোমার জন্যেই রাফিয়ান বাঁচল আজ!'

নয়

সবাই প্রশংসা করছে মুসাকে।

রবিন বলল, 'তোমার বই-পড়া কাজে লাগছে। মনে হচ্ছে শিকারী হিসেবে নাম কামাবে। জানোয়ারের ব্যবসার সব দায়দায়িত্ব শেষে না তোমার ঘাড়েই চাপে।'

জবাবে হাসল মুসা। বলল, 'কতবড় দানব, দেখলে! এগুলোকেই ধরে ধরে

খায় ইনডিয়ানরা। ওরা আরও বড় দানব।'

হেসে উঠল ক্যাসাডো। 'স্বাদ কিন্তু ভালই। আমি খেয়ে দেখছি। ছোটগুলোর চেয়ে বড়গুলো অনেক বেশি টেস্ট। খাবে নাকি?'

মুসা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। বোঝা গেল খুব একটা অমত নেই। কিন্তু জিনা তাড়াতাড়ি দু-হাত নেড়ে বলল, 'না, বাবা, না, আমি নেই। সাপের গোস্ত! ওয়াক-থুহ্!'

'মুসা, তোমার ইচ্ছে আছে মনে হচ্ছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'জন্তু-জানোয়ার ধরতে গেলে কখন কি খেতে হবে কে জানে?' মুসা বলল। 'সব সময় সঙ্গে খাবার না-ও থাকতে পারে। তখন তো জানটা বাঁচাতে হবে কোনমতে।'

কিশোর বলল, 'হারাম…'

'আরে ধ্যাত্তোর, হারাম। জান বাঁচানো ফরজ।'

'এ-তো দেখছি জাত অ্যানিমেল ক্যাচার হয়ে যাচ্ছে!' কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল জিনা।

পাল্টা জবাব দিল মুসা, 'ফাঁকি দিলে কোন কাজেই উন্নতি হয় না।'

হাসাহাসি করছে ছেলেরা, এই সময় হামুকে দেখা গেল। যোদ্ধাদের কারও কাছে কোন শিকার নেই। উদ্বিগ্ন, চোখেমুখে ভয়।

তাড়াহুড়ো করে মুখোশ পরে ফেলেছে ক্যাসাডো। সোজা তার কাছে এসে থামল হামু। প্রচুর হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল কিছু। বেশির ভাগ শব্দই বুঝল না ছেলেরা।

ইংরেজিতে তাদেরকে জানাল ক্যাসাডো, 'হামু বলছে, শিকার মেলেনি। তার বদলে জঙ্গলের ভেতর দেখে এসেছে তাদের চিরশত্রু ট্র্যাকো ইনডিয়ানদের পায়ের ছাপ। ভয়াবহ যোদ্ধা ওরা। সুযোগ পেলেই অন্য গোত্রের ইনডিয়ানদের আক্রমণ করে বসে। সব সময় একটা যুদ্ধং-দেহী ভাব। কাজেই একেবারে চুপ, টুঁ শব্দ করবে না। হামু বলছে, এখন থেকে নড়াও উচিত হবে না, তাহলে টের পেয়ে যাবে ট্র্যাকোরা। ওরা নাকি একটা জাগুয়ারের পিছু নিয়েছে।'

কিন্তু ট্র্যাকোরা যে টের পেয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, বুঝতে পারেনি হামু। জিভারোদের পায়ের ছাপ দেখে ফেলেছে একজন ট্র্যাকো যোদ্ধা। হামুর দলের পিছু নিয়ে চলে এসেছে। বনের ভেতর তাদের সতর্ক নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে রাফিয়ানের। চাপা গলায় গাঁউ করে উঠল।

'চুপ!' তার কানের কাছে ধমক দিল জিনা নিচু স্বরে। 'চুপ থাক!'

ইশারায় কুলিদের চুপ থাকতে বলল হামু।

যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সবাই। কুলিদের হাতেও লাঠি, বল্লম কিংবা তীর-ধনু।

'চায় কি ব্যাটারা?' কথা না বলে থাকতে পারল না মুসা।

'ওরা হয়তো ভাবছে, হামু কোন বড় শিকার পেয়েছে,' প্রায় শোনা যায় না, এমন ভাবে বলল ওঝা। 'ওটা ছিনিয়ে নিতে চায়। যখন দেখবে শিকার নেই, আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে লুট করে নিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই যদি জিততে পারে,' রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

তাদের যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে ট্র্যাকোরা, আর তারা এই গহন বনে না খেয়ে মরবে, এটা ভাবতেই ভাল লাগছে না কিশোরের। ফন্দি আঁটছে সে মনে মনে। ফিফটি-ফিফটি চান্স যখন, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

জিনার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পুমকার আতঙ্কিত চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারছে ট্র্যাকোরা কতটা ভয়ঙ্কর। মুসার দিকে তাকাল রবিন। দুজনের চোখেই ভয়। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

'মিস্টার ক্যাসাডো,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আপনার মুখোশটা দিন। আর যোদ্ধাদের বলুন, ওদের মাথা থেকে কিছু পালক খুলে দিতে। জলদি!'

কেন চাইছে ওগুলো, বুঝতে পারল না ক্যাসাডো। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মুখোশটা খুলে দিল। যোদ্ধাদেরকে বলতেই ওরাও পালক খুলে দিল।

তাদের কাছ থেকে কয়েকটা বিচিত্র মালা নিয়ে রাফিয়ানের গলায় পেঁচিয়ে বাঁধল কিশোর। মাথায় আটকে দিল জিভারোদের মাথার একটা বন্ধনী, তাতে কয়েকটা পালক লাগানো। নিজে পড়ল মুখোশটা। মাথায় পালক গুঁজল।

অবাক হয়ে দেখছে সবাই। সর্দার হামুও এই বিচিত্র সাজ দেখে স্তম্ভিত। করছে কি দেবতার ছেলে?

রাফিয়ানকে নিয়ে সামনে ছুটে গেল কিশোর, জঙ্গলের দিকে।

ঠিক ওই মুহূর্তে ঝোপ দু-হাতে ফাঁক করে বেরিয়ে এল দশ-বারোজন ট্র্যাকো, জিভারোদের আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না। কিশোর আর কুকুরটার দিকে চোখ পড়তেই পাথরের মত জমে গেল ট্র্যাকো-নেতা। লড়াইয়ের আগে চিৎকার করে যোদ্ধারা, একে বলে যুদ্ধ-চিৎকার। নেতাও ওরকম চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, থেমে গেল মাঝপথেই। এমন অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে দেখেনি সে।

মুখোশটা ভীষণ ভারি, মাথা সোজা রাখতেই কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, দম আটকে যাবে যেন। কিন্তু সে-সব পরোয়া না করে গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে হাত-পা নেড়ে নাচতে শুরু করল। নাচ মানে টারজান ছবিতে দেখা জংলী মানুষখেকোদের লাফঝাঁপের অবিকল নকল। মুখোশটা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারের কাজ করছে, ফলে কয়েক গুণ জোরাল শোনাল চিৎকার। সঙ্গে গলা মেলাল রাফিয়ান। তুমুল ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল, সেই সঙ্গে তার বিশেষ নাচ—এক লাফে তিন হাত উঠে বাঁকা হয়ে আবার মাটিতে নামা। শুধু ইনডিয়ানরা কেন, এমন যুগল-নৃত্য জিনা, মুসা রবিন আর ক্যাসাডোও দেখেনি আর।

জিভারোরা চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। তাদের চেয়ে বেশি

চেঁচাতে পারে দেবতার বাচ্চা, এই প্রথম জানল।

নাচতে নাচতে ট্র্যাকো-নেতার দিকে এগোল কিশোর। বার বার হাত ছুঁড়ছে তার দিকে। আঙুল নির্দেশ করছে, যেন কোন সাংঘাতিক বান মারতে যাচ্ছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'রাফি, যা ধর! দে ব্যাটাকে কামড়ে!'

এ-রকম অনুমতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়, আর কি ছাড়ে রাফিয়ান? ঘেউ ঘেউয়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পড়ল নেতার সামনে। বিশাল হাঁ করে কামড় মারতে গেল তার পায়ের গোছায়।

চোখের পলকে ঘুরে গেল নেতা। কাণ্ড দেখে পিলে চমকে গেছে তার। রাফির কামড় খাওয়ার জন্যে দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঝোপের ধারে। তারপর দৌড়, লেজ তুলেই বলা যায়—কারণ, বিশেষ ওই অঙ্গটা থাকলে সত্যি সত্যি এখন খাড়া হয়ে যেত। এক ছুটে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

নেতারই এই অবস্থা, দলের অন্য যোদ্ধাদের আর দোষ কি। পড়িমড়ি করে দৌড় দিল ওরা নেতার পেছনে, যে যেদিক দিয়ে পারল। ঝোপঝাড় ভেঙে গিয়ে পড়ল বনের ভেতরে।

বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল মুসা। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর জিনা। ক্যাসাডোও হাসছে।

জিভারোরা হাসল না। দেবতার বাচ্চার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে যেন। এক বিন্দু রক্তপাত না, কিছু না, তাড়িয়ে দিল ট্র্যাকোদের। খুব জোরাল কোন মন্ত্র নিশ্চয় পড়েছে, নইলে ট্র্যাকোদের মত হারামী মানুষ এভাবে পালায়?

এগিয়ে এসে কিশোরের সামনে দাঁড়াল হামু। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। তারপর নাচতে শুরু করল তার চারপাশে। দেখাদেখি অন্য যোদ্ধারাও এসে কিশোর আর রাফিয়ানকে ঘিরে নাচতে লাগল। তালে তালে নাড়ছে হাতের বল্লম আর তীর-ধনু। পুমকা নাচছে হাততালি দিয়ে দিয়ে।

নাচ থামল। মুখোশটা ক্যাসাডোকে ফিরিয়ে দিল কিশোর।

ক্যাসাডোও এমন ভঙ্গিতে হাতে নিল, যেন মুখোশটাতে মন্ত্র ভরে দিয়েছিল সে। কাজ শেষ হওয়ার পর ছুঁড়ে দেয়া মন্ত্র বাতাস থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে মুখোশে ভরে তারপর মুখে লাগল।

জিভারোদের আর কোন সন্দেহ রইল না, ক্যাসাডোর মুখোশের মন্ত্রের জোরেই তাড়ানো হয়েছে ট্র্যাকোদের।

এবার সম্মান দেখানোর পালা।

জাগুয়ারের দাঁত গেঁথে তৈরি বিশেষ মালাটা গলা থেকে খুলে কিশোরের গলায় পরিয়ে দিল হামু। তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে লাল-হলুদ আলখেল্লার একটা কোণা সাবধানে ছোঁয়াল কপালে।

এই বার বিপদে পড়ল কিশোর। এই সম্মানের একটা জবাব দেয়া দরকার, জিভারোদের কায়দায়। দেবতার বাচ্চা এই রীতি জানে না, এটা হতেই পারে না,

মানবে না ইনডিয়ানরা। কিন্তু সেই রীতিটা কি? ভুল হলে কি খারাপ ভাবে নেবে ওরা? ভাবার সময়ও নেই। আস্তে করে হাত রাখল হামুর মাথায়। রেখেই বুঝল, ঠিক কাজটি করে ফেলেছে।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জিভারোরা। সর্দারকে আপন করে নেয়া মানেই তাদের সবাইকে আপন করা। দেবতার ছেলে তা-ই করেছে।

ইনডিয়ানদের উচ্ছ্বাস শেষ হলে এগিয়ে এল মুসা, রবিন আর জিনা। কিশোরের বুদ্ধির জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাল। রাফিয়ানকে জড়িয়ে ধরে আদর করল জিনা।

আর ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। সাহস সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসতে পারে ট্র্যাকোরা। তল্পি-তল্পা গুছিয়ে রওনা দিল দলটা। অনেক ঘুরপথে পার হয়ে এল ট্র্যাকোদের এলাকা।

'এতে,' চিন্তিত হয়ে বলল রবিন, 'একটা অসুবিধে হতে পারে। আসল জায়গা পার হয়ে যদি চলে আসি?'

'আসতেও পারি,' কিশোর বলল। 'তবে পাহাড়-টাহার কিছু দেখিনি ওদিকে। পাহাড় না থাকলে উপত্যকা থাকবে না।'

'হ্যাঁ, তা-ও তো বটে।'

'আসল কথা হলো,' মুসা বলল, 'ভাগ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে আমাদের। কপাল ভাল হলে জায়গাটা পাব, খারাপ হলে পাব না।

'আরও কত বিপদ আছে সামনে কে জানে।' জিনা বলল, 'জাগুয়ার গেল, সাপ গেল, ট্র্যাকো গেল। আর কি কি আছে এই জঙ্গলে?'

ও-ধরনের আর কোন বিপদের মুখোমুখি হলো না ওরা। তবে অসুবিধে অনেক হলো। শিকার খুবই সামান্য, ফলে খাবারে টান পড়ল। ইনডিয়ানদের বিশেষ অসুবিধে হলো না, তাদের সঙ্গে জাগুয়ারের মাংস রয়েছে। তবে নদীর ধার থেকে সরে আসার পর পানির কষ্ট দেখা দিল সকলেরই। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে, পানি নেই, অথচ পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশি।

হাঁপিয়ে উঠেছে ছেলেরা, শরীর আর পারছে না। রাফিয়ান সারাক্ষণই জিভ বের করে হাঁপায়। তার ওপর আরও কষ্ট বেচারার—জোঁক আর রক্তচোষা কীট-পতঙ্গে ছেয়ে ফেলেছে শরীর। বেছে দেয় জিনা, তিন গোয়েন্দাও হাত লাগায়। কিন্তু কটা বাছবে? নিজেদের শরীর থেকে তাড়াতে তাড়াতেই অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরদিন বিকেলে পুমকা বলেই ফেলল তার বাবাকে, ভালমত বিশ্রাম না নিলে সে আর চলতে পারবে না। বনের ছেলে সে, সে-ই যখন বলছে পারবে না, শহুরে ছেলেদের অবস্থা বোঝাই যায়।

থামার নির্দেশ দিল হামু।

জায়গায় জায়গায় আগুনের কুণ্ড জ্বালল যোদ্ধারা। রাতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করল।

এতই পরিশ্রান্ত, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। মনে হলো

ফুরুত করে শেষ হয়ে গেল রাতটা। তবে ভোরে চোখ মেলে পালকের মত হালকা মনে হলো সবার শরীর। বেশ ভাল বিশ্রাম হয়েছে।

নাস্তা খেয়ে রওনা হলো দলটা।

রোদ যত চড়ছে, গরম বাড়ছে। পানি নেই। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল সবাই।

ওঝার পরামর্শ চাইল হামু।

বিট্‌লাঙগোরগা বলল, চিন্তা নেই। আরেকটু এগিয়েই পানি পাওয়া যাবে। বলেছে সে আন্দাজে। সামনে উঁচু পর্বত দেখা যাচ্ছে, মাথায় বরফ। উপত্যকায় হ্রদ-টদ কিছু থাকতে পারে, এই ভরসাতেই বলেছে। জানে, ভুল হলে সর্বনাশ হবে। তার জাদু-ক্ষমতার ওপর ইনডিয়ানরা বিশ্বাস হারালে ভীষণ বিপদ হতে পারে।

তবে আপাতত বিপদ কেটে গেল।

পর্বতের তলায় একটা হ্রদ দেখা গেল দুপুর নাগাদ। রোদে ঝকমক করছে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি।

ছুটে গিয়ে জানোয়ারের মত উপুড় হয়ে পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল ইনডিয়ানরা। পেটভরে পানি খেয়ে, গায়ে মাথায় ছিটিয়ে উঠে এল।

ছেলেরা আর ক্যাসাডো খেল আঁজলা ভরে। খুব মিষ্টি। বোধহয় পর্বতের ওপরের বরফ গলা পানি ঝর্না বেয়ে এসে পড়ে এই হ্রদে।

হ্রদটা বেশি বড় না। বড় দিঘির সমান। কিশোরের মনে হলো, এটাই রোধহয় সেই জলাশয়, যেটার কথা বলা হয়েছে ধাঁধায়।

ঠিক দুপুর। সূর্য মাথার ওপরে।

ব্যাপারটা আগে চোখে পড়ল মুসার, তার দৃষ্টিশক্তি খুব জোরাল। 'দেখো দেখো! একেবারে মাঝখানে দেখা যাচ্ছে সূর্যটা। অদ্ভুত, না?'

অন্য ছেলেরাও দেখল।

'বোধহয় উঁচু জায়গায় রয়েছি বলেই দেখতে পাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'ভৌগোলিক আরেকটা ধাঁধা। যাকগে, ওটা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। পশ্চিমে দেখো এখন, চাঁদ দেখা যায় কিনা?'

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল মুসা। মাথা নাড়ল, 'নাহ্ চাঁদ নেই।'

পকেট থেকে কম্পাস বের করল কিশোর। পশ্চিম কোনদিকে, দেখল। তার কাছে ঘেঁষে এসেছে জিভারোরা। চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে।

'পশ্চিম ওদিকে,' হ্রদের অন্য পাড়ের ঘন জঙ্গলের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'এই দিনের বেলায় চাঁদ ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। যদি উঠতও, ওই জঙ্গলের জন্যে দেখা যেত না।'

'আমিও তাই ভাবছি,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট!' বলে উঠল জিনা। 'ওই যে দেখো, ওইই যে,

ওদিকে।'

ক্যাসাডোও দেখেছে ওটা। হাত তুলে দেখাল।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জিভারোরা, ওরাও দেখেছে। ঘন জঙ্গলের দিকে এতক্ষণ চেয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি।

তিন গোয়েন্দা দেখল, পশ্চিমে এক জায়গায় প্রায় পানির ভেতর থেকে উঠে গেছে হালকা ঝোপঝাড়। তার মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মিটার চারেক উঁচু বাসনের মত গোল একটা বস্তু। মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সবুজ বনের মাঝে বিশাল এক মুক্তোর থালা যেন। দাঁড়িয়ে আছে লালচে পাথরের মঞ্চের ওপর।

গোল জিনিসটা কী, কি দিয়ে তৈরি, বুঝতে পারল না ছেলেরা।

ক্যাসাডোও পারল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝেছি। সূর্যের আলো।'

'সূর্যের আলো?' মুসা বুঝতে পারল না।

'বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ছোট ছোট আয়না বসানো রয়েছে চাকাটায়। সূর্যরশ্মি পানিতে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়ছে আয়নাগুলোতে। তাতেই সৃষ্টি হয়েছে ওই কৃত্রিম চাঁদ। আশ্চর্য! এত শত বছর আগেও জানত?'

'কারা জানত? কী?' মুসার প্রশ্ন।

'যারা ওই চক্র বানিয়েছে। সূর্যের আলোতে যে চাঁদ আলোকিত হয়, জানত একথা?'

'হয়তো জানত,' রবিন বলল। 'হাজার হাজার বছর আগেই নাকি মানুষ জ্যোতির্বিদ্যায় উঁচু পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেছিল। মিশরের পিরামিড, ইনকা-পিরামিড, স্টোনহেঞ্জ নাকি তারই স্বাক্ষর...'

'বুদ্ধি ছিল মানতেই হবে,' চক্রটার দিকে হাত তুলল মুসা। 'শুধু কাঁচ দিয়ে এত সুন্দর একটা জিনিস তৈরি করে ফেলল!'

'আমাদের দ্বিতীয় ধাঁধারও জবাব পেয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ,' রবিনের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখন আইডলটা খুঁজে বের করতে পারলেই...'

'কেল্লা ফতে!' তুড়ি বাজাল মুসা।

দ্রুত জ্যোতি হারাচ্ছে কৃত্রিম চাঁদ। কারণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সূর্য, হেলে পড়ছে বলে বিশেষ অ্যাঙ্গেলটা আর থাকছে না। খানিক পরে কোন জ্যোতিই রইল না আর চক্রটায়, অতি সাধারণ একটা পাথরের বাসন।

জিভারোদের দিকে ফিরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল ক্যাসাডো।

খুশিতে হুল্লোড় করে উঠল ইনডিয়ানরা।

ক্যাসাডোর ওপর শ্রদ্ধা, ভক্তিতে গদগদ। হবেই। মুখোশের ক্ষমতায় শত্রু তাড়াতে পারে যে ওঝা, পানির হ্রদ হাজির করে দিতে পারে, যে গুপ্তধন এত

বছরেও কেউ পায়নি, সেটা পাওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারে, তাকে ভক্তি না করে উপায় আছে।

ছেলেদের ওপরও ভক্তি বেড়েছে ওদের।

কাছে থেকে চাঁদটা দেখতে চলল কিশোর। সঙ্গে চলল মুসা, রবিন জিনা ও রাফিয়ান। পেছনে ক্যাসাডো, হামু আর তার দলবল।

'তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।'

শুরুতে হালকা ঝোপঝাড়। কিন্তু খানিক পরে জঙ্গল এত ঘন হলো, পথ করে এগোনোর সাধ্য হলো না ছেলেদের। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে এল। আগে বাড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। পথ কেটে কেটে এগোল।

তিনশো মিটার মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেল ওরা। ক্যাসাডো আর ছেলেরা বুঝতে পারল, অবশেষে দেখা পাওয়া গেছে চন্দ্রমন্দিরের।

সামনে অদ্ভুত একটা বিল্ডিং। সাদা রঙ করা। সামনের দিকটা বিচিত্র—তৃতীয়ার চাঁদের আকার। চাঁদের ঠিক পেটের কাছে গোল বিরাট এক দরজা, ঢোকার জন্যে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অভিযাত্রীদের।

মন্দির দর্শনেই কুঁকড়ে গেল জিভারোদের মন। ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল ওরা, এগোতে সাহস করল না আর।

ছেলেদেরও বুক কাঁপছে। ঘন বনের ভেতরে ওই নির্জন এলাকায় এত পুরানো একটা বাড়ি দেখলে অতি বড় সাহসীরও গা ছমছম করবে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে অস্বস্তি তাড়াল যেন কিশোর। 'এসো, যাই। নিশ্চয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সবুজ-চোখো চন্দ্রদেবী।'

'আরেকটু ভদ্রভাবে সম্মানের সঙ্গে বলো,' নিচু স্বরে বলল মুসা, যেন দেবী সত্যিই শুনতে পাবে।

এগোতে যাবে ওরা, ডেকে থামাল ক্যাসাডো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি?'

'ওই যে, দেখো।'

তিনটে ব্যাগ। প্রায় নতুন। মন্দিরের দরজার কাছেই মাটিতে পড়ে আছে।

'ইয়াল্লা!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'এ-তো সভ্য মানুষ! এখানে এসে ঢুকল কারা?'

'কি জানি?' হাত নাড়ল ক্যাসাডো। 'আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘাউ করে উঠে দৌড় দিল রাফিয়ান। এক ছুটে ঢুকে গেল গোল দরজা দিয়ে। স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে সময় লাগল জিনার। ডাকতে দেরি হয়ে গেল।

'রাফির হলো কি?' মুসা অবাক।

অবাক ক্যাসাডোও হয়েছে। 'ভয় পেল বলে তো মনে হলো না।'

'না; পায়নি,' জিনা বলল। 'চেনা কারও গন্ধ পেয়েছে।'

'অসম্ভব।' রবিন মাথা নাড়ল। 'হতেই পারে না। এখানে চেনা-জানা কে আসতে যাবে?'

'আন্দাজে কথা না বলে চলো না দেখি,' কিশোর বলল।

হাত তুলে জিভারোদের ডাকল ক্যাসাডো। ওরা কাছে এলে বলল, 'কাছাকাছি থেকো। আমরা ভেতরে যাচ্ছি। দরকার হলেই ডাকব। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়বে। ভয় পেয়ে পালিও না যেন।'

এবার নেতৃত্ব নিল ক্যাসাডো। খুব সাবধানে আগে আগে চলল সে, ছেলেরা পেছনে। দরজার কাছে পৌঁছে মুখোশটা খুলে হাতে নিল, একবার দ্বিধা করেই পা রাখল ভেতরে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিধা করল কিশোরও। 'চলো, আমরাও যাই। ওঁকে একা যেতে দেয়া ঠিক হবে না।'

ছেলেরাও ঢুকল মন্দিরে।

আলো খুব কম। ক্যাসাডোর গায়ে ধাক্কা লাগল মুসার। চোখে আলো সইয়ে নেয়ার জন্যে দরজার সামান্য ভেতরেই দাঁড়িয়ে গেছে বৈমানিক।

মন্দিরের দেয়ালের অসংখ্য ফুটো দিয়ে ম্লান আলো আসছে। আবছা আলো চোখে সয়ে এলে দেখল ওরা, বিশাল এক হলরুমে ঢুকেছে। অনেকটা জাহাজের খোলের মত লাগছে ঘরটা। এক সারি বিভিন্ন আকারের স্তম্ভ ঃ ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, ঠিক মাঝের স্তম্ভটার পর থেকে আবার ছোট হওয়া শুরু হয়েছে। কাস্তের মত বাঁকা মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছাত ঠেকা দিয়েছে স্তম্ভগুলো। দু-দিকে দুটো সিঁড়ি। একটা উঠে গেছে চাঁদের বাঁ প্রান্তের কাছে, আরেকটা ডান প্রান্তে। দুটো সিঁড়ির শেষ ধাপের ওপরে ছাতে গোল দুটো ফোকর।

বাঁ সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে মাথা বের করে দেখল কিশোর, ফোকরের বাইরে মস্ত বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর ফেলে রাখা হয়েছে—বলির পাথর। নিশ্চয় নরবলি দেয়া হত ওখানে। পাশেই একটা মঞ্চ, পুরোহিত কিংবা ওঝা দাঁড়াতো হয়তো।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করল ক্যাসাডো। ডান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নেমে এল তাড়াতাড়ি। ওপরে শব্দ।

লুকিয়ে পড়ার আগেই উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল নিচে। ইংরেজিতে বলল কেউ, 'হলো তাহলে ঠিক। আমি তো ভাবলাম গেল টর্চটা।'

দশ

'ওরটেগা!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছে।

দ্রুত নড়ল আলোটা। একে একে পড়ল পাঁচজনের ওপর।

'আরি, কাণ্ড দেখো!' বিশ্বাস করতে পারছে না ওরটেগা, 'ছেলেগুলো। সঙ্গে আরেকজন লোকও আছে!'

ডানের সিঁড়ি দিয়ে আরও দু-জন নেমে এল, চ্যাকো এবং জিম।

ক্যাসাডোই ওঝা বিট্‌লাগুগোরূগা শুনে হেসেই বাঁচে না তিন হাইজ্যাকার।

'ভাল আছ, জিনা?' জিজ্ঞেস করল জিম। 'এসেছ, ভালই হলো। এক সঙ্গে যেতে পারব।'

'তারমানে যাননি আপনারা এখনও?' মুসা বলল। 'আমি তো ভাবছিলাম, আপনারা আমাদের উদ্ধার করতে ফিরে এসেছেন।'

'না, যেতেই পারিনি এখনও,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল জিম। 'জিভারোদের গাঁ থেকে পালিয়ে প্লেনে ফিরে গিয়েছিলাম। তাড়াহুড়ো করে তিনটে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। পথ হারিয়েছি পরের দিনই। চলে এসেছি এদিকে। মন্দিরটা দেখে ঢুকলাম। জানো, কি আবিষ্কার করেছি? এসো, দেখাই।'

ডানের ফোকর দিয়ে ছাতে বেরিয়ে এল ছেলেরা।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

একটা বেদীর ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিরাট দেবী-মূর্তি, নিরেট সোনায় তৈরি। মাথায় সোনার মুকুটের সামনের দিকে রূপালী বাঁকা চাঁদ, রূপা দিয়ে বানিয়ে পরে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মুকুটে। কাঁধে রূপার চাদরের শাল জড়ানো। আশ্চর্য দুটো চোখ, সবুজ দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'পান্না,' ওরটেগা বলল। 'খুলে নেব। ভাল দাম পাওয়া যাবে রিওতে।'

একটা ছুরি বের করে মূর্তিটার দিকে এগোল সে।

তাকে থামাল ক্যাসাডো। 'এক মিনিট। আমরা এখানে কি করে এলাম, জিজ্ঞেস করেননি। আগে শুনুন, তারপর পান্না খুলবেন।'

খুলে বলল সব ক্যাসাডো। 'মূর্তিটা হামুকে দিয়ে দিলে,' কথা শেষ করল সে, 'আমাদের মুক্তি দেবে। সবাই আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব।'

হেসে উঠল চ্যাকো, বিশ্রী শোনাল হাসিটা। 'জিভারোরা জানছে কি করে মূর্তিটা ছিল এখানে? পেছনে আরেকটা ছোট দরজা আছে, চোখ দুটো নিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা, ঢুকে পড়ব জঙ্গলে। ওরা দেখবেও না, জানবেও না কিছু।'

'কিন্তু দরজার বাইরে যে ব্যাগ পড়ে আছে?' রবিন প্রশ্ন তুলল।

'জাহান্নামে যাক ব্যাগ। ওগুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই। ওরটেগা, জলদি খোলো।'

ওরটেগার হাত চেপে ধরল ক্যাসাডো। 'পাগল হয়েছেন! শুনুন, মূর্তিটা অক্ষত অবস্থায় হামুকে দিতে হবে। নইলে সে কোনদিনই আমাদের যেতে দেবে না।'

'আপনাদের কথা কে ভাবছে?' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল চ্যাকো। 'আমি চাই টাকা।'

চুপ করে ছিল জিম। বলল, 'চ্যাকো, জিভারোদের হাত থেকে পালাতে পারবে

না। সহজেই ওরা ধরে ফেলবে। এই জঙ্গল থেকে বেরোতেই যদি না পারো, টাকা পাবে কিভাবে? তার চেয়ে ক্যাসাডো যা বলছে, শোনো। আমাদের সবারই মঙ্গল তাতে।'

কিন্তু চ্যাকো তখন অন্ধ। তার পক্ষ নিল ওরটেগা। মহামূল্যবান পান্না দুটো তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কতখানি বিপদে রয়েছে, আরও কতখানি বাড়বে, বুঝতেই চাইছে না।

ক্যাসাডোও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই পান্না খুলতে দেবে না।

কথা কাটাকাটি, শেষে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। ক্যাসাডোকে ঘুসি মেরে বসল চ্যাকো।

ওকে এমনিতেই পছন্দ করে না রাফিয়ান। তার ওপর ক্যাসাডোকে মারায় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যাকোর ওপর। টুঁটি কামড়ে ধরতে গেল।

বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল চ্যাকো। কুকুরটা উঠে এল তার বুকের ওপর।

চেঁচিয়ে থামতে বলছে জিনা, কিন্তু কানেও ঢুকছে না রাফিয়ানের। রোখ চেপে গেছে তার। চ্যাকোর রক্ত না দেখে ছাড়বে না।

চেঁচামেচি শুনে জিভারোরা ভাবল, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ভেতরে। দুপদাপ করে উঠে এল ছাতে।

হামু বোকা নয়। কুসংস্কারে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু মগজটা তার পরিষ্কার সোনার দেবী-মূর্তি, ওরটেগার হাতে ছুরি, দেবীর চোখের কাছে আঁচড়, কিছুই চোখ এড়াল না তার। বুঝে ফেলল, কি হচ্ছে।

সর্দারের নির্দেশে নিমেষে তিন হাইজ্যাকারকে কাবু করে ফেলল জিভারোরা হাত পিছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধল বুনো লতা দিয়ে।

জিমকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেও লাভ হলো না। এত রেগে গেছে হামু, কারও কথাই শুনল না, এমনকি ওঝার কথাও নয়। সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তিন বন্দী। গ্রাম থেকে পালিয়েছে, তারপর এখানে এসে দেবীর চোখ চুরি করতে চেয়েছে। ওদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সেখানেই ঘোষণা করল হামু, গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে আগামী পূর্ণিমাতেই তিনজনকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে। এটাই ওদের যোগ্য শাস্তি।

যে জিনিসের জন্যে এসেছিল, পাওয়া গেছে, গাঁয়ে ফেরার জন্যে তৈরি হলো দলটা। ছেলেদেরকে আর ক্যাসাডোকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, কথা রেখেছে হামু বলল, যখন যেখান থেকে খুশি স্বর্গে ফিরে যেতে পারে। বাধা দেয়া হবে না।

কিন্তু তিন হাইজ্যাকার আবার ধরা পড়ায় আনন্দ মাটি হলো ছেলেদের তিনজনকে জিভারোদের হাতে রেখে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না ওরা।

'আমাদেরও গাঁয়ে-ফিরে যেতে হবে,' বলল ক্যাসাডো। 'কিছু দিন বিশ্রা

দরকার। নইলে আবার জঙ্গল পাড়ি দিতে পারব না। তাছাড়া সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ওই তিন ব্যাটা। ছাড়ানোর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন বলি দেবে ওদেরকে হামু, মাঝে বেশ কিছুদিন সময় আছে। আশা করি একটা উপায় করে ফেলতে পারব।'

গাঁয়ে ফিরে চলল সবাই।

সোনার মূর্তিটা পালা করে বইল দু-জন যোদ্ধা, মহা-সম্মানের কাজ মনে করল এটাকে ওরা।

গাঁয়ে ফিরে তিন হাইজ্যাকারকে কুঁড়েতে ভরল জিভারোরা। অনেক পাহারাদার রাখা হলো, আর যাতে পালাতে না পারে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হলো।

ছেলেদের ওপর কেউ আর চোখ রাখছে না এখন। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে তারা। ক্যাসাডোও মুক্ত। আলাদা আলাদা কুঁড়েতে না শুয়ে একই কুঁড়েতে রাত কাটায় এখন। ফলে আলাপ-আলোচনার সুবিধে হলো।

'কিন্তু উপায়টা কি এখন?' প্রশ্ন করল জিনা।

'আমারও তাই জিজ্ঞসা,' জবাব দিল বৈমানিক। 'ভাবতে ভাবতে তো মগজ ঘোলা করে ফেললাম, কোন উপায় দেখছি না। ব্যাটাদের ছাড়াই কি করে?'

চুপ করে রইল সবাই।

'দেখি, কি করা যায়!' আবার বলল ক্যাসাডো। 'তবে আগে প্লেনে যেতে হবে একবার। এস ও এস পাঠাতে। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পাঠিয়েই যাব। এখন আর ভয় নেই, আমি দিনের পর দিন না থাকলেও কেউ খোঁজ করবে না।'

ভাগ্য যখন ভাল হতে শুরু করে, সব দিক থেকেই হয়। সেদিন দ্বিতীয়বারের চেষ্টায়ই জবাব পেয়ে গেল ক্যাসাডো। খুশিতে লাফাতে লাফাতে গাঁয়ে ফিরে এল সে।

ঘুম থেকে ছেলেদের ডেকে তুলে জানাল খবরটা। 'পেয়েছি! কাঠ-ব্যবসায়ী কোম্পানির এক দল লোক কাজ করছে বনে। তারাই ধরেছে সিগন্যাল। বলেছে, ব্রাজিল পুলিশকে জানাবে, যত তাড়াতাড়ি পারে। দশ-বারো ঘন্টা পরে আবার যাব প্লেনে। খবর নেব, কদ্দুর কি হলো। যাক, দুঃস্বপ্ন শেষ হতে চলেছে এতদিনে।'

'সময় মত সাহায্য এলেই হয় এখন,' কিশোর বলল। 'পূর্ণিমার আর মাত্র ছয় দিন বাকি।'

সে-কথা ক্যাসাডোর মনে আছে, কিন্তু উপায় এখনও বের করতে পারেনি।

ভাল ঘুম হলো সে-রাতে। ঝরঝরে শরীর মন নিয়ে পরদিন সকালে উঠল অভিযাত্রীরা।

নাস্তা সেরেই প্লেনে চলে গেল ক্যাসাডো।

'ছ-দিনের মধ্যে কি সাহায্য আসবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিশোর?'

'জানি না।'

'না এলে লোকগুলোকে বাঁচানো যাবে না,' মুসা বলল।

অনেক মাথা ঘামাল ওরা, কিন্তু কোন উপায় বেরোল না। তিন হাইজ্যাকারের কপালে বলিই লেখা আছে বোধহয়।

সন্ধ্যায় ফিরে এল ক্যাসাডো। মুখ উজ্জ্বল। 'এতক্ষণে সারা দুনিয়া জেনে গেছে আমাদের খবর।'

চকচকে চোখে সমস্ত শুনল ছেলেরা।

'চার দিনের মধ্যেই আর্মি হেলিকপ্টার আসবে আমাদের নিতে,' বলল ক্যাসাডো। কপ্টার নামার জন্যে একটা ল্যাণ্ডিং প্যাড বানিয়ে ফেলতে হবে আমাদের। সেটা কোন ব্যাপারই না। জিভারোদের দেখিয়ে দিলেই বানিয়ে ফেলতে পারবে। দেবতার ক্যানূ নামবে শুনলে খুব আগ্রহ করে কাজ করবে।'

'তা-তো হলো,' জিনা বলল। 'তিন হাইজ্যাকারের কি হবে?'

হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ক্যাসাডোর। 'সরি, জিনা, ওদের জন্যে কিছু করতে পারছি না। মিলিটারিকে বললে বল প্রয়োগ করবে, তাতে জিভারোদের সঙ্গে লড়াই অনিবার্য। তখন তোমরাও আহত হতে পারো। তিনটে আসামীর জন্যে সে রিস্ক আমি নিতে পারব না।'

'আমাদের নামিয়ে দিয়ে তো ফিরে আসতে পারবে?'

'মনে হয় না। আমাদের যেতেই অনেক সময় লাগবে। তার পর ফিরে আসতে আসতে বলি শেষ হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপার আছে। ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ সহজে উপজাতীয়দের সঙ্গে বিরোধে যাবে না। এমনিতেই বশ্যতা মানতে চায় না ওরা, তার ওপর গোলাগুলি চললে আরও খেপে যাবে। ভাল মানুষ হলে কথা ছিল, তিনটে ক্রিমিন্যালের জন্যে কেন ওদের খেপাতে যাবে সরকার?'

সবাই বিষণ্ণ। রাফিয়ানও বুঝতে পারছে, আনন্দের সময় নয় এটা। লেজ নিচু করে রেখেছে সে, কান ঝুলে পড়েছে। চুপচাপ বসে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'কিন্তু এভাবে তিনটে মানুষকে জবাই করে ফেলবে,' কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না জিনা, 'আর আমরা কিছুই করতে পারব না?'

সে-রাতে কেউ ঠিক মত ঘুমাতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবল কিশোর। কি যেন একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না, ধরতে পারছে না সে। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল, ভেঙে গেল খানিক পরেই। লাফিয়ে উঠে বসল সে। বাইরে তখন ভোরের আলো। ডাকল সবাইকে।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' চোখ রগড়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পথ পেয়ে গেছি।'

'কিসের পথ?'

'ওদের বাঁচানোর।'

ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার চোখ থেকে। অন্যেরাও সতর্ক। কিশোর কি বলে

শোনার জন্যে অধীর।

'কাজটা সহজ হবে না,' কিশোর বলল। 'মিস্টার ক্যাসাডো, আপনার সহায়তা দরকার। ওরটেগাকেও খাটতে হবে।'

'ওরটেগা?' ক্যাসাডো অবাক।

'হ্যাঁ। সে ভেনট্রিলোকুইজম জানে।'

'তাতে কি?' ক্যাসাডোর বিস্ময় বাড়ল। কিছুই বুঝতে পারছে না। 'খুলে বলো।'

'বুঝতে পারছেন না? ধরুন, আরেকবার কথা ছুঁড়ে দিল ওরটেগা। কথাটা বেরোল চন্দ্রদেবীর মুখ দিয়ে...'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল ক্যাসাডো। 'ঠিক বলেছ! ঠিক! সহজেই বোঝাতে পারব হামুকে। দেবীকে অপমান করছে যারা তাদের বিচার দেবীই করুক, রায় দিক। তারপর...তারপর আমি মূর্তিটাকে প্রশ্ন করব, সে জবাব দেবে... চমৎকার! কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস।'

'এখনই এত শিওর হবেন না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'জিভারোরা ইংরেজি জানে না। ওরটেগাও এদের ভাষা জানে না। কথা হবে কোন্ ভাষায়?'

'ওটা এমন কিছু কঠিন না,' ক্যাসাডো বলল। 'জিভারো ভাষায় শব্দ খুবই কম, উচ্চারণও খুব সহজ, তা এতদিনে নিশ্চই বুঝেছ। তাছাড়া প্রশ্ন ঠিক করব আমি, জবাবও। সেই জবাবই মুখস্থ করাব তাকে।'

খুশি হলো সবাই। যত শত্রুতাই করুক, তিনজন মানুষকে বলি দেয়া হবে চোখের সামনে, এটা সহ্য করা যায় না।

সময় নষ্ট করল না ক্যাসাডো। তখুনি গেল হামুর কাছে।

সহজভাবেই মেনে নিল হামু। দেবতা কালুম-কালুম তার দেবীর অপমান হতে দেখেছে, প্রতিশোধ তো নিতেই চাইবে। আর দেবীর বিচার দেবীই করুক, এটা চাওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত। হামু কেন মাঝখান থেকে উল্টোপাল্টা বিচার করে দেবতার কুনজরে পড়তে যাবে?

এক সঙ্গে দুটো কাজ করার হুকুম দিল সে তার লোকজনকে।

দেবতাদের উড়ুক্কু-নৌকা নামার জন্যে 'মঞ্চ' বানানোর নির্দেশ দিল। আরেকটা উঁচু ছোট মঞ্চ বানাতে বলল তার কুঁড়ের সামনে, ওটাতে দেবীকে রাখা হবে। ওখান থেকেই বিচার করবে দেবী।

দেবীর মঞ্চ বানাতে বেশি সময় লাগল না।

খুব ধুমধাম করে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান সেরে দেবীকে মঞ্চে তুলল ওঝা বিলোঙগোরগা। গাঁয়ের সবাই এসে ভক্তি-ভরে প্রণাম করে গেল দেবীকে।

এরপর অপেক্ষার পালা। কবে আসবে সেই শুভক্ষণ, যখন তিন বন্দির বিচার করবে দেবী। সময়টা ওঝা ঠিক করবে।

খুব বেশি সময় নেয়া যাবে না। ওরটেগাকে ভাষা শেখাতে শুরু করল

ক্যাসাডো। তবে জিভারোদের অলক্ষে। সে ওঝা। বন্দিদের কুঁড়েতে তার যাতায়াত কেউ সন্দেহের চোখে দেখল না।

অবশেষে এল সেই দিন।

সকাল থেকেই খুব উত্তেজনা। বিভিন্ন কারণে সবাই উত্তেজিত। গাঁয়ের লোক, তিন গোয়েন্দা, জিনা, বন্দিরা, সবাই।

মঞ্চের সামনে এসে জড় হলো সব লোক। সকালের সোনালী রোদে ঝকঝক করে জ্বলছে চন্দ্রদেবী। নিজের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে স্ত্রীর ঝলমলে রূপকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে যেন তার স্বামী 'সূর্যদেবতা'। ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল ইনডিয়ানরা।

মঞ্চে দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওঝা। যতরকম মালা আর সাজপোশাক আছে, সব আজ গায়ে চাপিয়েছে। সব চেয়ে বিকট চেহারার মুখোশটা পরেছে। অপার্থিব লাগছে তাকে, ভয়ঙ্কর।

ঢিবঢিব করছে ছেলেদের বুক। হবে তো? কাজ হবে?

মঞ্চের পাশে বিশেষ আসনে বসেছে হামু, দু-পাশে আর সামনে বসেছে তার পরিবারের লোকজন। তাদের কাছেই সম্মানজনক দূরত্বে সম্মানিত আসনে বসেছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। জিনার পাশে রাফিয়ান, গম্ভীর হয়ে আছে। বুঝতে পেরেছে, এটা ঘেউ ঘেউ কিংবা হালকা কিছু করার সময় নয়। ফিসফাস কানাঘুষা করছে গাঁয়ের লোক ঃ স্বর্গের কুকুর তো, দেখো, কেমন ভাবভঙ্গি! দেবতার চেয়ে কম কি?

হাত তুলে ইশারা করল হামু।

পলকে থেমে গেল সমস্ত শব্দ।

আবার ইশারা করল সর্দার।

কয়েকজন যোদ্ধা গিয়ে বন্দিদের নিয়ে এল।

চ্যাকোর চেহারা ধসে গেছে। জিম আর ওরটেগা মোটামুটি ঠিকই আছে।

তিন বন্দিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা বক্তৃতা দিল ওঝা। ওরটেগা কিছু কিছু বুঝল, অন্য দু-জন কিছুই বুঝল না। তবে ছেলেরা বুঝল বেশির ভাগই।

ঘন ঘন হাততালিতে ফেটে পড়ল জনতা। আরেকবার দেবীকে প্রণামের ধুম পড়ে গেল।

হাত তুলল বিট্‌লাঙগোরগা।

নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল।

বন্দিদের আরও কাছে আসার ইশারা করল ওঝা।

সময় উপস্থিত। সবাই উত্তেজিত। চোখ মঞ্চের দিকে।

জনতা যাতে শুনতে পায় সে জন্যে চেঁচিয়ে বলল ওঝা, 'হে সম্মানিত দেবী, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?'

ছেলেদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। ঠিকমত বলতে পারবে তো ওরটেগা?

পণ্ড করে দেবে না তো সব?

হঠাৎ শোনা গেল কথা, কাঁপা কাঁপা কথা। পুরুষ কণ্ঠ, না মহিলা, বোঝা গেল না। মনে হলো, দেবীর অনড় ঠোঁটের কাছ থেকেই এল কথাগুলো ঃ *হ্যাঁ, শুনছি!*

অস্ফুট শব্দ করে উঠল জনতা, শব্দের একটা শিহরণ বয়ে গেল যেন। শ্রদ্ধায় আপনাআপনি মাথা নিচু হয়ে গেল জিভারোদের।

'হে সম্মানিত দেবী,' আবার বলল ওঝা, 'ওই তিনজন মানুষকে চিনতে পারছেন?'

জবাব এল ঃ *নিশ্চয় পারছি!* রাগান্বিত মনে হলো দেবীর কণ্ঠ।

পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা। ভালই অভিনয় করছে ওরটেগা। উতরে যাবে মনে হচ্ছে।

ওঝা বলল, 'সর্দার হামু তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়। আপনিও কি তাই চান?'

জবাব ঃ *নিশ্চয়। মৃত্যুদণ্ডই তাদের একমাত্র শাস্তি।*

চমকে উঠল ছেলেরা। বলে কি ওরটেগা? দিল নাকি সব গড়বড় করে?

ভাবার সময় পেল না, তার আগেই শোনা গেল আবার ওঝার প্রশ্ন, 'মৃত্যু কিভাবে হবে তাদের বলুন, হে সম্মানিত দেবী।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। মনস্থির করে নিচ্ছে যেন দেবী। জিভারোদের উত্তেজনা চরমে, নিশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে তারা।

অবশেষে শোনা গেল দেবীর রায় ঃ

স্বর্গে গিয়ে হবে তাদের মৃত্যু। দেবতা কালুম-কালুম নিজের হাতে বলি দেবেন তাদের। প্রচণ্ড ঝড় বইবে তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। পাপীরা ধ্বংস হবে, দেবতার পূজারিরা হবে পুরস্কৃত। তিন বন্দিকে সঙ্গে করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন ওঝা বিট্‌লাঙগোরগা।

রায় শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল ইনডিয়ানরা। কি সাংঘাতিক পাপী ওই তিনজন। দেবতা নিজের হাতে বলি দেবেন, তার মানে মৃত্যুর পরেও তাদের পাপ মোচন হবে না, নরকে জ্বলেপুড়ে মরবে। হাজার রকম শাস্তি পাবে।

তাছাড়া দেবী বলেছেন, সেদিন পাপীরা ধ্বংস হবে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জিভারোরা। দেবীকে বার বার প্রণাম করল। 'বাঁচাও দেবী,' 'তোমার পাপী বান্দাকে ছেড়ে দাও কালুম-কালুম,' এমনি নানারকম গুঞ্জন।

হাত তুলল ওঝা।

চুপ হয়ে গেল গুঞ্জন।

'রায় দিয়েছেন দেবী,' বলল ওঝা। 'সবাই শুনেছ?'

চিৎকার করে জানাল সবাই, শুনেছে।

হামু বলল, 'সম্মানিত বিট্‌লাঙগোরগা, কালুম-কালুমের আদেশ তো শুনলে। বন্দিদেরকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে?'

'নিশ্চয়,' বলল ওঝা। 'দেবতার আদেশ অমান্য করতে পারি? সর্দার হামু, তোমার দেবভক্তির কথা সব আমি বলব কালুম-কালুমকে।'

খুব খুশি হলো সর্দার। বলল, 'আমার গাঁয়ের কথাও বোলো, বিট্‌লাঙগোরগা। আমি কথা দিচ্ছি, যারা এখনও খারাপ আছে, তারা ভাল হয়ে যাবে। কালুম-কালুম যেন শাস্তি না দেন।'

ওঝা বলল, 'বলব।'

সর্দার আর ওঝার বদান্যতায় খুশি হলো জনতা। শতমুখে তারিফ করতে লাগল দু-জনের।

আরও বিমর্ষ মনে হলো তিন বন্দিকে। ভেতরে ভেতরে আসলে পুলকে ফেটে পড়ছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দিল না।

উল্লাস ঢেকে রাখতে খুব কষ্ট হলো ছেলেদের।

আবার অপেক্ষার পালা। কবে আসে হেলিকপ্টার? জিভারোরা অপেক্ষায় রয়েছে কবে নামবে দেবতার উড়ুক্কু-নৌকা?

অবশেষে এল সেই দিন।

ছেলেরা সবে নাস্তা শেষ করেছে, এই সময় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। কপ্টারের শব্দ তাদের কানে এত মধুর শোনায়নি আর কখনও। তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

একের পর এক নামতে লাগল হেলিকপ্টার।

জিভারোদের চোখে ভয় মেশানো কৌতূহল। এমন আজব নৌকা এই প্রথম দেখছে। অতি দুঃসাহসী দু-একজন কাছে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু রোটর ব্লেডের জোরাল বাতাস গায়ে লাগতেই পিছিয়ে গেল, যতখানি না ধাক্কায়, তার চেয়ে অনেক বেশি, ভয়ে ভক্তিতে। এই বাতাস তাদের বিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল শতগুণ। ধরেই নিল, কালুম-কালুম অদৃশ্য ভাবে কাছেই রয়েছেন। তিনি বাতাসের দেবতা, শরীর অদৃশ্য রেখেছেন বটে, কিন্তু বাতাস সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছেই। হেলিকপ্টারগুলোকে এক দফা প্রণাম করে নিল জিভারোরা।

এক সারিতে এগিয়ে গেল স্বর্গবাসীরা, তাদের পেছনে জিভারোদের দীর্ঘ মিছিল। একে একে কপ্টারে উঠল ছেলেরা। আরেকটা কপ্টারে তোলা হলো তিন বন্দিকে। ওঠার সময় এমন ভান করল ওরা, যেন যেতে চায় না।

'চাইবে কেন?' ভাবল জিভারোরা। 'বলির শুয়োর হতে কে যেতে চায়?'

বাকি রইল বিট্‌লাঙগোরগা।

হামুকে কাছে আসার ইশারা করল সে।

এল সর্দার। চোখ ছলছল। ওঝাকে ভালবেসে ফেলেছিল।

মুখোশ খুলে বাড়িয়ে দিল ক্যাসাডো, 'নাও, এটা তোমাকে উপহার দিলাম। এটা দেখে আমাকে মনে কোরো।'

চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারল না সর্দার। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

ওঝার একটা হাত আলগোছে তুলে নিয়ে উল্টো পিঠে চুমু খেল। ধরা গলায় বলল, 'স্বর্গে গিয়ে আমাকে ভুলে যেও না, বিট্‌লাঙগোরগা।'

কপ্টারে উঠল ক্যাসাডো।

এক এক করে আকাশে উঠতে লাগল কপ্টারগুলো।

বকের মত গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছে জিভারোরা।

খোলা দরজা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল কিশোর। ঠিকই চিনতে পারল পুমকা। জবাবে সে-ও নাড়ল। জিভারোরা বুঝল, এটা স্বর্গবাসীদের বিদায় সঙ্কেত। তারাও হাত নাড়তে শুরু করল।

খারাপ লাগল কিশোরের, সহজ-সরল মানুষগুলোকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে এসেছে বলে। কিন্তু এছাড়া আর করারই বা কি ছিল?'

রোদে ঝকমক করছে সোনার মূর্তিটা, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়।

সবুজ বনের উপর দিয়ে উড়ে চলল হেলিকপ্টার।

'ইস্, কি একখান অ্যাডভেঞ্চারই না করে এলাম,' বলল মুসা।

কিশোর আর রবিন জবাব দিল না, জিভারোদের কথা ভাবছে।

জিনা বলল, 'হ্যাঁ, অনেক দিন মনে থাকবে।'

'হউ!' করে সায় জানাল রাফিয়ান।

এগারো

একটা সামরিক বিমানক্ষেত্রে নামল হেলিকপ্টার।

কপ্টার বদল করল অভিযাত্রীরা। আরেকটা বেসামরিক বিমান বন্দরে নিয়ে গেল তারেদকে বেসামরিক হেলিকপ্টার। ওখান থেকে ছোট বিমানে করে ম্যানাও। ম্যানাও থেকে যাত্রীবাহী বড় বিমানে করে পৌছল রিও ডি জেনিরোতে।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। তিন গোয়েন্দা আর জিনা নামল রাফিয়ানকে নিয়ে, ক্যাসাডো নামল। তিন হাইজ্যাকারকে সারা পথ পাহারা দিয়ে এনেছে মিলিটারি পুলিশ। রিও ডি জেনিরোর পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে গেল তারা।

ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে এলেন চার জোড়া দম্পতি। কিশোরের চাচা-চাচী, রবিন, মুসা আর জিনার বাবা-মা, সবাই এসেছেন। যেদিন শুনেছেন ছেলেদের খবর পাওয়া গেছে, সেদিনই ছুটে এসেছেন ব্রাজিলে।

ক্যাসাডোর জন্যেও অপেক্ষা করছে উষ্ণ সম্বর্ধনা। অ্যাভিয়েশন ক্লাবের লোক, তার কিছু কলিগ আর বন্ধুবান্ধব এসেছে তাকে স্বাগত জানাতে। মৃত ধরে নিয়েছিল যাকে, জ্যান্ত হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে, আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল কেউ কেউ।

বিমান বন্দরের লাউঞ্জে ঢুকতেই ছেঁকে ধরল রিপোর্টাররা। ছবির পর ছবি

তোলা হলো। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো অভিযাত্রীদের। শেষে পুলিশকে এসে উদ্ধার করতে হলো।

আরও দিন কয়েক রিও ডি জেনিরোতেই থাকতে হলো ওদের।

তিন হাইজ্যাকারের বিচার শুরু হয়েছে। সাক্ষি দিতে হবে।

ছেলেদের সাক্ষ্যে শাস্তি হালকা হয়ে গেল জিমের। তাকে অল্প কিছুদিনের জেল দিলেন বিচারক। লম্বা জেল হলো ওরটেগা আর চ্যাকোর।

কিন্তু ওরা কিছু মনে করল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি পেয়েছে। তিনজনেই দেখা করতে চাইল তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গে।

দেখা করল ওরা।

জিভারোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বার বার ওদের ধন্যবাদ দিল হাইজ্যাকাররা।

জিম কথা দিল, জেল থেকে বেরিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। ভাল হয়ে যাবে। অপরাধের পথে পা বাড়াবে না আর কোনও দিন।

জেলখানা থেকে ফেরার পথে মুসা বলল, 'কিশোর, আবার বোধহয় আমাদের জঙ্গলে যেতে হবে। আমাজনের জঙ্গলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'বোধহয়।'

****
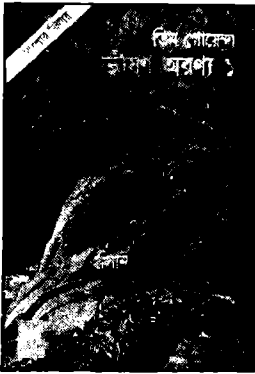
ভীষণ অরণ্য ১

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮

'হ্যাঁ, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী দেখবে,' গল্প করছে কুইটো হোটেলের মালিক ডেবিটো ফেরিও। 'দেখবে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জঙ্গল। বেশির ভাগ জায়গাতেই এখনও সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। খাবারের গুদাম বলা চলে ওটাকে। একদিন সারা দুনিয়াকে খাওয়াবে ওই আমাজন…'

লোকটার বকবক ভাল লাগছে না কিশোর পাশার। তাকে থামানোর জন্যে স্টাফ করা মস্ত এক কুমির দেখিয়ে বলল, 'এত বড় কুমির সত্যি আছে আমাজানে? আমি তো জানতাম…'

'এর চেয়ে বড়ও আছে। জানোয়ার চাও তো? পাবে। এত আছে ওখানে, নিয়ে কূল করতে পারবে না। পৃথিবীর অন্য সব জানোয়ার এক করলেও এত রকমের হবে না। ভুল বললাম, মিস্টার আমান?' মুসার বাবাকে সাক্ষি মানল ফেরিও।

জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান মিস্টার আমানের। ভাল শিকারী। হলিউডে এক সিনেমা কোম্পানিতে খুব উঁচু দরের টেকনিশিয়ানের কাজ করেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েন—চলে যান শিকারে; কিংবা সাগর, হ্রদে মাছ ধরতে। কি শিকার করেননি তিনি? মেকসিকোর কলোরাডোতে পার্বত্য সিংহ, আলাসকায় গ্রিজলী ভালুক, এমনকি একবার তিমি শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে তিমিও ধরেছেন। আফ্রিকার হাতি-মোষ আর চিতা-সিংহ তো মেরেছেনই।

'কেউ জানে না,' ঘুরিয়ে বললেন তিনি, 'কত রকমের জানোয়ার আছে ওখানে। ওই যে বললেন, বেশির ভাগ জায়গাতে এখনও যেতে পারেনি সভ্য মানুষ। তাই ঠিক করেছি, নতুন জায়গায় যাব আমরা। যেখানে আগে কেউ যায়নি। প্যাসটাজা নদীর কথাই ধরুন।'

'প্যাসটাজা!' আঁতকে উঠল ফেরিও। 'বলেন কি, সাহেব? মারা পড়বেন, মারা পড়বেন। অ্যানডোয়াজের ওধারেই যেতে পারেনি কেউ। গত বছর দু-জন শ্বেতাঙ্গ চেষ্টা করেছিল। পারেনি। ইণ্ডিয়ানরা ধরতে পারলে,' হাত তুলে একটা জিনিস দেখাল সে। 'ও-রকম করে ছেড়ে দেবে।'

হোটেলের লবিতে বসে কথা হচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে তাকে রাখা আছে অদ্ভুত জিনিসটা। মানুষের একটা সঙ্কুচিত মাথা, কমলার সমান।

কাছে গিয়ে জিনিসটা ভালমত দেখল মুসা আমান। ছোঁয়ার সাহস হলো না। 'জিভারো ইণ্ডিয়ানদের কাজ?'

'হ্যাঁ,' মাথা নোয়াল ফেরিও। 'তবে তোমরা যেখানে গিয়েছিলে, ওখানকার

জিভারো নয়, ওরা অনেক ভদ্র। ফাঁকিফুঁকি দিয়ে ছুটে এসেছ। এখন যেখানে যেতে চাইছ, ওরা ধরতে পারলে...'

'ছাড়বে না বলছেন?' একটা রেফারেন্স বই পড়ছিল রবিন মিলফোর্ড, মুখ তুলল। 'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, আজকাল আর বিদেশীদের মাথা কেটে ট্রফি বানায় না ওরা। শুধু শত্রু আর আত্মীয় যারা মারা যায়...'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ফেরিও। 'জিভারো ব্যাটাদের আমি বিশ্বাস করি না। তোমাদেরকেই যদি শত্রু ভেবে বসে?'

অকাট্য যুক্তি। চুপ হয়ে গেল রবিন।

কিশোর তাকিয়ে আছে মাথাটার দিকে। জিভারোরা ধরতে পারলে কি করবে, আপাতত সে-সব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, সে ভাবছে অন্য কথা। রকি বীচ মিউজিয়ামে ওই জিনিস নেই। ওরা পেলে ভাল দাম দেবে ওরা। ব্যবসা করতে যখন নেমেছে, সব কিছুকেই ব্যবসায়ীর চোখে দেখা উচিত। জন্তু-জানোয়ার ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জানোয়ার পোষে এমন সব সংগঠনে। সেই সঙ্গে দু-চারটে অন্য জিনিস—যেগুলোতে টাকা আসবে—নিতে ক্ষতি কি? 'ওটা বিক্রি করবেন?'

দ্বিধায় পড়ে গেল ফেরিও।

তাড়াতাড়ি বললেন মিস্টার আমান, 'যা বলেছ বলেছ, আর মুখেও এনো না। ওরকম একটা অফার দিয়েছ শুনলেই ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরবে পুলিশ। মাথা বেচাকেনার ব্যাপারে আইনের খুব কড়াকড়ি চলছে এখানে। যারা আগে নিয়ে ফেলেছে, ফেলেছে। তবে ছাগল কিংবা ঘোড়ার চামড়ায় তৈরি নকল জিনিস নিতে পারো।'

রহস্যময় হাসি হাসল ফেরিও। 'আমি কিন্তু বলে দিতে পারি, আসল মাথা কোথায় পাবে।'

'কোথায়?' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'জিভারো ইনডিয়ানদের কাছে।'

'ওদের কাছ থেকে আনলে আইন কিছু বলবে না?'

'না। যদি মাথাটা ইনডিয়ানদের কারও হয়।'

'হুঁ, অনেক আইনেই গলদ থাকে,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'যাকগে, মাথা পাওয়া দিয়ে কথা আমার, পেলেই হলো, যেখান থেকেই হোক।'

'ওখানে না গেলেই কি নয়?' হাত নাড়ল মুসা, অস্বস্তি বোধ করছে। 'বাবা, আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিল আমাজনে। প্যাসটাজায় কেন আবার?'

জবাবটা দিল রবিন, 'প্যাসটাজা নদী আমাজনের প্রধান পানির উৎসগুলোর একটা। আমাজন কোন মূল নদী নয়, অনেকগুলো জলধারার মিশ্রণ। ওগুলোর জন্ম হয়েছে আবার অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বরফগলা পানি থেকে। প্যাসটাজা তারই একটা। এবং এটার ব্যাপারে ভৌগোলিকদের আগ্রহও খুব। কারণ এর বেশির ভাগ

অঞ্চলই ম্যাপে নেই, চার্ট করা যায়নি।'

'কাজেই এমন একটা জায়গা দেখার লোভ ছাড়ি কি করে?' যোগ করলেন মিস্টার আমান। 'কেন, তোমার ভয় করছে?' ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ভয়?' ট্রফিটার দিকে আরেকবার তাকাল মুসা। 'তা-তো করবেই। মাথাটা আলাদা করে দিলে তো গেলাম।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হোটেলের একজন কর্মচারী। হাতে একটা খাম। বাড়িয়ে দিল।

খামটা নিয়ে ছিঁড়লেন মিস্টার আমান। ভাঁজ করা ছোট এক টুকরো কাগজ বের করলেন। টেলিগ্রাম। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেল। বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। দু-বার, তিনবার পড়লেন লেখাটা।

'কি?' এগিয়ে এল কিশোর। 'খারাপ খবর?'

'অ্যাঁ? না,' হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। 'আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে কেউ।'

'দেখি তো।' কাগজটা নিয়ে পড়ল কিশোর। লেখা রয়েছে ঃ

রাফাত আমান,
কুইটো হোটেল,
কুইটো,
ইকোয়াডর।
আমাজন খুব খারাপ জায়গা দূরে থাকলেই ভাল করবেন
বাড়ির অবস্থা ভাল নয় জলদি ফিরে যান।

কে পাঠিয়েছে নাম নেই।

টেলিগ্রামটা এসেছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে।

দুই

'কে পাঠাল?' কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

'হয়তো অ্যানিমেল ক্লাবের কেউ, একটু মজা করতে চেয়েছে,' বললেন বটে মিস্টার আমান, কিন্তু নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো কথাটা।

'বাবা, বাড়িতে কিছু হয়নি তো?' মুসা বলল।

'নাআহ্। তাহলে তোমার মা টেলিগ্রাম করত।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, কোন ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় এটা করে সে। 'মনে হচ্ছে, জানোয়ার ধরতে এসেও রহস্যে জড়াতে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কার এই আক্রোশ? আমরা আমাজনে গেলে কার কি ক্ষতি? কে থামাতে চায়?'

'কি জানি,' বললেন মিস্টার আমান। ফেলে দাও। সামান্য ব্যাপার। টেলিগ্রামে

নাম লেখার যার সাহস নেই, সে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'খোঁজ তো করতে পারি? টেলিগ্রাম অফিসে নিশ্চয় নাম-ঠিকানা লিখেছে,' রবিন বলল, 'ফর্মে।'

'তা-তো নিতেই পারি,' কিশোর জবাব দিল। 'লাভ কি হবে? তোমার কি ধারণা, যে লোক এভাবে লুকোচুরি খেলতে চায় সে আসল নাম লিখবে?'

ছেলেদের উদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ করলেন মিস্টার আমান। 'খামোকা ভাবছ। এটা কোনও ব্যাপার? কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, কাল খুব সকালে রওনা হব। ভোর রাতে উঠতে হবে আমাদের। প্লেনটা ঠিক হয়েছে কিনা কে জানে।'

'গিয়ে দেখে আসব?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'মন্দ বলোনি,' কিশোর সায় জানাল।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বললেন মিস্টার আমান।

'তুমি শুয়ে থাকো, বাবা, আমরাই পারব। রবিন, যাবে?'

'আমি? নাহ্ তোমরাই যাও। ততক্ষণে আমি এই চ্যাপটারটা শেষ করে ফেলি,' রেফারেন্স বই খুলে বসল আবার রবিন।

হোটেল থেকে বেরোল কিশোর আর মুসা। প্লাজা ইনডিপেনডেনসিয়ায় গানের জলসা হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে একটা দল। রাস্তার ওপাশের বিশাল গির্জা আর পাদ্রীর প্রাসাদে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে ঢোলের দ্রিম দ্রিম। প্লাজায় লোক গিজগিজ করছে। বেশির ভাগই ধোপদুরস্ত পোশাক পরা নাগরিক, স্পেন থেকে এসেছিল তাদের পূর্বপুরুষরা। বেশ কিছু স্থানীয় ইণ্ডিয়ানও রয়েছে তাদের মাঝে, ছড়ানো কানাওয়ালা চ্যাপ্টা হ্যাট মাথায়, গায়ে জড়ানো কম্বলের মত পোশাক—পনচো।

রহস্যঘেরা অতি সুন্দর একটা শহর, ভাবল কিশোর। পর্বতের কোলে বিশাল উপত্যকায় শুয়ে রয়েছে যেন। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে পর্বতের বরফে ছাওয়া চূড়া। কুইটোর লোকেরা যে বলে, *কুইটো থেকে স্বর্গ এত কাছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়,* ভুল বলে না।

খানিক হেঁটেই হাঁপিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। গতি কমাতে বাধ্য হলো। সমুদ্র সমতল থেকে সাড়ে নয় হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, তাই পরিশ্রম বেশি লাগছে। হাত বাড়ালেই স্বর্গ নাগাল পাওয়া যায় বলার আরেকটা কারণ অনেক উঁচুতে এই শহর। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শহরগুলোর একটা। কিন্তু উচ্চতার তুলনায় শীত বেশি নয়, কারণ, শহরের ঠিক গা ঘেঁষে চলে গেছে বিষুবরেখা, তবে যেটুকু শীত আছে তাতেই হাড় কাঁপিয়ে ছাড়ে। ওভারকোটের বোতাম এঁটে দিল কিশোর। উজ্জ্বল আলোকিত প্লাজা থেকে নেমে এল পুরানো শহরের সরু অন্ধকার গলিতে।

খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। খোয়া বিছানো পথের দু-ধারে সারি সারি পুরানো বাড়িঘর, রোদে শুকানো ইঁটে তৈরি। মাথার লাল টালির ছাত কোনকালে ঢেকে

গেছে সবুজ শ্যাওলা আর লতাপাতায়, দু-দিক থেকে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রাকৃতিক বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মনে হয় একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হাঁটছে।

পথের মাঝে মাঝে আলো আরও ঘন করেছে অন্ধকারকে। বাড়িঘরের ছায়াগুলো নিঃশব্দ পায়ে সরে যাচ্ছে যেন ওদের পাশ দিয়ে। গা ছমছমে পরিবেশ।

নিঃশব্দতার মাঝে তাই শব্দটা বড় বেশি কানে বাজছে কিশোরের, অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছে। জুতোর মচমচ। শুরুতে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। কিন্তু ভেনিজুয়েলা রোড থেকে ডানে মোড় নিয়ে সুক্রিতে পড়ার পরও যখন শব্দটা আসতেই থাকল, মনযোগ না দিয়ে আর পারল না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে পিচিনচা গলিতে পড়ল। শব্দের কোন ব্যতিক্রম নেই, আসছে।

মুসাও শুনতে পাচ্ছে জুতোর শব্দ। তার গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো মেরে ইশারা করল কিশোর, পাশে সরে দাঁড়িয়ে গেল একটা বাড়ির ছায়ায়। মুসা দাঁড়াল তার গা ঘেঁষে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল জুতোর আওয়াজ।

কোন সন্দেহ নেই, অনুসরণই করছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে আবার এগোল দুই গোয়েন্দা। আবার শুরু হলো অনুসরণ। আরও শ-খানেক গজ পর আরেকটা বাড়ির সামনে এসে থামল দু-জনে। দরজার সামনেটা অন্ধকারে ঢাকা। পকেট থেকে টর্চ বের করে সদর দরজার কপালে বসানো নেমপ্লেটের ওপর আলো ফেলল কিশোর। হ্যাঁ, এই বাড়িটাই। সকালে এখানেই এসেছিল। এক আইরিশম্যান থাকে, পাইক জোনস তার নাম। কুইটোর লোকেরা বলে 'পাগলা পাইক'। প্রায়ই নাকি বিমান নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই খেপা বৈমানিক। বাড়িয়ে বলাটা অবশ্য লোকের স্বভাব, সে যে কোন দেশেরই হোক না কেন।

পেছনে এগিয়ে আসছে জুতোর মচমচ। এলোমেলো পদশব্দ, থামবে কিনা ভাবছে বোধহয়, দ্বিধায় ভুগছে। থামল একবার, এগোল···আবার থামল···আবার এগিয়ে এসে একেবারে গোয়েন্দাদের পেছনে দাঁড়াল।

হঠাৎ ঘুরে লোকটার মুখে আলো ফেলল কিশোর।

ইকোয়াডরিয়ান নয়। হোঁতকা, বিশালদেহী। ল্যাটিন আমেরিকার লোকেরা সাধারণত হালকা-পাতলা ছোটখাটো হয়। ইনডিয়ানরাও হালকা-পাতলা, তবে ল্যাটিনদের মত ছোট নয়, আর চেহারা বেশ কর্কশ। এই লোকটা তার কোনটাই নয়। কিশোরের মনে হলো, এককালে মুষ্টিযোদ্ধা ছিল, কিংবা শিকাগো শহরের গুণ্ডা-সর্দার। চোখে আলো পড়ায় বিকৃত হয়ে গেল নিষ্ঠুর চেহারাটা! চমকে যাওয়া বাঘের চোখের মত জ্বলছে রক্তলাল দুই চোখ।

মুসার ধারণা হলো, আমাজন জঙ্গলের নরমুণ্ড শিকারীদের চেহারাও এত ভয়ঙ্কর নয়।

'আমাদের পেছনে আসছেন কেন?' জোর করে কণ্ঠস্বর ঠিক রাখল কিশোর।

চোখ মিটমিট করল লোকটা। 'তোমাদের পেছনে আসব কেন? হাঁটতে বেরিয়েছি।'

'আমরা যে যে পথে যাচ্ছি ঠিক সে-পথেই হাঁটা লাগছে আপনার? আর জায়গা নেই?' ভয়ে ভয়ে রয়েছে কিশোর, মেরে না বসে ডাকাতটা।

'তোমাদের পথেই এসেছি কেন ভাবছ?'

'ভাবছি না, জানি। যা জুতো পরেছেন না...'

'মাশাআল্লাহ।' কিশোরের বাক্যটা শেষ করল মুসা। 'দশ মাইলের মধ্যে মরাও জেগে যাবে। আপনার কানে খারাপ লাগে না?'

'খারাপ? কেন? খোয়ায় হাঁটলে সব চামড়ার জুতোই মচমচ করে, কম আর বেশি।'

'তবে আপনারগুলো মিউজিয়ামে রাখার মত।'

'অনুসরণ করছিলেন কেন?' কিশোর বলল। 'ছিনতাই-টিনতাইয়ের ইচ্ছে?'

জ্বলে উঠল লোকটার চোখ। হাত তুলতে গিয়েও কি ভেবে তুলল না। বোধহয় ভাবল, দুটো ছেলেকে এক সঙ্গে কাবু করতে পারবে না। নিগ্রো ছেলেটা আবার গায়েগতরে বেশ তাগড়া। ওকে কাহিল করতে তার মত ফাইটারেরও বেগ পেতে হবে। তাছাড়া এখানে ঘনবসতি। চেঁচামেচি শুনে লোক বেরিয়ে আসবে, আর এলে ছেলেদের পক্ষ যে নেবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

হাসল লোকটা। জোর করে হাসছে বোঝাই যায়। 'ঠিকই বলেছ, তোমাদের পিছুই নিয়েছি। তবে চুরি-ডাকাতির জন্যে নয়। দেখলাম তোমরা বিদেশী, আমিও বিদেশী। এখানে তো ইংরেজি জানা লোকের অভাব। তোমরা হয়তো জানো, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, স্যানটো ডোমিংগো গির্জাটা কোথায়। আজ রোববার, সারাদিন সময় পাইনি। ভাবলাম, শেষ কয়েকটা মোম জ্বেলে দিয়ে আসি,' আকাশের দিকে রক্তলাল চোখ তুলল সে। 'ঈশ্বর তো দেখছেন।'

'ভূতের মুখে রাম নাম,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর। ইংরেজিতে বলল, 'ঠিক জানি না কোনদিকে। ওদিকে হবে হয়তো, ফ্লোরেস রোডের মোড়ে। ঘন্টা শুনেছিলাম।'

'ধন্যবাদ,' ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠ কত আর মোলায়েম করা যায়? 'আবার দেখা হবে।'

'আমার কোন ইচ্ছে নেই,' এই কথাটাও বাংলায় বলে ঘুরল কিশোর। জোনসের দরজায় থাবা দিল।

দরজা খুলল তরুণ পাইলট। ছেলেদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল বসার ঘরে। ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন। উষ্ণ বাতাস। খুব আরাম।

'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?' ছেলেদের মুখ দেখেই কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছে জোনস। 'চোরছ্যাচোড় লেগেছিল পেছনে?'

'কি করে জানলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'জানা লাগে না। এখানে ওদের অভাব নেই,' হাসল বৈমানিক। 'বিদেশী দেখলেই পেছনে লাগে।'

চেহারা যাই হোক, হাসিটা খুব সুন্দর লোকটার।

খুলে বলল সব কিশোর।

মুসা বলে দিল রহস্যময় টেলিগ্রামের কথাটা। বিমান ভাড়া করতে গিয়ে মাত্র সেদিনই পরিচয় হয়েছে জোনসের সঙ্গে। কেন তার কাছে এত কথা বলল, ওরা জানে না। বোধহয় তার হাসিটাই দ্রুত আপন করে নেয় মানুষকে।

'হুঁ,' সব শুনে মাথা দোলাল জোনস। 'কিন্তু দুটো ব্যাপারকে এক করছ কেন?'

'করছি এ-জন্যে,' কিশোর বলল, 'লোকটা ডাকাত হলে ডাকাতি করত।'

'হয়তো শেষ মুহূর্তে ঘাবড়ে গেছে।'

'উঁহু, হতেই পারে না। ঘুসি মারলেই চিত হয়ে যেতাম আমরা। চুরি-ডাকাতির জন্যে নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করল জোনস, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে কি তোমাদের কোন শত্রু আছে?'

'যে কাজ করি, থাকতেই পারে...'

'কি কাজ করো?'

'শখের গোয়েন্দাগিরি। তিন গোয়েন্দা আমরা।'

'বাহ্, শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে,' মিটিমিটি হাসছে বৈমানিকের চোখ দুটো। 'তা খুলেই বলো না। দাঁড়াও, কফি করে নিয়ে আসি। আপত্তি আছে?'

'না,' মুসা বলল। 'যা ঠাণ্ডার মধ্যে এসেছি। একটু কড়া হলে ভালই হয়।'

কফি খেতে খেতে কথা হলো।

সংক্ষেপে তাদের কথা জানাল কিশোর।

'চমৎকার! দারুণ! ইস্, এখানে যদি থাকতে তোমরা, শিওর তোমাদের দলে যোগ দিয়ে ফেলতাম, ঠেলেও সরাতে পারতে না।...আচ্ছা, কিশোর, ওই লোকটা পিছু নিল কেন কিছু ভেবেছ?' সামান্য আলাপেই গোয়েন্দাগিরির শখটা সংক্রমিত হয়েছে জোনসের মাঝে।

'বুঝতে পারছি না। তবে, লস অ্যাঞ্জেলেসে আরেকজন জানোয়ার ব্যবসায়ী আছে। আমরা ব্যবসা খুলতে যাচ্ছি শুনে আমার চাচার সঙ্গে দেখা করেছিল। মুসার বাবার সঙ্গেও। এই ব্যবসা ভাল না, হেন না তেন না বলে অনেক রকমে বোঝাতে চেয়েছিল। যাতে আমরা এই ব্যবসায় না নামি।'

'তার কি অসুবিধে?'

'প্রতিযোগী হয়ে যাব না?' জবাব দিল মুসা। 'এমনিতেই ওর ব্যবসা মন্দা। আমরা নামলে হয়তো ফেলই মারবে।'

'হুঁ, তা-ও তো কথা।'

'হ্যাঁ, প্লেনের কি হলো?' আসল কথায় এল কিশোর।

'কাল সকালেই রওনা হতে চাও?'
'নিশ্চয়। ব্রেক ঠিক হয়েছে?'
'ভালভাবে করতে সময় লাগবে। তবে কাজ চালানোর মত হয়েছে।'
'চলবে তো?'
'তা চলবে। অন্তত আমি চালাতে পারব।'
বিশ্বাস করল কিশোর। অল্পক্ষণের পরিচয়েই লোকটাকে অনেকখানি চিনে ফেলেছে। জোনস যখন পারবে বলছে, পারবে।
'ঠিক আছে,' উঠল কিশোর। 'কাল ভোরে মাঠে হাজির থাকব। খুব ভোরে।'
দরজার কাছে দুজনকে এগিয়ে দিয়ে গেল জোনস। বলল, 'যেতে পারবে? নাকি আমি আসব?'
'আরে পারব, পারব,' হেসে বলল মুসা। হাতের মুঠো পাকিয়ে দেখাল, 'ও দশটা দিলে আমরা দুজন দুটো তো দিতে পারব। এত সহজে কাবু হব না। চলি। গুড বাই!'
নিরাপদেই হোটেলে ফিরে এল দুজনে।

তিন

'সবুজ নরকে যাওয়ার জন্যে সবাই তৈরি?' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জোনস। 'তাহলে আসুন, উঠুন আমার পক্ষিরাজে,' আদর করে চার সীটের বোনানজা বিমানটার গায়ে চাপড় মারল সে।
উঠল যাত্রীরা। জোনসের পাশে মিস্টার আমান।
পেছনে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা, দুজনের জায়গায় তিনজন। দুটো সীটের মাঝে হাতল নেই বলেই বসতে পারল। তাদের মালপত্র আর রাইফেল-বন্দুক তোলা হয়েছে লাগেজ কম্পার্টমেন্টে।
'অসুবিধে হবে না তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'নাহ্,' এঞ্জিন স্টার্ট দিল জোনস। 'তোমরা তো মোটে তিনজন, তা-ও ছেলেমানুষ। ওই জায়গায় চার-চারজন পূর্ণবয়স্ক ইনডিয়ানকে তুলেছি আমি।'
'চারজন! জায়গা কোথায়?'
'মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে একজন। তার ওপর পা তুলে দিয়ে সীটে বসেছে তিনজন। সামনের সীটেও দুজন ছিল।'
'উড়তে অসুবিধে হয়নি?'
'উড়ব তো আমি। আমার ইচ্ছে না প্লেনের ইচ্ছে?'
জোনসের ইচ্ছেতেই যে প্লেনটা চলে, সেটা বোঝা গেল খানিক পরেই। কেন তাকে লোকে পাগলা পাইক বলে, তারও প্রমাণ মিলল।

রানওয়ে নেই। ঘাসে ঢাকা বিশাল এক মাঠ, ওটাই এয়ারফিল্ড। এর ওপর দিয়েই ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলল বোনানজা।

গতি বাড়ছে দ্রুত। ঘন্টায় একশো দশ কিলোমিটারে উঠে গেল, এই সময় পাশ থেকে কোণাকুণি এসে ধাক্কা মারল জোর হাওয়া, ঝড়ো হাওয়াই বলা যায়। নিমেষে নাক ঘুরে গেল প্লেনের, তীব্র গতিতে ছুটে গেল ফায়ার ব্রিগেডের একটা লরির দিকে।

দুটো উপায় আছে এখন জোনসের হাতে। ব্রেক কষা কিংবা ওড়ার চেষ্টা করা। ব্রেক কষে সুবিধে হবে না, যা গতি এখন, আটকাতে পারবে না। জোরাজুরি করতে গেলে ব্রেক যা-ও বা আছে, তা-ও যাবে খারাপ হয়ে। বাকি রইল উড়ে যাওয়া। কিন্তু ক্ষমতার তুলনায় ভার নিয়েছে বেশি, উড়তে পারবে কিনা ঠিক মত তাতেও সন্দেহ আছে। ঘোরানো হয়তো যায় এখনও, তাহলে বিমানের এক পাশের ডানা খোয়াতে হবে। এতবড় ক্ষতি করতে রাজি নয় জোনস, প্রাণ যায় যাক, সে-ও ভাল।

বিপদ আঁচ করে ফেলেছে এয়ারফিল্ডের লোকেরা। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ক্র্যাশ সাইরেন। গ্যাস-ভরা বোতল থেকে ছিটকে বেরোনো ছিপির মত বেরিয়ে আসছে লরির ভেতরের ফায়ারম্যানেরা, যে যেদিকে পারছে লেজ তুলে দৌড়। যেভাবে ছুটে আসছে বোনানজা, লরি সরানোর সময় নেই।

হাসি ফুটেছে পাগলা পাইকের ঠোঁটে, সোজা ছুটে যাচ্ছে লরির দিকে। এক ধাক্কায় গতিবেগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে প্লেনের। আত্মহত্যা যেন তার কাছে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যাত্রীরা। নিরুপায় হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সবাই।

গতি আরও বাড়ল। প্রচণ্ড গর্জনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এঞ্জিন। কিন্তু জানিয়ে যে লাভ নেই, সেটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছে, এত দিন ধরে গোলামি করছে খেপা লোকটার। কাজেই প্রতিবাদ জানালেও মনিবের নির্দেশ আমান্য করছে না। সাধ্যমত চেষ্টা করছে বাঁচার জন্যে।

সামনে বিশাল লাল ধাতব গাড়িটা পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। গুঁতো লাগাতে ছুটে যাচ্ছে প্লেন।

হঠাৎ কি জানি কি করল পাগলা পাইক, খেয়াল রাখতে পারল না যাত্রীরা। ঝটকা দিয়ে বোনানজার সামনের চাকা উঠে গেল ওপরে, মসৃণ গতিতে মাটি ছাড়ল পেছনের চাকা। শাঁ করে উড়ে চলে এল লরির কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে। আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই গিয়েছিল।

চেপে রাখা বাতাস ফোঁস করে ছেড়ে ফুসফুস খালি করল যাত্রীরা। কিন্তু বিপদ পুরোপুরি কাটেনি তখনও।

টলমল করছে প্লেন, সোজা হতে চাইছে না কিছুতেই, লেজের দিকটা খালি

ঝুলে পড়তে চায়। মাল বেশি বোঝাই করে ফেলেছে, সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, সমুদ্র সমতল থেকে এত উঁচুতে বাতাস খুবই পাতলা, ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না প্রপেলার।

মাতলামি সামান্য কমলো। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল প্লেন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওঠার রেট কি আপনার?'

'সী লেভেলে মিনিটে নয় শো ফুট,' জবাব দিল জোনস। 'কিন্তু এখানে বড় জোর পাঁচশো।'

'সার্ভিস সিলিং?' আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বরফে ছাওয়া পর্বতের চূড়ার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, দৃষ্টিতে ভয় মেশানো বিস্ময়।

'সতেরো হাজার ফুট। নেহায়েত মন্দ না, কি বলো?'

'কিন্তু ওই চূড়া তো পেরোতে পারবেন না,' সামনে হাত তুলে দেখাল কিশোর। দুই হাঁটুর ওপর বিছানো ম্যাপের দিকে তাকাল। তেরোটা বিশাল আগ্নেয়গিরি মাথা চাড়া দিয়ে আছে ইকোয়াডরে। কয়েকটা প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে গিয়ে ঘিরে রেখেছে কুইটোকে। ওই তো কোটোপ্যাক্সি, পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, উঠে গেছে উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে। কেইয়ামবি আর অ্যানটিসানার চূড়াও ওটার চেয়ে খুব একটা কম যায় না।

'পেরোতে যাচ্ছে কে?' বলল জোনস, 'গিরিপথের মাঝখান দিয়ে চলে যাব।'

'গিরিপথ?'

'ওই হলো। দুই পর্বতের মাঝের পথকেই তো গিরিপথ বলে? ঠিক আছে, শুধরে দিচ্ছি। আমরা যাব গিরি-আকাশের মধ্যে দিয়ে। নিচে হাঁটাপথ নেই ওখানটায়।'

'কিন্তু উত্তরে যাচ্ছেন কেন?'

'তোমাদেরকে বিষুবরেখা দেখানোর জন্যে। ওই যে স্তম্ভটা দেখছ? উনিশশো ছত্রিশ সালে একটা ফরাসী জরিপকারী দল বসিয়েছিল ওটা, বিষুবরেখার নির্দেশক। বুড়ো পৃথিবীটাকে দু-ভাগে ভাগ করার জন্যে বিজ্ঞানীদের কতই না চেষ্টা, আহা! আমরা এখন রয়েছি উত্তর গোলার্ধে,' বলেই শাঁই করে নাক ঘুরিয়ে প্লেনটাকে নিয়ে চলল স্তম্ভটার দিকে। পেরিয়ে এল ওটা। 'এই ছিলাম উত্তর গোলার্ধে, চলে এলাম দক্ষিণে। মজার ব্যাপার না?'

ভীষণ ঠাণ্ডা। ফুঁ দিয়ে হাতের তালু গরম করতে করতে মুসা বলল, 'বিষুবরেখা না ছাই। আমার তো মনে হচ্ছে বিষুবমেরুতে ঢুকেছি।'

'বিষুবমেরু বলে কিছু নেই,' গম্ভীর হয়ে বলল রবিন।

'না থাকলে কি? নাম একটা বানিয়ে নিলেই হলো।'

'ওটা কোন রাস্তা?' নিচে দেখিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জোনস।

সড়কটার ডাকনাম ওয়ানডার রোড বা বিস্ময় সড়ক, অনেক লম্বা, সেই আলাস্কা থেকে শুরু করে শেষ হয়েছে গিয়ে প্যাটাগোনিয়ায়।

'ইস্,' মূসা বলল, 'ওই পথে যদি যেতে পারতাম একবার।'

'পারবে পারবে,' আশ্বাস দিলেন তার বাবা। 'এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই যেতে পারবে ভেবেছিলে কোন দিন? কিন্তু যাচ্ছি তো। এই নতুন ব্যবসায় যখন নেমেছি, দুনিয়ার অনেক জায়গাই দেখতে পাবে। নেমেছিই তো সেজন্যে। পয়সাও এল, খরচও পোষাল, জায়গাও দেখা হলো।'

তা ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর, এক ঢিলে তিন পাখি। জন্তু-জানোয়ার ধরাটা একটা ছুতো আসলে, দেশভ্রমণের জন্যেই এই ব্যবসার ফন্দি এঁটেছে দুই বুড়ো—তার চাচা আর মুসার বাবা। কিন্তু *খুবই দুঃখের বিষয়,* প্রথম অভিযানেই আসতে পারেননি রাশেদ পাশা। ইয়ার্ডে নাকি জরুরী কাজ, রিও ডি জেনিরো থেকেই তাঁকে বগলদাবা করে নিয়ে গেছেন মেরিচাচী, রকি বীচে। কিশোরকে আসতে দিয়েছেন শুধু মুসার বাবা সঙ্গে আছেন বলেই। তা-ও হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তিনটে ছেলের একটারও যদি কোন কারণে একটু চামড়া ছিলে, দুই মিনসের সারা শরীরের চামড়া ছিলবেন তিনি। বুড়োদের 'ভীমরতিতে' মুসার মায়েরও যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু মেরিচাচীর ওই সাংঘাতিক হুমকির পর আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। আর রবিনের বাবা-মা আপত্তিই করেননি। তাঁদের কথা, ছেলে হয়ে যখন জন্মেছে, সারা জীবন কোলে বসিয়ে তো আর রাখা যাবে না। তার চেয়ে এখন থেকেই যাক যেখানে খুশি, সাহস বাড়ুক ছেলের, বেঁচে ফিরে আসতে পারলেই ওঁরা খুশি।

রাশেদ চাচা, মেরিচাচী, মুসার মা, রবিনের বাবা-মা, জিনার বাবা-মা আর রাফিয়ান এক সঙ্গেই চলে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। এই অভিযানে আসার খুব ইচ্ছে ছিল জিনার, কিন্তু তার বাবা-মা রাজি হননি।

'পথটা কি একটানা গেছে, না ভেঙে ভেঙে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তিনটে ভাঙা আছে,' রবিন বলল। 'তবে অসুবিধে নেই। ভাঙাগুলো জোড়া দিয়েছে সংক্ষিপ্ত নৌ কিংবা রেলপথ। গাড়ি সঙ্গে থাকলেও ঝামেলা হবে না। জাহাজে কিংবা রেলগাড়িতে তুলে সহজেই পার করে নিতে পারবে ওসব জায়গা।'

'সত্যি, আশ্চর্য এক সড়ক,' অনেক নিচে আঁকাবাঁকা ফিতের মত পথটার দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'দুই আমেরিকাকে জোড়া দিয়েছে।'

'যত যা-ই বলুন, আকাশপথের জুড়ি নেই,' আদর করে কন্ট্রোল প্যানেলে হাত রাখল জোনস। 'শুধু আমেরিকা কেন, সারা পৃথিবীকেই তো জোড়া দিয়ে দিয়েছে বিমান।'

প্রতিবাদ করলেন না মিস্টার আমান। পৃথিবী জোড়া দেয়ার ব্যাপারে নৌ পথেরও কৃতিত্ব কম নয়, কিন্তু সে-কথা তুললেন না, খেপে যাবে পাগলা পাইক। বিমান ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। দুর্গম এই পাহাড়ী অঞ্চলে বিমান চালাচ্ছে

পাঁচ বছর ধরে। দূরদূরান্তে চলে যায়, কোন বাধাই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কুইটো থেকে উপকূলের গোয়োইয়াকুইলে-ই যেতে চায় না অনেক বৈমানিক, কিন্তু জোনসের কাছে ওটা ছেলেখেলা। মনের আনন্দে অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালা পেরিয়ে সীমাহীন জঙ্গল ছাড়িয়ে তারও পরের দুর্গম অঞ্চলে চলে যায় সে, যেখানে রয়েছে অগুনতি রবার বাগান, যেখান থেকে জোগাড় হয় কুঁইনিন। ভেবে অবাক হতে হয়, আজতক একটা দুর্ঘটনা ঘটায়নি সে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেয়াল, বরফে ছাওয়া পর্বত-চূড়া, ভীষণ জঙ্গল, প্রতিকূল আবহাওয়া কোন কিছুই পরাজিত করতে পারেনি তাকে, সব কিছুই হার মেনে পথ ছেড়ে দিয়েছে। তার এই রেকর্ড এ-অঞ্চলে এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি।

এসব কথা তিন গোয়েন্দাও জানে, মিস্টার আমানই বলেছেন। দেখা যাক এবার কি খেল দেখায়, ভাবল সবাই।

সামনের পাহাড়ের দেয়ালে একটা সরু ফাটল দেখা গেল। ওটাই বোধহয় জোনসের গিরি-আকাশ। কি একখান জায়গা। দুই ধারে দুই পাহাড়ের চূড়া, হাঁ করে রয়েছে, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য। চোখা চোখা পাথর ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, যেন হাঁয়ের মাঝে দৈত্যের দাঁত। ওসব দাঁতের যে কোন একটাতে শুধু ছোঁয়া লাগলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে খুদে বিমানটা। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পথ।

সীট থেকে উঠে জোনসের কাঁধের ওপর দিয়ে অলটিমিটারের দিকে তাকাল কিশোর। সতেরো হাজারের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে কাঁটা। তার মানে পর্বত ডিঙিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ওপর দিকে ফাঁকটা যেখানে বেশি সেখান দিয়েও যেতে পারবে না।

কিন্তু সতেরো হাজারও টিকল না। হঠাৎ করে সরতে শুরু করল অলটিমিটারের কাঁটা।

'আরি! এই, কি করছিস?' বোনানজাকে ধমক দিল জোনস। 'ওঠ ওঠ, এত নামলে চলবে কেন?' ওপরে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে।

বোনানজার তো ওঠার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু ভর রাখতে পারছে না, উঠবে কি করে? বাতাসের ভয়াবহ নিম্নগামী স্রোত প্লেনটাকে দ্রুত নিচে টেনে নামাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করল জোনস, ওঠাতে পারল না। নামছে তো নামছেই।

ভয় পেল যাত্রীরা। এইবার বোধহয় রেকর্ড আর টিকল না জোনসের। পাথুরে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে প্লেন।

কিন্তু টানাহেঁচড়ায় এবারেও জোনসেরই জয় হলো। গিরিপথের পাথুরে মেঝের ছয়শো ফুট ওপরে এসে থামল বিমানের নিম্ন-গতি। ঢুকে পড়েছে দানবের হাঁয়ের মধ্যে।

সোজা যদি চলে যেত পথটা, এক কথা ছিল। বেজায় সরু, তার ওপর রয়েছে নানা রকম বাঁক, মোচড়। কোনটা ইংরেজি S অক্ষরের মত, কোনটা বা U; হাত-পা ছেড়ে দিল যাত্রীরা। ম্যাপের দিকে চোখ নেই কিশোরের, গাইডবুক বন্ধ করে

ফেলেছে রবিন। মুসার চোখ বন্ধ। তাকাতেই সাহস পাচ্ছে না।

পাগলা পাইক নির্বিকার। স্বচ্ছন্দে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বিমানকে। প্রতিটি বাঁক, মোড়, মোচড় তার চেনা। সেটা বড় কথা নয়। সরু পথে যেভাবে বিমানটাকে সামালাচ্ছে, সেটাই দেখার মত। এই মুহূর্তে আরেকটা নিম্নগামী স্রোতে যদি পড়ে বিমান, কি হবে বোধহয় ভাবছেই না সে। কিন্তু ভেবে ভেবে এই ভীষণ ঠাণ্ডার মাঝেও দরদর করে ঘামছে যাত্রীরা।

দুর্ধর্ষ পাইলটের কাছে আরেকবার হার মানল বিরূপ প্রকৃতি। নামতে শুরু করেছে পাথুরে মেঝে, ফাঁক হচ্ছে ফাটল। হুঁশ করে খোলা আকাশে বেরিয়ে এল বিমান। পেছনে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকল যেন পরাজিত, মার খাওয়া পাহাড় আর গিরিপথ।

নতুন এক পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছে বোনানজা। পেছনে হারিয়ে গেছে প্রশান্ত-উপকূলের রুক্ষ, ধূসর অঞ্চল, বৃষ্টি যেখানে প্রায় হয়ই না। নিচে, আশেপাশে আর সামনে এখন ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল সবুজ বনভূমি, যেখানে পানির কোন অভাব নেই। রোদ চকচকে সবুজের মাঝে জালের মত বিছিয়ে রয়েছে যেন রূপালি নদী-নালাগুলো।

'দেখো দেখো!' উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, খানিক আগে ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল যে ভুলেই গেছে। 'মেঘ! কি টকটকে লাল!'

নিচে, সবুজের ঠিক ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ছোট্ট এক টুকরো···হ্যাঁ, মেঘই বলা যায়।

'প্রজাপতি,' হেসে বলল জোনস। 'বেশি না, এই কয়েক হাজার কোটি হবে। একসঙ্গে রয়েছে তো, মেঘের মত লাগছে। ওই যে দেখো, আরেকটা সবুজ মেঘ।'

'টিয়ে না?' বলল রবিন।

'হ্যাঁ।'

'ইয়াপুরা নদীর ওদিকে কিন্তু এতসব দেখিনি।'

'ওটা তো মরু জঙ্গল। এদিকে সেরকম না। এখানে শুধু রঙ আর রঙ। উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ, লাল। মিশ্র রঙ যে কত আছে! কাকাতুয়া আর টিউকান পাখির রাজ্যে তো যাওইনি এখনও। বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে হবে বুঝি ছবি দেখছ, কাঁচা রঙ গুলে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।'

'ওই যে নিচে একটা নদী,' মুসা বলল। 'ওটাই আমাজন?'

'আমাজনের দাদীর মা বলতে পারো। ওটার নাম প্যাটেট, কিছু দূরে গিয়ে জন্ম দিয়েছে আমাজনের দাদী প্যাসটাজাকে। প্যাসটাজার মেয়ে ম্যারানন, এবং ম্যারাননের ছেলে হলো গিয়ে আমাজন।'

'খুব সুন্দর বলেছেন,' আন্তরিক প্রশংসা করল কিশোর।

প্রশংসায় লজ্জা পেল জোনস, লজ্জিত হাসি হাসল। অবাক হলো কিশোর—পাগলা পাইকও লজ্জা পায় তাহলে!

'আশ্চর্য কি জানো?' মিস্টার আমান বললেন, 'প্যাটেটের উল্টো দিকে মাত্র একশো মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগর। অথচ সেদিকে ফিরেও তাকাল না নদীটা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিন হাজার মাইল পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে, ঘুরে-ফিরে গিয়ে পড়েছে আটলান্টিকে।'

'আমরাও তাকেই অনুসরণ করতে যাচ্ছি,' হাসল কিশোর, তাতে ভয়ের ছোঁয়া। 'কত বিপদ আর রহস্য অপেক্ষা করছে কে জানে!'

নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন।

অবশেষে শ্যাম্বো নদীর সঙ্গে মিলিত হলো প্যাটেট, জন্ম দিল প্যাসটাজার।

'ওই যে প্যাসটাজা,' হাত তুলল জোনস। বিড়বিড় করল, 'রহস্যময় নদী। জিভারোদের নদী।'

টপো নামের ছোট্ট একটা সীমান্ত ঘাঁটি পেরোল ওরা, তার পর মেরা ছাড়াল। সভ্যতার সামান্যতম ছোঁয়া যা ছিল, তা-ও এখন শেষ। পুরোপুরি অসভ্য এলাকার ওপর এসে পড়েছে ওরা।

সামনে ইনডিয়ানদের একটা গ্রাম, নাম পুইয়ো।

গাইডবুক দেখে বলল রবিন, 'পুইয়োর পর থেকে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। পথ এত বেশি দুর্গম, হেঁটে যাওয়াও সম্ভব না। উপায় একটাই, নৌকা।'

'হ্যাঁ,' হাঁটুতে রাখা ম্যাপে টোকা দিল কিশোর। 'বিন্দু বিন্দু বসিয়ে চিহ্ন দিয়েছে। অর্থাৎ, এখানটায় সার্ভে হয়নি এখনও।'

ছোট একটা পাহাড়ী নদী দেখা গেল। সেটা পেরোনোর জন্যে তৈরি হয়েছে দড়ির ঝোলানো সেতু। সেতুর পরে খানিকটা খোলা জায়গা।

গন্তব্য এসে গেছে। নামার জন্যে তৈরি হলো জোনস।

'স্টলিং স্পীড কত?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পঁচানব্বই কিলোমিটার,' জবাব দিল জোনস।

আরিব্বাবা। চমকে গেল কিশোর। নিচে মাঠটা খুবই ছোট। মিনিটে দেড় কিলোমিটারেরও বেশি গতিবেগ। এই অবস্থায় ল্যাণ্ড করবে কি করে প্লেন? তার ওপর ঠিকমত ব্রেক কাজ করে না। আরেকটা কেরামতি দেখাতে হবে জোনসকে।

মাঠের শেষে কতগুলো কুঁড়ে। এধরনের কুঁড়ে তিন গোয়েন্দার পরিচিত। জিভারো ইনডিয়ানদের বাড়িঘর, ইয়াপুরায় দেখেছে। আস্ত গাছের বেড়া। শুধু ঘাসের বেড়াও আছে কিছু কিছু ঘরের।

বিমানের নাক নামাল জোনস, চিলের মত ছোঁ মারল যেন। মাটিতে হোঁচট খেল চাকা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটতে শুরু করল। একটা বড় কুঁড়ের ঘাসের বেড়া ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গতি এমনিতেই কমে এসেছিল, বাধা পেয়ে ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। ঘরে কয়েকজন ইনডিয়ান শুয়ে-বসে আরাম করছিল নিশ্চিন্তে। তাতে ব্যাঘাত ঘটাল বেরসিক বোনানজা। লাফিয়ে উঠে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল ওরা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

বিচিত্র কায়দায় নরমুণ্ড শিকারীদের স্বাগতম জানাল যেন পাগলা পাইক। ভাগ্যিস ইনডিয়ানদের কেউ আহত হয়নি। তাহলে কুঁড়ের তাকে সাজিয়ে রাখা খুদে মুণ্ডগুলোর সঙ্গে নির্ঘাত যোগ হত আরও পাঁচটা মাথা।

চার

মনে হলো ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। ছুরি-বল্লম নিয়ে ছুটে এল ইনডিয়ানরা। যোদ্ধাদের বিকট চিৎকার তো আছেই, সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে গ্রাম মাথায় করেছে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা।

ককপিটের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দিল জোনস। মুখে হাসি। জিভারোদের কায়দায় স্বাগত জানাল বুড়ো সর্দারকে। চেঁচামেচি কমল না তাতে, কিন্তু নিমেষে রাগ মুছে গিয়ে জন্ম নিল উল্লাস। পাগলা পাইক তাদের অতিপরিচিত। সিংকোনা আর কুইনিন সংগ্রহকারীদের নিয়ে আগেও অনেকবার এসেছে।

যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিল জোনস।

স্বাগত জানাল ইনডিয়ানরা। মেহমানদের নিয়ে চলল সর্দারের কুঁড়েতে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম, ঝকঝকে তকতকে, হামুর গ্রামটা এত পরিষ্কার ছিল না। ইনডিয়ানদের একই উপজাতি, কিন্তু গ্রামে গ্রামে কত তফাৎ।

গ্রাম দেখে মানুষগুলোকে মনেই হয় না এরা ভয়াবহ নরমুণ্ড শিকারী। গ্রামের বাইরে ভুট্টা আর সীমের খেত, কলা বাগান। কিছু কিছু কুঁড়েতে রয়েছে তাঁত, কাপড় তৈরি হয়। খরস্রোতা প্যাসটাজার ঘাটে বাঁধা রয়েছে সারি সারি নৌকা, আস্ত গাছ কুঁদে তৈরি।

'বুদ্ধিমান লোক ওরা,' বলল জোনস, 'আর খুব সাহসী। ইনকারা কোন দিন হারাতে পারেনি ওদের। স্প্যানিয়ার্ডরা জোর করে কিছুদিন শাসন করেছিল বটে, কিন্তু পরে সব ইনডিয়ানরা এক হয়ে শুয়োর খেদান খেদিয়েছে তাদের। ইকোয়াডর সরকারও ওদের ঘাঁটায় না, যার যার মত থাকতে দেয়।'

'শার্ট-প্যান্ট পায় কোথায়? সভ্য জগতের পোশাক?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তাঁত আছে, বানিয়ে নেয়। এমনিতে কাপড়-চোপড় পরেই থাকে ওরা, কিন্তু লড়াই বাধলে অন্যরকম। উলঙ্গ হয়ে গায়ে রঙ মেখে সঙ সাজে, একেকটা যোদ্ধা তখন একেকটা ভূত। বিকট করে ফেলে চেহারা।'

শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায়ও কিছু লোককে বুনো দেখাচ্ছে। কালো ঝাঁকড়া চুল এলোমেলোভাবে নেমেছে ঘাড়ের কাছে। মাথায় টিউকান পাখির পালকে তৈরি মুকুট।

'প্রতি দু-জন জিভারোর একজন সভ্য, আরেকজন বুনো,' বলল জোনস। 'সে এক মজার ব্যাপার। কোন্‌জনের পাল্লায় পড়লে কি ঘটবে নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ।'

সর্দারের কুঁড়ের বেড়ায় ঝুলছে রাশি রাশি ব্লো-গান,বল্লম, ধনুক আর তীর। আছে রাজকীয় *টিগ্রে* আর কুটিল চিতাবাঘের চামড়া।

খাবারের সময় হয়েছে। খাবার এল।

'আরিব্বাবা, এত বড় ডিম!' বলল রবিন। 'মুরগীগুলো কত বড়?'

হাসল জোনস। 'মুরগীগুলো? একেকটা কম পক্ষে দশ ফুট লম্বা। যা দাঁত আর চোয়ালের যা জোর, আমাদেরই চিবিয়ে কিমা বানিয়ে দিতে পারে।'

'অ্যালিগেটরের ডিম, রবিন,' হেসে বলল কিশোর। 'কেমন লাগছে?'

মুখ বিকৃত করে ফেলল রবিন। 'এতক্ষণ তো ভালই লাগছিল। জেনেও খেতে খারাপ লাগছে না তোমার?'

'এখানে খাওয়ার বাছবিচার করলে মারা পড়ব। মনকে মানিয়ে নিয়েছি। স্বাদ যখন ভাল, অসুবিধে কি?'

'কাবাবটা কিসের মাংসের?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'নিশ্চয় জংলী ছাগল?'

'জংলীই, তবে ছাগল নয়, ইগুয়ানা,' জবাব দিল জোনস। 'পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা এক জাতের গুঁইসাপ, এদিকের জঙ্গলে অভাব নেই। চিড়িয়াখানার জন্যে নিতে পারো। খাচ্ছ যে, কিসের মাংস বলো তো ওটা?'

'বনগারু,' রবিন বলল। এত অখাদ্যের মধ্যে এটা মোটামুটি ভাল খাদ্য মনে হচ্ছে তার, অন্তত রুচিসম্মত। আরেক টুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল।

'উঁহু। সিংহ, পার্বত্য সিংহ।'

'মানে...পুমার মাংস! ওয়াক, থুহ্!' চিবানো মাংস থু-থু করে ফেলে দিল রবিন।

'ও কিছু না। দু-দিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে,' বললেন মিস্টার আমান। 'কিশোর বলল না, মনটাকে তৈরি করে নিলেই হলো।'

কিন্তু পারল না রবিন। আমিষ খাওয়া বাদ দিয়ে নিরামিষের দিকে ঝুঁকল। ভুট্টার আটার মোটা রুটি আর কলা-পেঁপে। কিন্তু ঘিনঘিনে ভাবটা দূর করতে পারল না। রুচি আরও নষ্ট করল তাকে সাজানো অসংখ্য নরমুণ্ড। একটা মাথা ঝুলছে দরজার ঠিক ওপরে। রবিন যেখানে বসেছে সেখান থেকে খুব বেশি চোখে পড়ে।

রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন মিস্টার আমান। বললেন, 'ওটাকে বেশি সম্মান দেয়া হয়েছে।'

ইংরেজি বোঝে না সর্দার। কিন্তু মুণ্ডটার দিকে মেহমানদের ঘনঘন তাকাতে দেখে অনুমান করে নিল, ওটার আলোচনাই হচ্ছে। জোনসকে কিছু বলল।

জিভারোদের সবারই ভাষা মোটামুটি এক হলেও অঞ্চলে অঞ্চলে কিছু রদবদল রয়েছে। ইয়াপুরার যে ভাষাটা তিন গোয়েন্দা জানে, তার সঙ্গে পুইয়োর ভাষার পার্থক্য আছে, তাই পুরোপুরি বুঝতে পারল না।

'সর্দারের দাদার মুণ্ড ওটা,' দোভাষীর কাজ চালাল জোনস। একটু থেমে বলল, 'কারও কারও মতে মুণ্ড সংরক্ষণ বর্বরতা। আসলে কি তাই? এরা তো শুধু

মাথাটা মমি করে রাখছে, মিশরী রাজারা যে পুরো দেহটাই মমি করে রাখত? মরে যাওয়ার পর লাশটা নিয়ে কি করা হলো না হলো, সেটা কোন ব্যাপারই নয়। এই ইণ্ডিয়ানদের রীতিটা বরং ভালই মনে হয় আমার কাছে। মৃত্যুর পরও প্রিয়জনের স্মৃতি এভাবে ধরে রাখতে পারাটা···দাদা নাকি খুব ভালবাসত সর্দারকে, সর্দারও ভালবাসত দাদাকে। তাই এভাবে সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে দরজার ওপর।'

'আত্মীয়-স্বজনের মুণ্ড যত খুশি রাখুক, কে বলতে যাচ্ছে,' মুসা বলল, 'কিন্তু শত্রুর মাথা যে রাখে? নিশ্চয় সম্মান দেখানোর জন্যে নয়?'

'সেটা অন্য কারণ। ওদের বিশ্বাস, শক্তিশালী একজন যোদ্ধার মাথা কাছে রাখতে পারলে মৃতের শক্তিটা তার মধ্যে চলে আসবে। দুর্বল লোক, মেয়েমানুষ কিংবা বাচ্চার মাথা তো রাখে না। মুণ্ড সংরক্ষণের পদ্ধতিটাও খুব জটিল, তাই আজেবাজে মাথার পেছনে সময় নষ্ট করতে চায় না।'

'যদি না সেটা থেকে কিছু আয় হয়,' যোগ করলেন মিস্টার আমান, 'তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে নিজের কুঁড়েতে বাছা বাছা মাথা ছাড়া রাখবে না কিছুতেই।'

'আমাদেরকে আবার সম্মানিত করার চেষ্টা করবে না তো?' তাকের মুণ্ডগুলোর দিকে বাঁকা চোখে তাকাল মুসা।

'বিশ্বাস কি?' হাসল জোনস। 'একটা কথা কিন্তু বলিনি। বিদেশীদের মাথার বিশেষ কদর করে ওরা। ওদের ধারণা, ওসব মাথায় জাদুশক্তি খুব বেশি। তাই অলৌকিক ক্ষমতার লোভে ওগুলো জোগাড় করে।'

'খাইছে!' নিজের মাথা চেপে ধরে সর্দারের দিকে ফিরল মুসা। 'না বাপু, সর্দারের পো, আমার এটাতে কিচ্ছু নেই বাবা। আমি নেহায়েত মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ। প্রায়ই বোকা, হাঁদা, গর্দভ বলে গাল দেয় কিশোর। টিচাররা তো বলদ ছাড়া কিছুই বলে না। তবে হ্যাঁ, বুদ্ধি যদি বাড়াতেই চাও, ওরটা রাখতে পারো। আর বইয়ের বিদ্যে চাইলে রবিনেরটা।'

হেসে উঠল জোনস। কিশোর আর রবিন হাসল। মিস্টার আমানও হাসছেন। কিছুই না বুঝে সর্দারও জোরে জোরে হাসতে লাগল।

হাসার পর, হাসার কারণ জানতে চাইল সর্দার।

বলল জোনস।

আঁতকে উঠল সর্দার। গম্ভীর হয়ে গেছে। জোরে জোরে মাথা নেড়ে কিছু বলল।

'ও বলছে,' অনুবাদ করল জোনস, 'মেহমানদের মাথা কিছুতেই কাটে না জিভারোরা। তাতে নাকি ভীষণ পাপ হয়।'

'যাক বাবা, বাঁচলাম,' এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো মুসা। 'এত ভাল ভাল খাবার, গিলতেই পারছিলাম না।'

শেষ হলো খাওয়া।

উঠে গিয়ে তাকে সাজানো ট্রফিগুলো দেখতে লাগলেন মিস্টার আমান। ওরকম একটা মুণ্ডের জন্যে হাজার ডলার দিতে রাজি আছে লস অ্যাঞ্জেলেসের মিউজিয়াম অভ নেচারাল হিস্ট্রি।

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। 'আংকেল, একটা কিনে নিলে কেমন হয়?'

প্রথমে রাজি হলো না সর্দার।

কিন্তু নাছোড়বান্দা জোনসের কবলে পড়েছে। নানা রকম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। বোঝাল, বিশাল কুঁড়েতে নিয়ে দরজার কাছে রাখা হবে মাথাটা। এত বড় কুঁড়ে ইনডিয়ানদের কোন গ্রামে নেই। হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসবে রোজ। দেখে জিভারোদের প্রশংসা করবে। এত বড় সম্মান কি ছেড়ে দেয়া উচিত?

গলে গেল সর্দার, প্রথমেই চোখ তুলে তাকাল তার দাদার দিকে। কিন্তু না, দাদাকে কাছছাড়া করতে পারবে না সে, বড় বেশি ভালবাসে। তাক থেকে আরেকটা সুন্দর ট্রফি নিয়ে এল। 'আমাদের সব চেয়ে বড় যোদ্ধাদের একজন। খুব জ্ঞানী আর ভাল লোক। ও যাবে তোমাদের দেশে।'

'নাম কি?'

'কিকামু।'

'দাম কত?'

দ্বিধায় পড়ে গেল সর্দার। উপহারের দাম নেয়াটা ভাল দেখায় না। মাথা নাড়ল সে।

জোনসও ছাড়বে না।

শেষে জোর করে কিছু টাকা সর্দারের হাতে গুঁজে দিলেন মিস্টার আমান। বললেন, এটা মেহমানদের তরফ থেকে উপহার।

এরপর সর্দার জানতে চাইল, মেহমানরা কেন এসেছে।

শুনে মুখের ভাব বদলে গেল সর্দারের। অনেক কথা বলল।

'সর্দার বলছে,' জোনস জানাল, 'ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না আপনাদের। মারা পড়বেন। ভাটির ইনডিয়ানরা নাকি মোটেও সুবিধের নয়। সাংঘাতিক বুনো, মাথা কাটার বাছবিচার নেই, বিদেশীদের একদম দেখতে পারে না।'

কিন্তু ফিরে যেতে রাজি নন মিস্টার আমান। 'ওদের কাছে বন্দুক নেই।'

'নেই। কিন্তু ব্লো-গান আছে, বিষাক্ত চোখা কাঠি ছোঁড়ে। তাছাড়া বল্লম আছে, বিষমাখা তীর আছে, নিশানা মিস করে না।'

'জানি। ওদের সঙ্গে ভাব করে নেব।'

'ভাব করার আগেই যদি বিষ ঢোকায় আপনাদের রক্তে?'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে কথা দিয়ে এসেছি, প্যাসটাজার ভাটি অঞ্চলের একটা খসড়া ম্যাপ করে নিয়ে যাব। চুক্তি মোতাবেক বেশ কিছু টাকাও দিয়েছে খরচের জন্যে। চিড়িয়াখানা আর সার্কাস

পার্টির কাছ থেকেও আগাম টাকা নিয়ে এসেছি, দুর্লভ জানোয়ার জোগাড় করে দেব বলে। এখন তো আর পিছিয়ে যেতে পারি না। সর্দারকে জিজ্ঞেস করুন, একটা নৌকা বিক্রি করবে কিনা।'

তাতে আপত্তি নেই সর্দারের। কিন্তু বিষণ্ণ মুখে বার বার বলল, মেহমানদের কিছুতেই যাওয়া উচিত হচ্ছে না ওদিকে। 'বোকা বিদেশীগুলোকে' কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে, শেষে রাতটা অন্তত তার সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার দাওয়াত করল সর্দার।

এতে রাজি হলো অভিযাত্রীরা। সর্দারকে অখুশি করতে চাইল না।

'আবার কুমিরের ডিম খেতে হবে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'তা নাহয় খেলাম। আমার ভয়, জংলী হারামীদের তীর খেয়ে না মরি,' মুসা বলল।

'দেখো,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস্টার আমান, 'ভয় পেলে কিংবা খুঁতখুঁত করলে অ্যাডভেঞ্চার হয় না। আরাম চাইলে বাড়িতে বসে থাকলেই পারতে। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে জোনসের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো।'

ম্যাজিকের মত কাজ করল তার কথা। ডজন ডজন কুমিরের ডিম খেতেও আপত্তি রইল না রবিনের। জংলীদের তীর কেন, বল্লমের খোঁচায় মোরব্বা হতে রাজি আছে মুসা, তবু 'কাপুরুষ' দুর্নাম নিয়ে রকি বীচে ফিরে যাবে না।

প্রায় সারাদিনই খায় এখানকার জিভারোরা।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এল খাবার। তবে এবার আর কুমিরের ডিম নয়। লালচে-সাদা মাংসের বেশ বড় বড় টুকরো। খুব নরম। আঁশটে গন্ধ, অনেকটা মাছের মত, তবে স্বাদটা মুরগীর। মুখে দিয়ে ভাল লাগল রবিনের, জিজ্ঞেস করল না কিসের মাংস। জানলেই যাবে অরুচি হয়ে।

কিন্তু মুসা জিজ্ঞেস করে বসল।

'বোয়া কনস্ট্রিকটর,' জানাল জোনস। 'এক জাতের মস্ত অজগর।'

'ব্যাটারা সাপও বাদ দেয় না,' বিড়বিড় করল রবিন। চিবানো থামাল না, কিন্তু বিস্বাদ হয়ে গেল খাবার। কোঁত করে গিলে ফেলল। বকা শুনতে আর রাজি নয়।

তার অবস্থাটা বুঝলেন মিস্টার আমান। হেসে বললেন, 'খেলে ক্ষতিটা কি বলো? যদি হজম হয় আর স্বাদ খারাপ না হয়? কেন, সভ্য ফরাসীরা শামুক খায় না, চীনারা পাখির বাসা খায় না, জাপানীরা আগাছা খায় না? আর আমরাও তো সী-সাইডের রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে পিচ্ছিল ঝিনুক খেয়ে আসি হরহামেশা। তুমিও তো অনেক খেয়েছ। ধর্মের কারণে আমরা শুয়োর খাই না, তোমরা তো খাও। তোমার আমার মাঝেই তো খাবারের ফারাক। আসল কথা হলো, মানুষ যেখানে যেভাবে থাকে, প্রকৃতি তাকে যে খাবার সাপ্লাই করে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কারও কাছে সেটা অমৃত, কারও কাছে কিলবিলে শুঁয়োপোকা।'

কিন্তু লেকচারে কি আর কাজ হয়? অভ্যাস বড় বাজে জিনিস। খাওয়াটা আর

ফেলল না বটে রবিন, তবে রুচিও হলো না, জোর করেই গিলতে লাগল।

বিকেলে কুইটোতে ফিরে চলল জোনস।

বিষণ্ন মুখে তাকে বিদায় জানাল অভিযাত্রীরা। দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেন। তাদের মনে হলো, সভ্যতার শেষ ছোঁয়াটুকুও যেন মুছে গেল।

সাঁঝ হতেই আশপাশের বনে শুরু হলো নানারকম গর্জন, চিৎকার, কাশি—দিনের শব্দগুলোর সঙ্গে ওগুলোর মিল নেই।

সারারাত ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। খালি এপাশ ওপাশ করল মাদুরের ওপর বিছানো কম্বলে শুয়ে। একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে ওরা, ঠিক জায়গাতেই চলেছে দুর্লভ জন্তু ধরার জন্যে। জন্তু-জানোয়ারের স্বর্গ এই অঞ্চল।

শেষ রাতের দিকে সামান্য তন্দ্রামত এসেছিল। স্বপ্ন দেখল, তাদের তাড়া করছে ভীষণ চেহারার নরমুণ্ড শিকারী জংলীরা।

টুটে গেল তন্দ্রা। ঘেমে গেছে সারা শরীর। জংলীদের ভয়াবহ চেহারা ভাসছে এখনও চোখের সামনে। তাদের মাঝেই ধীরে ধীরে উঁকি দিল আরেকটা চেহারা, জংলীদের চেয়ে কম কুৎসিত নয়। সেই লোকটা, কুইটোতে সেরাতে যে পিছু নিয়েছিল।

জোর করে মন থেকে চেহারাটা দূর করার চেষ্টা করল কিশোর। নিজেকে বোঝাল, কুইটো থেকে অনেক দূরে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ওরা, এখানে আসতে পারবে না সেই লোক।

কিন্তু বুঝ মানল না মন।

পাঁচ

পর দিন খুব ভোরে উঠল অভিযাত্রীরা।

ভাল একটা নৌকা দিয়েছে সর্দার। ওদেরই তৈরি একটা ক্যানূ। ফুট পঁচিশেক লম্বা, পেটের কাছের সবচেয়ে চওড়া জায়গাটার মাপ দুই ফুট। চার-পাঁচ জন মানুষ আর প্রয়োজনীয় মালপত্র বহন করার উপযোগী।

আস্ত গাছ কেটে তৈরি নৌকাটা না দেখলে কারিগরের দক্ষতা আঁচ করা যায় না। কুঁদে কুঁদে ফেলে দেয়া হয়েছে ভেতরের সমস্ত কাঠ, এক ইঞ্চি পরিমাণ রেখে। নৌকাটার যেখানেই হাত দেয়া যাক, এক ইঞ্চি পুরু। কাঁচা লোহায় তৈরি হাতুড়ি-বাটালে কাজ করেছে কারিগর; শুধু হাতের আন্দাজে কি করে মাপ ঠিক রাখল, কোথাও কম বেশি হলো না, কিংবা ছিদ্র হলো না, ভাবলে অবাক হতে হয়। নৌকা তৈরির পর তার ভেতরে-বাইরে দু-দিকেই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। না, পোড়ানো হয়েছে বললে ভুল হবে, বরং বলা যায় ভালমত আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে। আলকাতরা তো আর নেই ইনডিয়ানদের, তাই পানি যাতে না লাগে তার জন্যে

এই ব্যবস্থা।

হাঁসের পিঠে পানি পড়লে যেভাবে গড়িয়ে পড়ে যায়, চিহ্ন থাকে না, নৌকাটার অবস্থাও তা-ই। তবে একটা দোষ আছে, পানিতে দু-পাশে গড়ায় খুব বেশি। ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন। ইনডিয়ানদের অভ্যাস হয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিয়ে যায় ওরা, সব চেয়ে খরস্রোতা নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউয়েও কাত হয় না নৌকা, দিব্যি তরতর করে ছুটে যায়।

'আমরাও অভ্যাস করে নেব,' মুসা বলল। নৌকা বাওয়ার ওস্তাদ সে। 'রকি বীচে যখন ফিরে যাব,' বুকে থাবা মেরে হাত নাড়ল, 'আচার আচরণে খাওয়া-দাওয়ায় আমরা তখন পুরোদস্তুর জিভারো ইনডিয়ান।'

'কথা বাদ দিয়ে কাজ করো,' তাড়া দিলেন তার বাবা। 'জিনিসপত্রগুলো তোলা দরকার।'

ছোট ছোট পোঁটলা করে বাঁধা হলো সমস্ত মাল। খুব সাবধানে সাজিয়ে রাখা হলো নৌকার তলায়। ওজন কোথাও কম বেশি হলে ভারাসাম্য নষ্ট হবে। একটা পোঁটলার ওপর আরেকটা এমন ভাবে রাখা হলো, প্রয়োজনরে সময় যাতে ওগুলো টপকে কিংবা ওগুলোর ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। যাত্রী-কাম-মাল্লারা বসে দাঁড় বাওয়ার জন্যে মালের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি করে জায়গা ছাড়া হলো। ওসব ইনডিয়ান ক্যানূতে পাটাতন থাকে না, তাই পাটাতন বসানোর জন্যে আড়াআড়ি তক্তা লাগানোরও দরকার পড়ে না। নিজেদের সুবিধের জন্যে কয়েকটা তক্তা লাগিয়ে নিল অভিযাত্রীরা। সেগুলোর সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল বন্দুক আর ভারি জিনিসপত্র। কোন কারণে নৌকা উল্টে গেলেও জিনিসগুলো পানিতে হারাবে না।

'ঠিকই আছে সব,' বললেন মিস্টার আমান। 'এবার ছাড়া যায়।'

তীরে দাঁড়িয়ে মেহমানদের বিদায় জানাল জিভারোরা।

পথ-প্রদর্শক হিসেবে একজন জিভারো যোদ্ধাকে অভিযাত্রীদের সঙ্গে দিয়েছে সর্দার।

দিনটা ভারি চমৎকার। উজ্জ্বল রোদ। বানরের চেঁচামেচি, টিয়ে আর কাকাতুয়ার ডাকে মুখর হয়ে আছে নদীর দুই তীরের বনভূমি। পশ্চিমে, অনেক দূরে সবুজ বনের মাথা ছাড়িয়ে বিশ হাজার ফুট উঠে গেছে শিমবোরাজো পর্বতের বরফে ছাওয়া চূড়া। দুই পাশে তার দুই মহাসাগর। একপাশে প্রশান্ত, আরেক পাশে আটলান্টিক—যেদিকে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল নদী। জিভারোদের গ্রাম আড়ালে পড়ে গেল। দু-ধারেই ঘন জঙ্গল। নদীটা এখানে শ-খানেক ফুট চওড়া। কারও সঙ্গে যেন দেখা করার কথা, সময় বয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলেছে টলটলে স্বচ্ছ পানি। সেই সাথে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকা। পাঁচটা দাঁড়ের কোন কাজ নেই, নৌকার মুখ সোজা রাখা ছাড়া।

'দেখো দেখো,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ওপরে তাকাল মুসা।
'আরে নিচে, নিচে। পানির তলায়।'
গভীরতা কম। পরিষ্কার দেখা যায় তলার বালি। কালো রঙের ছোট ছোট কয়েকটা পাখি খাবার খুঁজছে।
পাখিগুলোকে বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না, দ্রুত সরে যাচ্ছে নৌকা।
'ওয়াটার উজ্ল,' বলল কিশোর। 'জলগায়ক বলতে পারো।'
'পানির তলায় উড়ছে,' বলল মুসা।
'উড়ছে না, সাঁতরাচ্ছে,' শুধরে দিলেন মিস্টার আমান। 'ওড়ার মত করেই ডানা ঝাপটায়। শামুক আর পোকা খুঁজছে। দমও রাখতে পারে অনেকক্ষণ।'
মস্ত কালো একটা ছায়া উড়ে এল মাথার ওপর, ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।
'আরি, কনডর!' বলল মুসা।
উত্তেজিত হয়ে উঠল বাকু। 'খুব খারাপ!' আমেরিকান শিংকোনা ব্যবসায়ীদের কাছে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছে সে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত বুলাল, অশুভ শক্তিকে ঠেকাল যেন।
'কুসংস্কার,' রবিন বলল। 'জিভারোদের বিশ্বাস, কনডর মানেই অশুভ সঙ্কেত। মরার গন্ধ পেলে, কিংবা কোন অঘটন ঘটবে বুঝলেই নাকি হাজির হয় ওরা।'
'খাইছে! তাই নাকি?' ভূতের ভয় মুসার বরাবর। পয়েন্ট টু-টু রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। 'ব্যাটাকে শেষ করে দেয়াই ভাল।'
বাধা দিলেন মিস্টার আমান। 'পয়েন্ট টু-টুর গুলিতে কিচ্ছু হবে না ওর। গুলিই নষ্ট করবে শুধু।'
'খাওয়া যায় না?'
'ইনডিয়ানরাও খায় না, মাংস এত বাজে।'
মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে বিশাল পাখিটা। এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা দশ ফুটের কম নয়।
বিড়বিড় করল মুসা, 'আরিব্বাপরে, কত বড়।'
'এটা তো ছোটই,' বলল কিশোর। 'এর চেয়ে অনেক বড় হয়, দুনিয়ার বৃহত্তম উড়ুক্কু পাখি কনডর। যেমন বড়, তেমন ভারি। অথচ অন্য সব পাখির চেয়ে বেশি ওপরে উঠতে পারে। না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে একটানা চল্লিশ দিন। খাবার পেলে একবারেই খেয়ে ফেলে আট-দশ কেজি।'
'শুনেছি, আস্ত ছাগল-ভেড়া নাকি তুলে নিয়ে যায়? মানুষের বাচ্চাও?'
'ভুল। নখে খুব ধার, কিন্তু বেশি ভারি জিনিস তোলার মত করে তৈরি নয়। সাংঘাতিক পাজি, আর দুঃসাহসী। বাগে পেলে ঘোড়াকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না।'
'অবশ্য যদি ঘোড়াটা রোগা কিংবা দুর্বল হয়,' যোগ করল রবিন।
'দুর্বল ঘোড়া' এখানে না পেয়েই যেন কিছুটা হতাশ, কিছুটা মনের দুঃখেই

যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে উড়ে চলে গেল উত্তরে।

কিন্তু বাকুর ভয় কাটল না। বারে বারে তাকাচ্ছে পাখিটা যেদিকে গেছে সেদিকে, মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'ভাল না, ভাল না! ফিরে যাব, ফিরে যাব!'

কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না। ঢালু বেয়ে তীব্র গতিতে নামছে স্রোতধারা, শুধু সামনেই এগোনো সম্ভব। পিছানো আর যাবে না।

অযথাই ভয় পেয়েছে বাকু। নিরাপদেই কাটল দিনটা। কোন অঘটন ঘটল না। অনেক পথ পেরিয়ে এল ওরা।

বিকেলের দিকে নোঙর ফেলল। রাত কাটাবে।

জায়গাটা ভারি সুন্দর। নদীর এক পারে সাদা বালির চর। তার পর ছোট একটা পুকুর। তাতে মাছ ঘাই মারছে। পুকুরের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল, হঠাৎ করে যেন গজিয়ে উঠেছে কালচে গাছের দেয়াল। গাঢ় হলুদ আর টকটকে লাল বুনোফুল পড়ন্ত আলোয় জ্বলছে।

মাথার ওপর দিয়ে ধীর গতিতে ভেসে যাচ্ছে সাদা বক।

নদীর পারে বড় বড় কয়েকটা গাছ, তার নিচে ক্যাম্প করবে ঠিক করেছে ওরা। তলাটা পরিষ্কার, ঝোপঝাড় নেই।

খালি জায়গার পরে যেখানে বন শুরু হয়েছে, সেখানে ঠাসাঠাসি ঝোপঝাড়ের মধ্যে সরু একটা ফাঁক দেখা গেল।

'পথ মনে হচ্ছে?' বাকুর দিকে ফিরলেন মিস্টার আমান, 'ইনডিয়ান?'

দ্বিধা দেখা দিল বাকুর চোখে। সে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখল। নরম বালিতে পায়ের ছাপ দেখিয়ে মাথা নাড়ল। ইনডিয়ান নয়।

ছেলেদেরকে ডেকে এনে দেখালেন মিস্টার আমান। 'এগুলো পেকারির খুরের দাগ।'

'আমাজনের বুনো শুয়োর তো?' কিশোর বলল, 'দল বেঁধে নাকি চলে। মানুষকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।'

'হ্যাঁ।'

'আমিও পড়েছি,' রবিন বলল। 'একবার নাকি একজনকে তিন দিন তিন রাত গাছের ডালে আটকে রেখেছিল পেকারির দল, নামতে দেয়নি।

'তারমানে এক নম্বর হারামী,' মুসা মন্তব্য করল।

আশপাশে আরও পায়ের ছাপ দেখালেন মিস্টার আমান। 'রাতে এখানে পানি খেতে আসে জানোয়ার। এই দেখো, ক্যারিবারার পায়ের দাগ। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ইঁদুর, ভেড়ার সমান এক্কেকটা। আর এই যে, হরিণের পায়ের ছাপ।'

'হ্যাঁ,' হরিণের খুরের দাগ মুসাও চেনে। বাবার সঙ্গে কলোরাডোতে শিকারে গিয়েছিল, তখন দেখেছে। 'বাবা, এটা কিসের দাগ? এরকম তো জীবনে দেখিনি।'

বড় বড় পিরিচের চাপে যেন তৈরি হয়েছে দাগগুলো।

'টিগ্রে!' ভয়ে ভয়ে বনের দিকে তাকাল বাকু। 'খারাপ জায়গা, খারাপ জায়গা!'

'এই টিগ্রেটা কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

'স্প্যানিশ ভাষায় টাইগারকে টিগ্রে বলে,' জবাব দিল কিশোর। 'মেক্সিকো আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় জাগুয়ারের নাম টিগ্রে। বাঘই এটা। তবে ডোরাকাটা নেই, আছে কালো গোল গোল ছাপ। ব্রাজিলিয়ান সীমান্তের কাছের পর্তুগীজেরা বলে ওনকা। যে নামেই ডাকা হোক, আমাজন বনের ওরা রাজা।'

'ভালো না, ভালো না,' কেঁদে ফেলবে যেন বাকু। 'ফিরে যাব, ফিরে যাব!'

'আরে কি মুশকিল,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'খালি ফিরে যাব ফিরে যাব করে। কে আসতে বলেছিল?'

'ভালো জায়গা পাওয়া গেছে,' দু-জনের কারও কথায়ই কান না দিয়ে বলল কিশোর। 'পানি খেতে এলে আজ রাতেই জাগুয়ারের ছবি তুলব।'

'এসে যদি মানুষের মাংসও খেতে চায়? রবিন বলল।

'না, সে ভয় তেমন নেই,' আশ্বাস দিলেন মিস্টার আমান। 'আমরা কিছু না করলে ওরাও কিছু বলবে না। তাছাড়া আমরা থাকব অনেক ওপরে, হ্যামকে।'

তাঁবু-টাবু আর স্লীপিং ব্যাগের ঝামেলা নেই, দশ মিনিটেই ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও জঙ্গলে সঙ্গে নেয় না অভিজ্ঞ শিকারীরা। নিলে শুধু বোঝাই বাড়ে, চলার অসুবিধে হয়, কাজে তেমন লাগে না।

মোট চারটে হ্যামক টানানো হয়েছে।

হ্যামক এক ধরনের বিছানা। আমাজন জঙ্গলের ইনডিয়ানরা তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার শহর অঞ্চলের অনেক বাড়িতেও হ্যামকই একমাত্র বিছানা। দিনের বেলা গায়েব, দেয়ালে দেয়ালে শুধু দেখা যাবে লোহার হুক গাঁথা। রাতে লিভিং রুম হয়ে যাবে বেডরুম। ওই হুক থেকেই ঝুলবে ঝুলন্ত বিছানাগুলো। জায়গা নষ্ট হয় না, বাড়তি বিছানা বিছিয়ে রাখার ঝামেলা নেই, মেহমান এলে কোথায় শোয়ানো যায়—ভেবে ভেবে যন্ত্রণা পাওয়ার কারণ নেই, সঙ্গে করে নিয়ে আসে যার যার হ্যামক। জিনিসটা অনেকটা ইজিচেয়ারে শোয়ার মত। ওই রকমই এক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে বিছানা হয়ে যায়। বাড়িঘরে যেগুলো ব্যবহার হয়, ওগুলোর চার কোণায় চারটে ফাঁস থাকে, ফাঁসগুলোকে হুকে আটকে দিতে হয়। আর জঙ্গলে ব্যবহারের সময় চার কোণার চারটে দড়ি গাছে বাঁধতে হয়। দুই দড়ির হ্যামকও আছে। সেগুলোতে ইজি চেয়ারের ডাণ্ডার মতই কাপড়ের দুই প্রান্তে ডাণ্ডা ঢোকানো থাকে।

আমাজন জঙ্গলের সব ইনডিয়ানরা অবশ্য হ্যামক ব্যবহার করে না, যেমন জিভারোরা। বাকু তাই অন্য ব্যবস্থা করল। মাটিতে ছোটখাটো একটা কবর খুঁড়ল। রাতে তার মধ্যে ঢুকে শুধু মাথাটা বাইরে রেখে গায়ের ওপর মাটি চাপা দিয়ে দেবে।

দিনের বেলা অসহ্য গরম, রাতে তেমনি হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। রোদ-তপ্ত মাটি

রাতে গরম কম্বলের কাজ দেয়।

বিছানা তৈরি শেষ। তীর-ধনুক নিয়ে বাকু চলল মাছ মারতে। ছেলেরাও চলল সঙ্গে। তীর দিয়ে কিভাবে মাছ শিকার করে, দেখেনি কখনও।

পুকুরে মাছের অভাব নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে রয়েছে। দেখতে দেখতে গোটা দুই বেশ ভাল সাইজের মাছ ধরে ফেলল বাকু, পাঁচজনেরই চলবে।

শিকার নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

আগুন ধরিয়ে ফেলেছেন মিস্টার আমান। শুকনো ডাল-পাতা ফেলতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

রাঁধতে বসল বাকু। ইনডিয়ান রান্না। নদীর পার থেকে পরিষ্কার কাদা তুলে এনে দুটো মাছের গায়েই পুরু করে মাখাল, বড় বড় দুটো কাদার পিণ্ড হয়ে গেল। কয়লার গনগনে আগুনে ফেলে দিল ওগুলো। তারপর বস্তা থেকে আলু বের করে মাছের মত একই ভাবে কাদা মাখালো। ওগুলোও ফেলল আগুনে।

কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল এক সময়। পিণ্ডগুলোকে আগুন থেকে বের করে পিটিয়ে কাদার আস্তরণ ভাঙল বাকু। ছুরি দিয়ে কেটে মাছ আর আলু বেড়ে দিল সবার পাতে।

ভোজনরসিক মুসা আমানকেও স্বীকার করতেই হলো, চমৎকার রান্না, ভাল স্বাদ।

রাত নেমেছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। হ্যামকে উঠল অভিযাত্রীরা। বাকু গেল তার কবরে।

হ্যামকের ওপরে ঝোলানোর জন্যে মশারি আছে, কিন্তু সেগুলো খোলার দরকার হলো না। মশা নেই এখানে। তবে বিষাক্ত কীট, এই যেমন পিঁপড়ে, শতপদী, বিচ্ছু, এসব আছে এন্তার। গাছ থেকে দড়ি বেয়ে বিছানায় উঠে আসতে পারে। তাই দড়িতে তীব্রগন্ধী কীটনাশক মাখিয়ে দেয়া হয়েছে।

তিন গোয়েন্দার কেউই আগে কখনও হ্যামকে শোয়নি। খাট তো নয় যে ধড়াস করে তাতে শুয়ে পড়লেই হলো। দুটো দড়ির ওপর ভার, ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যাপার আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিছানা যাবে উল্টে, ধুপুত করে গড়িয়ে তখন একেবারে মাটিতে।

'সোজা শুয়ো না,' হুঁশিয়ার করলেন মিস্টার আমান। 'কোণাকুণি শোও। নাহলে থাকতে পারবে না।'

দ্রুত অভ্যাস করে নিল ছেলেরা। কম্বল টেনে দিল গায়ের ওপর।

মিস্টার আমান আর মুসার নাক ডাকানোর শব্দ শোনা গেল। রবিনও ঘুমিয়ে পড়ল। কিশোর জেগে রইল ক্যামেরা নিয়ে। বেশি নড়াচড়ার উপায় নেই। সাবধানে কাত হয়ে বাকুর দিকে তাকাল সে।

খুব ভালমত জায়গা বেছে গর্ত করেছে বাকু। জন্তু-জানোয়ারের চলার পথ থেকে দূরে উঁচু জায়গায়। আগুনের আলোয় তার মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

ঘুমিয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

দিবাচরেরা ঘুমিয়েছে, জেগে উঠল নিশাচরেরা। শুরু হলো হাঁক-ডাক। যেন বলছে, 'এই ওঠো ওঠো, বেলা হয়েছে। আর কত ঘুমাবে।'

ঝিঁঝির কানে-জ্বালা-ধরানো ডাক দিয়ে শুরু হলো। কিছুক্ষণ ডেকে ক্লান্ত হয়ে সুর পাল্টাল ওরা। খাদে নামল শব্দ, দ্রুত লয় থেকে সরে এসেছে টানা লয়ে।

ড্রেইম ড্রেইম করে ডেকে উঠল একটা ব্যাঙ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে শুরু হয়ে গেল ডাক। সেই সঙ্গে যোগ হলো অন্য প্রজাতির হোউ-হেহো এবং ক্রোঁক ক্রোঁক। আরও ব্যাঙ আছে, তাদের কেউ গোঙাল, কেউ বা ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল। সে এক বিচিত্র কলতান।

হঠাৎ বেরসিকের মত বেসুরো গলায় চিৎকার করে উঠল একটা নাইটজার। ভূত বিশ্বাস করে না কিশোর। তার মনে হলো, যদি ভূত থাকত তাহলে হয়তো ওভাবেই কাঁদত। গায়ে কাঁটা দিল তার।

আরও নানারকম শব্দ হচ্ছে। বেশির ভাগই অচেনা।

হঠাৎ ভীষণ গলায় কেশে উঠল কে যেন! নিমেষে চুপ হয়ে গেল অন্য সমস্ত শব্দ। ওই কাশি কিশোরের চেনা।

শিকারে বেরিয়েছেন মহাবনের মহারাজা, মহাবীর টিগ্রে!

ছয়

দুপ করে একটা শব্দ। মুহূর্ত পরেই কানের পর্দা ফুঁড়ে দিল যেন তীক্ষ্ণ চিৎকার।

এত চমকে গেল কিশোর, আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল। টর্চের আলো ফেলল মাটিতে।

মিস্টার আমান জেগে গেছেন, রবিনও। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠল।

আবার বুনো চিৎকার। মুসার গলা মনে হচ্ছে? জাগুয়ারে ধরল না-তো! কিন্তু কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

তিনটে আলো একসঙ্গে ঘুরে গেল সেদিকে।

পাগল হয়ে গেছে যেন মুসা। জংলী-নৃত্য জুড়েছে। শরীরের যেখানে-সেখানে খামচি মারছে, থাপ্পড় মারছে। টেনে-ছিঁড়ে খুলে ফেলল শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়াও গায়ে রাখতে পারল না। একেবারে দিগম্বর। সেই অবস্থাতেই নাচানাচি। ঘাম-চকচকে কালো শরীর। সে-এক দেখার মত দৃশ্য।

'হেই, কিছু করো!' কেঁদে ফেলবে যেন মুসা। 'কিছু করো!'

লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। আলো ফেললেন মুসার কাছাকাছি মাটিতে। 'সরো, জলদি সরো ওখান থেকে! খেয়ে ফেলবে তো!'

কালো একটা সারি এগিয়ে চলেছে পিলপিল করে, ফুটখানেক চওড়া। শুরুও

নেই, শেষও নেই।

'কী?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সৈনিক পিঁপড়ে। জবাব দিল কিশোর। 'দেখো দেখো, অফিসারগুলোকে দেখো।'

ওদের সম্পর্কে পড়েছে রবিন। মাঝে মাঝে মাইলখানেকেরও বেশি লম্বা হয় একেকটা দল। চলার পথে জীবন্ত কিছু রাখে না, খেয়ে সাফ করে ফেলে। ভাল করে তাকাল দলটার দিকে। সারির পাশে ছুটাছুটি করছে কিছু পিঁপড়ে। সামনে দৌড় দিচ্ছে, পেছনে যাচ্ছে, মনে হয় দলছুট। আসলে তা নয়, খবরদারি করছে সৈনিকদের।

অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একটা চ্যালাকাঠ তুলে নিলেন মিস্টার আমান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন মুসাকে।

বললেই কি আর চুপ থাকা যায়? তবু সাধ্যমত স্থির রইল মুসা।

পিঁপড়ের গায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঠেসে ধরলেন মিস্টার আমান।

শক্ত, ধারাল বিশাল চোয়াল মাংসে গভীর ভাবে ঢুকিয়ে কামড়ে ধরে আছে পিঁপড়ে, গরম ছ্যাঁকা লাগতেই চোয়াল খুলে খসে পড়ছে। দু-চারটা ছ্যাঁকা মুসার চামড়ায়ও লাগছে। কিন্তু কামড়ের জ্বলুনির চেয়ে ছ্যাকার জ্বালা অনেক কম।

টেনে, খামচে অনেকগুলো শরীর ছিঁড়ে ফেলেছে মুসা। চোয়ালগুলো গেঁথে রইল গায়ে। ওগুলো খোলাই মুশকিল হলো। ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিসাবধানে একটা একটা করে চোয়াল তুললেন মিস্টার আমান। তারপর ওষুধ লাগিয়ে দিলেন আহত জায়গাগুলোতে। ছোপ ছোপ দাগ পড়েছে, বিচিত্র আলপনা কাটা হয়েছে যেন মুসার শরীরে।

মুখ টিপে হাসল কিশোর ও রবিন, অবশ্যই আরেক দিকে চেয়ে।

'যাও কাপড় পরে ফেলো,' বললেন মিস্টার আমান। 'হ্যামক থেকে নামলে কেন?'

'নামিনি তো,' লজ্জা পাচ্ছে এখন মুসা। 'পড়ে গিয়েছিলাম। ইবলিসগুলোও যাওয়ার আর জায়গা পেল না, একেবার আমার নিচে দিয়েই···আচ্ছা,বাকুকে ধরল না কেন?'

তাই তো? উত্তেজনায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। আলো ফেলা হলো। কবরটা আছে, কিন্তু বাকুর মাথাটা নেই

'খেয়ে ফেলল নাকি!' আঁতকে উঠল মুসা।

না, খায়নি। কবরের ওপর দিয়েই যাচ্ছে পিঁপড়ে। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে কিলবিল করছে কিছু। বাকুর মাথাটা যেখানে ছিল, সেখানে সামান্য ফুলে আছে মাটি। তারমানে মুখটাও নিয়ে গেছে মাটির তলায়।

আহত জায়গা ডলল মুসা। 'ইস্, কামড়ও মারে! যা জ্বালা!'

'জানো, ওই পিঁপড়ে দিয়ে শরীরের কাটা সেলাই করে ইনডিয়ানরা,' বললেন

মিস্টার আমান। 'কাটার দুটো ধার টিপে এক করে ধরে সেখানে কামড়াতে দেয় পিঁপড়েকে। চোয়াল মাংসে গভীর হয়ে গেঁথে গেলে টেনে শরীরটা ছিঁড়ে ফেলে। আটকে থাকে চোয়াল। কাটা জায়গা শুকিয়ে জোড়া না লাগার আগে আর খোলে না।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মুসা তো ছোট দলের সামনে পড়েছে। বড় দলগুলো যখন যায়, সাফ করে ফেলে সব। সামনে গ্রাম পড়লেও পথ পরিবর্তন করে না।'

'হ্যাঁ, গ্রামের ওপরই চড়াও হয়,' বললেন তিনি। 'পিঁপড়ের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই, গ্রাম ছেড়ে পালায় ইনডিয়ানরা। জঙ্গলে নিরাপদ জায়গায় সরে যায়। তবে পিঁপড়ের সামনে যাদের গ্রাম পড়ে তারা ভাগ্যবান। ফিরে এসে দেখে সব পরিষ্কার। পোকামাকড় সাপ-ব্যাঙের গোষ্ঠী সাফ।'

শেষ হলো দল। কবরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল লেজটা। কিভাবে জানি জেনে গেল বাকু। মাটি সরিয়ে আস্তে করে উঁকি দিল ওপরে।

হ্যামকে উঠল আবার সবাই। খুব সাবধানে রইল এবার মুসা।

হই-হট্টগোলে জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, আস্তে আস্তে শুরু হলো আবার।

চুপ করে পড়ে আছে কিশোর। আশা, যদি কেউ আসে এপথে? তবে সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। যা হই-চই হয়েছে, মাথামোটা গরু না হলে এপথে পানি খেতে আসার কথা নয় আর আজ রাতে কারও।

কিন্তু 'গরু' সব জায়গায়ই আছে, আমাজনের জঙ্গলেও।

ঝোপে ঘষা লাগার খসখস আওয়াজ হলো, পায়ের চাপে মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙছে। কোন ভারি জানোয়ার আসছে। উত্তেজনায় টানটান হয়ে রইল কিশোর।

ঝোপ থেকে বেরোল জীবটা। খোলা জায়গা পেরোচ্ছে। পানি খেতে নামবে নদীতে। ঠিক এই সময় ক্যামেরার শাটার টিপে দিল কিশোর।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জীবটা। তীব্র নীলচে আলোয় ক্ষণিকের জন্যে তার বোকাবোকা দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। জীবটার মুখ এখন ক্যামেরার দিকে ফেরানো। আবার শাটার টিপল সে। আবার।

অ্যাপারচার ছোট-বড় করে তিনটে ছবি তুলেছে কিশোর। একটা অন্তত ভাল হবেই।

কোথায় যেন পড়েছে সে: *দক্ষ নেচারালিস্ট প্রথমে ছবি তুলে নেয়, তারপর লক্ষ্য করে জীবটাকে।* কারণ, আগে না তুললে পরে আর ছবি তোলার সুযোগ না-ও পাওয়া যেতে পারে। তা-ই করেছে কিশোর। টর্চ জ্বেলে আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল জীবটাকে। চোখে আলো পড়ায় অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওটা, নড়ছেও না।

এর ছবি অনেক দেখেছে নেচারাল-হিস্টরি বইতে, চিড়িয়াখানায় জীবন্তও

দেখেছে। কিন্তু যে কোন জানোয়ারকে বনে তার নিজস্ব জায়গায় দেখার ব্যাপারই আলাদা। তাই ওটাকে দেখে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।

দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বুনো-জানোয়ার তাপির। সামনে যেটা রয়েছে, একশো চল্লিশ কেজির কম হবে না, অনুমান করল কিশোর। ফুট পাঁচেক উঁচু, লম্বা প্রায় ছয় ফুট। বিভিন্ন জানোয়ারের দেহের নানা অংশ জোড়া দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে। শরীরটা বিশাল এক শুয়োরের, ঘাড়ে ঘোড়ার কেশর, আর মুখের ওপরে হাতির ছোটখাটো একখান শুঁড়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জীবটা হাতির পূর্বপুরুষ। শুঁড়টা খুবই খাটো, কিন্তু আসল হাতির শুঁড়ের মতই ব্যবহার করে। কিশোরের মনে হলো, জীবটার নাম তাপির না হয়ে *শুঘোহা* হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ শুয়োর-ঘোড়া-হাতি।

একটা তাপিরের জন্যে মোটা টাকা অফার করেছে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানা। ধরতে পারলে কাজই হয়। ধরাও হয়তো যায়—যদিও খুব কঠিন কাজ, কিন্তু নেবে কি করে? যা নৌকার নৌকা, প্রায় চার মন ওজনের জীবটাকে তোলাই যাবে না ওতে, থাক তো বয়ে নেয়া। পোর্টেবল সাইজের একটা তাপির পেলে কাজ হত।

কিশোরের ডাকে সাড়া দিয়েই যেন এসে হাজির হলো পকেট এডিশন। পকেটে ধরবে না অবশ্যই, কিন্তু ক্যানূতে জায়গা হবে।

একটা শিশু তাপির। হোঁতকা মায়ের মত ভোঁতা বাদামী রঙ নয় চামড়ার। হালকা হলুদ ডোরা আর সাদা সাদা ছোপ। বড় হলে মুছে যাবে। শিশুসুলভ গোঁ-গোঁ, কুঁতকুঁত করে মায়ের দিকে ছুটে গেল সে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, দুধের জন্যে গলা শুকিয়ে কাঠ।

এই বাচ্চাটাকে ধরতে পারলে কাজ হয়, ভাবল কিশোর। ডাকবে নাকি সবাইকে? নাহ্, থাক। ডাকাডাকিতে যদি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায় মা? তার চেয়ে একা চেষ্টা করাই ভাল। তাপির সম্পর্কে যতখানি জানে কিশোর, খুব নিরীহ জীব। বিশেষ ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল ওদের। কিশোরকে হয়তো দেখতেই পাবে না।

নিশব্দে হ্যামক থেকে মাটিতে নামল সে। তাপির মায়ের চোখ থেকে আলো সরাল না।

দ্রুত হিসেব করে নিল মনে মনে। ভয় পেলে কোনদিকে পালাতে চাইবে মা? কাছাকাছি নদী থাকলে পানিতে ডুব মারে তাপির। এটাও হয়তো নদীতেই ঝাঁপ দেবে। মায়ের মত তাড়াহুড়ো করতে পারবে না বাচ্চাটা, দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলা যাবে।

পায়ে পায়ে এগোল কিশোর। মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল।

অনেক অপেক্ষা করেছে তাপির। আর করল না। সামান্য শব্দেই ওর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিল না, বরং মাথা নিচু করে ভীমবেগে ছুটে এল আলোর দিকে। ভুলেই গিয়েছিল কিশোর, নিরীহ মাতাও সন্তানকে রক্ষার সময়

ভীষণ হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে উঠল মা চেহারা আর আকারের সঙ্গে ডাকটা বড় বেশি বেমানান। মেঘের মত গুড়গুড় নয়, হাতি-কিংবা গণ্ডারের মত খনখনে ডাকও নয়, খেপা ঘোড়ার মত তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ করে উঠল। শেষ হলো টানা লয়ে, শিসের মত শব্দে। বিচিত্র জানোয়ারটার সব কিছুই অদ্ভুত।

সবাই জেগে গেল। লাফিয়ে হ্যামক থেকে নামলেন মিস্টার আমান। রবিন আর মুসাও নামল। কবর থেকে উঠে এল বাকু, প্রথম বসন্তের সাড়া পেয়ে গর্ত থেকে বেরোল যেন শজারু। তেমন করেই গা ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলল শরীর থেকে।

কেউ কিছু করার আগেই কিশোরের কাছে পৌঁছে গেল চারমনী দানবটা।

টর্চ ফেলে দিয়েছে কিশোর। একটাই উপায় দেখল বাঁচার। লাফ দিয়ে মাথার ওপরের একটা ডাল ধরে উঠে যেতে চাইল। কিন্তু ভার সইল না। ডাল ভাঙল। তাপিরের পিঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল সে। পতন রোধ করার জন্যে ঘাড়ের কেশর আঁকড়ে ধরল।

চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। তাপিরের বড় শত্রু জাগুয়ার। পিঠে চেপে গলায় নখ বসিয়ে আঁকড়ে ধরে। তাপির তখন ছুটে যায় ঘন কাঁটাঝোপের দিকে, কিংবা নিচু মোটা ডালের দিকে। তলা দিয়ে ছুটে যায় তীব্র গতিতে। শক্ত ডালে বাড়ি লেগে অনেক সময় ছাতু হয়ে যায় জাগুয়ারের মাথা। ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত থেঁতলানো দেহটা।

কিশোরও জাগুয়ারের মতই জীবটার পিঠে চেপেছে। এখানে কাঁটা ঝোপ নেই, তবে নিচু ডাল অনেক আছে। সে-রকম একটা ডালের দিকেই ছুটছে তাপির। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। আপনাআপনি কেশর থেকে খুলে এল আঙুলগুলো। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল।

গতি রুখতে পারছে না তাপিরটা। ছুটে যাচ্ছে।

হাঁপ ছাড়ল কিশোর। যাক, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে।

কিন্তু একথা ভেবে আরেকটা ভুল করল সে। নিরীহ মাতাও ক্রুদ্ধ হলে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তাপিরটা তা-ই বুঝিয়ে দিল।

কয়েক গজ এগিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াল সে। তারপর চোখের পলকে ঝটকা দিয়ে ঘুরল। এত মোটা থলথলে একটা শরীর নিয়ে যেভাবে ঘুরল, অবাক না হয়ে পারা যায় না। ছুটে এল যেন কালবৈশাখীর ঝড়। সেই সঙ্গে একটানা তীক্ষ্ণ শিস।

কিভাবে খাড়া হলো কিশোর, বলতে পারবে না। গুঁতো লাগে লাগে, এই সময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এক পাশে।

কয়েক গজ গিয়ে আবার ঘুরল জানোয়ারটা। আবার ছুটে এল। পুরোপুরি গণ্ডারের স্বভাব। শত্রুকে শেষ না করে স্বস্তি নেই।

এক সাথে দুটো টর্চের আলো এসে পড়ল তাপিরের চোখেমুখে। গর্জে উঠল রাইফেল। থরথর করে কেঁপে উঠল বনভূমি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিরো ক্যালিবারের

উইনচেস্টার রাইফেল থেকে বেরোনো একশো তিরিশ গ্রেন এক্সপ্যানডিং বুলেটের প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় উল্টে পড়ল ভারি জীবটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বাচ্চাটা কোথায়? এদিক-ওদিক তাকাল সে? ওই তো। মায়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে নিথর দেহটার ওপর। মা যে মারা গেছে, বুঝল না। শুঁড়ের মত নাক দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল মায়ের পেটে। মনে করল বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরকম তো প্রায়ই ঘুমোয় মা। তখন আরামসে শুয়ে শুয়ে দুধ খায় সে। এখনও তাই করল।

নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো কিশোরের। এ-কি করল? তার দোষেই তো মা-হারা হলো অতটুকুন দুধের বাচ্চাটা।

সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখছে।

কিশোর চুপ, রবিন স্থির। রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার আমান।

ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে এতিম বাচ্চাটার পাশে বসে পড়ল মুসা। আস্তে করে ওটার মখমলের মত মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাবিসনে, খোকা। দুঃখ করিসনে। মা-তো চিরকাল কারও বেঁচে থাকে না। খুব ভাল চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব তোকে, ভাল ভাল খাবার খেতে দেবে ওরা। তোর একলার জন্যেই চমৎকার একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেবে। সেখানে জাগুয়ারের ভয় নেই। আল্লার কসম, তোকে আমরা মরতে দেব না কিছুতেই।'

সাত

পরদিন সকালে আবার নৌকা ভাসাল ওরা।

ধীরে ধীরে বাড়ছে স্রোত, ঢালু হচ্ছে নদী। খানিক পরেই বোঝা গেল কারণটা। সামনে জলপ্রপাত। কাজেই বয়ে নিতে হলো নৌকা আর মালপত্র।

জলপ্রপাতের নিচ থেকে আবার শুরু হয়েছে নদী। প্রথমে মালগুলো বয়ে এনে নদীর পাড়ে রাখল ওরা। তারপর নৌকাটা বয়ে নিয়ে এল। আবার ভাসল পানিতে। মাল সাজিয়ে রেখে নৌকায় উঠল সবাই, বাকু বাদে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাকু। দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'ফিরে যাব!'

বোঝাতে চাইলেন মিস্টার আমান, তর্ক করলেন, কোন লাভ হলো না। বাকুর এক কথা, ফিরে যাবে। তার চেনা অঞ্চল এখানেই শেষ। জলপ্রপাতের পর কি আছে জানে না সে, যায়নি কখনও। কোন রহস্যময় আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওখানে, জানে না। লোকজনকে চেনে না। শুধু শুনেছে, ওখানকার লোকেরা নাকি খুব খারাপ।

নদীর ধার বরাবর উজানে হেঁটে গেলে তার গাঁয়ে পৌঁছতে দিন দুই লাগবে।

পাওনা টাকা মিটিয়ে দিলেন মিস্টার আমান। কিছু খাবার দিতে চাইলেন।

নিল না বাকু। হেসে কাঁধে ঝোলানো ধনুকে চাপড় দিল। 'আমি খাব।' খাবার

অভাব হবে না তার। নদী আর বন থেকে জোগাড় করে নিতে পারবে।

নৌকাটা বেশি পানিতে ঠেলে দিল বাকু। দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধুদের চলে যেতে দেখে যেন খারাপ লাগছে তার।

এক টানে ক্যানূটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল স্রোত। ভাসিয়ে নিয়ে চলল। হাত নেড়ে জিভারো ভাষায় 'গুড বাই' জানাল বাকু, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। উঠতে শুরু করল প্রপাতের ধারের পাথুরে ঢাল বেয়ে। ওপরে উঠে ফিরে তাকাল আবার আরেকবার হাত নাড়ল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

নিজেদের বড় একা মনে হলো অভিযাত্রীদের। একজন মাত্র চলে গেছে, ওরা রয়েছে চারজন, অথচ একা লাগছে। ভারি অদ্ভুত। বার বার প্রপাতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। এই জঙ্গল, এই প্রকৃতি ওদের অচেনা। বাকু যতক্ষণ ছিল, কিছুটা ভরসা অন্তত ছিল। এমন এক জায়গায় রয়েছে ওরা এখন, যেখানে সভ্য মানুষ আর আসেনি। ওরাই প্রথম। সেজন্যে কিছুটা গর্বও বোধ করছে।

কথা শুরু করল মুসা।

'নাকু খেতে চাইছে।'

শুঁড়ের মত লম্বা নাকের জন্যে তাপিরের বাচ্চার নাম রেখেছে কিশোর, নাকু।

'খায় কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি আর খাবে?' কিশোর বলল। 'লতাপাতা, মূল, রসাল শাকসব্জি। তবে বাচ্চাদের বোধহয় দুধ দরকার।'

'দুধ পাব কোথায়? কচি ঘাসই খাওয়াতে হবে।'

দাঁড় বেয়ে নৌকা তীরে নিয়ে এল ওরা। বালিতে ঘ্যাঁচ করে নৌকার তলা লাগতেই তীরে নামল মুসা। ঘাসের অভাব নেই। ভাল দেখে দুই মুঠো ছিঁড়ে নি এল। বাড়িয়ে দিল নাকুর মুখের কাছে।

নাক ফিরিয়ে নিল নাকু। খাবে না।

'হুঁ, জ্বালাবে দেখছি,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।

আরেকবার ঘাস খাওয়ানোর চেষ্টা করল মুসা।

খেল তো না-ই, চাপাচাপিতে বিরক্ত হয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে পানিতে পড়ার চেষ্টা করল নাকু। তার গলায় বাঁধা লিয়ানা লতার রাশ টেনে ধরে থামানো হলো অনেক কষ্টে। দুলে উঠল নৌকা। আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে।

'হয়েছে, ঘাস খাওয়ানোর দরকার নেই,' হাত নাড়লেন মিস্টার আমান। 'থাক উপোস। মরবে না। পরে দেখা যাবে।' কাগজের প্যাড, পেন্সিল আর কম্পাস বে করলেন তিনি।

'নদীর ম্যাপ আঁকবেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'আমার কাছে দিন,' উত্তেজনা চাপতে পারল না কিশোর। 'আমি দেখি চে করে।' অজানা জায়গার ম্যাপ আঁকার মধ্যে একধরনের রোমাঞ্চ আছে। স

মিস্টার আমান। 'গুড। নাও।'

জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখ। চার দিকে তাকাল। 'কোনটা থেকে শুরু করি?...জলপ্রপাত। কি নাম দেয়া যায়?' মুসার দিকে তাকাল।

'আমি কি জানি?' দু-হাত শূন্যে তুলল মুসা।

'বাকু ফলস!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'উঁহু, নাকুনাপ্রপাত,' বলল কিশোর। নাকুর মায়ের সম্মানে। 'বাকু ব্যাটা তো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাকে সম্মান দিতে যাব কেন?'

'ফলসের বাংলা জলপ্রপাত, না?' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার আমান, 'ঠিক আছে, রাখো।'

কাগজের ওপর দিকে একটা চিহ্ন আঁকল কিশোর। পাশে লিখল, নাকুমাপ্রপাত।

গ্রাফপেপারে আঁকছে সে। নীল রঙের ছোট ছোট অসংখ্য বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে পেপারে। সেগুলোর ভেতর দিয়ে বাঁকা রেখা এঁকে চলল। নাকুমাপ্রপাতের পর নদীটা যত বার বাঁক কিংবা মোড় নিল, কিশোরের লাইনও ততবার মোড় আর বাঁক নিল। কোনদিকে খেয়াল নেই, কাজ করে চলেছে একমনে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কম্পাসের দিকে। দিক মিলিয়ে নিচ্ছে। সার্ভেয়াররা কি করে কাজ করে, দেখেছে। ম্যাপও মোটামুটি আঁকতে জানে সে। অসুবিধে তেমন হলো না।

'ইস্, যন্ত্রপাতি যদি থাকত,' আফসোস করল।

সার্ভে করার যন্ত্রপাতি অনেক ভারি, ওদের পক্ষে আনা সম্ভব ছিল না। মিস্টার আমান বললেন, 'খসড়া এঁকে নিয়ে গেলে, আর কর্তৃপক্ষকে বোঝানো গেলে হয়তো সার্ভে টিম পাঠাবে।'

টিলা-পাহাড়-পর্বত কিছুই বাদ গেল না কিশোরের ম্যাপ থেকে. আনুমানিক অলটিচিউড দিয়ে রাখছে। মার্জিনের বাইরে নোট লিখে রাখছে—বন কোথায় ঘন, কোথায় রয়েছে দামী কাঠের গাছ।

সাহায্য করছেন মিস্টার আমান। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জঙ্গলের ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছেন ছেলেদের।

নদীটা কোথায় চওড়া, কোথায় সরু, গভীরতা, ঢালু কতখানি, কিছুই চোখ এড়াচ্ছে না কিশোরের। আন্দাজে কাজ করতে হচ্ছে, তবু যতখানি সম্ভব নিখুঁতভাবে আঁকার চেষ্টা করছে।

উত্তেজনায় বার বার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে তার। ভাবতে ভাল লাগছে, তার আঁকা ম্যাপের ওপর ভরসা করে হয়তো আসবে আগামী দিনের অভিযাত্রীরা। তার কথা বলাবলি করবে। হয়তো রেফারেন্স বইয়ে চিরদিনের জন্যে উঠে যাবে তার নাম। লেখা হবে ঃ কিশোর পাশা, দা ফার্স্ট ইয়াং পাইআনিয়ার ফ্রম দা নাকুমাপ্রপাত...আর ভাবতে পারল না সে। রোমাঞ্চিত হলো শরীর।

অন্যদের যেমন তেমন, দিনটা কিশোরের ভালই কাটল। এতই তন্ময় হয়ে কাজ করল, ঘনবনে মারাত্মক শত্রু থাকতে পারে, সেকথাও মনে হলো না একবার।

বিকেলের দিকে বেশ চওড়া হয়ে এল নদী। তার মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপে রাত কাটানোর জন্যে ক্যাম্প করল ওরা। ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে জায়গাটা। বনের ভেতর থেকে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানরা এলে, তাদের অলক্ষে আসতে পারবে না।

রাতে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহলের মাঝে ঢাকের শব্দ কানে এল বলে মনে হলো ওদের। তবে নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

পরের দিনও একটানা চলল ক্যানূ, সেই সঙ্গে চলল ম্যাপ আঁকা। ইনডিয়ানদের দেখা নেই। নাকুকেও খাওয়ানো গেল না। মাঝে মাঝেই কুঁই কুঁই করে উঠছে। খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে, মাকে ডাকছে। ওর ব্যাপারে আর নির্লিপ্ত থাকা গেল না। এই অবস্থা চলতে থাকলে চিড়িয়াখানা দেখানো যাবে না তাকে।

সমস্যার সমাধান করল বটে মুসা, কিন্তু নাকুকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকটু হলে সবাই মরেছিল।

একটা মোড় ঘুরে কাদাপানিতে দুটো ছাগল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। পানি খেতে নেমেছে। নদীর পাড়ে খানিকটা খোলা জায়গা, তৃণভূমি। সেখানে চরছে আরও কয়েকটা ছাগল। কয়েকটা মাদীও আছে, সঙ্গে ছোট বাচ্চা। তারমানে মাগুলো একেকটা দুধের ডিপো।

'বনছাগল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নাকুর দুধ জোগাড় হবে।'

পানি খাওয়া বাদ দিয়ে নৌকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাগলদুটো। নড়ছেও না।

'উঁহু, বুনো না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'নৌকা দেখলেই পালাত তাহলে।'

'গাঁ-টাঁও তো দেখছি না,' রবিন বলল।

'আছে হয়তো বনের ভেতরে কোথাও,' বললেন মিস্টার আমান।

'ওখানেই নামা দরকার,' খোলা জায়গা দেখাল মুসা। 'দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই।'

সবাই রাজি।

নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামল ওরা। খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য জিরিয়ে নেয়ার জন্যে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল সবাই, মুসা বাদে। একটা পানির বোতল খালি করে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল। চরতে চরতে একটা উঁচু টিপির ওপাশে চলে গেছে ছাগলগুলো।

মিনিট পনেরো পরেই মুসার চিৎকারে লাফিয়ে উঠল তিনজনে। শাঁ করে বাতাস কেটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা তীর।

দুধের বোতল হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে মুসা। 'জলদি! তীর ছুঁড়ছে!'

চোখের পলকে নৌকায় উঠে দাঁড় বেয়ে ওটাকে মাঝনদীতে নিয়ে এল ওরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তীব্র স্রোত। টেনে নিয়ে চলল ক্যানূটাকে। আরেকটা তীর উড়ে এল, কিন্তু পড়ল নৌকার পেছনে কয়েক হাত দূরে। দেখতে দেখতে

একটা মোড়ের আড়ালে চলে এল ওরা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বেশিক্ষণ টিকল না স্বস্তি। বাঁকের কাছে খানিকটা জায়গার ঝোপঝাড় পরিষ্কার, ঘাটে একটা ক্যানূ বাঁধা।

শাঁই শাঁই করে ক্যানূটার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কিন্তু বড়জোর শ-পাঁচেক গজ এগিয়েই কানে এল উত্তেজিত চিৎকার। ফিরে চেয়ে দেখল, লাফিয়ে ঘাটের ক্যানূতে উঠছে তিনজন ইনডিয়ান। বাকুর গাঁয়ের মানুষের মত পোশাক পরা নয়, প্রায় উলঙ্গ।

নাকুকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে এখন মুসা।

দাঁড়ের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে ওরা, যেন ওগুলোই তাদের এখন বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।

তিনজনের বিরুদ্ধে চারজন। সংখ্যায় বেশি বটে, তবে সেটা হাতাহাতি লড়াইয়ের বেলায়। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে বিষাক্ত তীর, রক্তে ওই বিষ ঢুকলে সর্বনাশ হবে। ওদের তীর কিংবা ডার্টগানের রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে। গুলি আপাতত করতে চাইছেন না মিস্টার আমান। মানুষের রক্তে কখনও হাত ভেজাননি, রেকর্ডটা ভাঙার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। তবে তেমন ঠেকায় পড়লে···

দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল চার অভিযাত্রী।

কিন্তু এসব অঞ্চল ইনডিয়ানদের পরিচিত। এখানকার নদীতে নৌকা চালিয়ে তারা অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় পারবে কেন বিদেশীরা? তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না।

মাইলখানেক পর্যন্ত আগে আগে রইল ওরা, তারপর গতি কমাতে বাধ্য হলো। নিচে পানি কম, বালিতে ঠেকে যাচ্ছে নৌকার তলা। গায়ের জোরে ঠেলে নিতে হচ্ছে এখন।

প্রায় উড়ে চলে এল ইনডিয়ানদের ক্যানূ। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গেছে। একজন দাঁড় ফেলে দিয়ে সাত ফুট লম্বা এক ধনুক হাতে খাড়া হয়ে গেল।

টংকার উঠল ধনুকের ছিলায়। শিস কেটে উড়ে এল তীর।

খ্যাট করে বিঁধল নৌকার একপাশে। র‍্যাটল সাপের লেজের হিড়হিড় শব্দ তুলে কাঁপল কিছুক্ষণ তীরের পালক লাগানো পুচ্ছ, যেন জীবন্ত।

সংগ্রাহক হিসেবে কিশোর পাশা অনন্য। এই বিপদের মাঝেও ভুলে যায়নি, দুর্গম এলাকার নরমুণ্ড শিকারীদের তৈরি এরকম একটা তীর সাড়া জাগাবে শহুরে দর্শকদের মাঝে, লুফে নেবে নেচারাল হিসট্রি মিউজিয়ম। আস্তে করে তীরটা খুলে নিয়ে নৌকার তলায় ফেলল সে, তারপর আবার দাঁড় তুলে নিল হাতে।

মিস হয়েছে দেখে রাগে চেঁচিয়ে উঠল ইনডিয়ানরা। আরেকটা তীর ধেয়ে এল। গলা বাঁচাতে হাত তুললেন মিস্টার আমান, তীরটা গাঁথল তাঁর ডান বাহুতে।

আর উপায় নেই। রাইফেল তুলে নিলেন তিনি। পয়েন্ট টু-সেভেন-জিরো নয়,

অন্য আরেকটা। পয়েন্ট থ্রি-জিরো-জিরো। ভোঁতা-মাথা প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট, ধ্বংস-ক্ষমতার জন্যে কুখ্যাতি আছে।

হাত কাঁপছে মিস্টার আমানের। ডান বাহুতে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

'আমাকে দাও, বাবা,' হাত বাড়াল মুসা। আগে এয়ারগান দিয়ে একটা ঘুঘুকে মারলে পড়ত তার তিনহাত দূরে বসা ঘুঘুটা, কিন্তু শুটিং ক্লাবে ভরতি হওয়ার পর হাত অনেক সোজা হয়ে গেছে তার। ছোটখাটো বাজিও জিতেছে কয়েকটা শুটিঙে।

'মেরো না,' রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'না, মারব না।' ক্যানূর কিনারায় রাইফেলের নল রেখে প্রায় শুয়ে পড়ল মুসা। জংলীদের নৌকার এক পাশে পানির সমতলের একটু নিচে সই করে টিপে দিল ট্রিগার।

নীরবতা খানখান করে দিল ভারি রাইফেলের কানা-ফাটা শব্দ। নৌকার পাশে পানি ছিটকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। ফুটো দিয়ে পানি ঢুকেছে, ডুবতে শুরু করল নৌকা।

তাড়াহুড়ো করে ডুবন্ত নৌকাটা তীরের দিকে নিয়ে চলল ইনডিয়ানরা।

'আংকেল, বেশি ব্যথা করছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু করতে হবে?'

'দাঁড় বাও। মুসা, খানিকটা লবণ দাও তো।'

অবাক চোখে তাকাল মুসা। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি বাবা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, লবণের কথাই বলছি।'

'মুসা, দাও জলদি,' দাঁড় বাইতে বাইতে বলল কিশোর।

হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে অন্য তীরটার কাছে ফেললেন মিস্টার আমান। দুটো তীরের মাথায়ই কালচে আঠামত জিনিস মাখানো। কিউরেয়ার বিষ।

আস্তিন গুটিয়ে ওপরে তুলে দিলেন তিনি। সামান্য ক্ষত, কিন্তু যেটুকু হয়েছে তা-ই যথেষ্ট। বিষ ঢুকছে শরীরে। বেশি ঢুকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটাবে। ইনডিয়ানরা লবণ বিশেষ খায় না, জন্তু-জানোয়ারেরা তো আরও কম খায়। তাই তাদের শরীরে কিউরেরায় ক্রিয়া করে বেশি। কিন্তু লবণ-খেকো শহুরে মানুষকে কতখানি কাবু করতে পারবে, বলা যাচ্ছে না।

ছুরি দিয়ে কেটে ক্ষতটা বড় করলেন মিস্টার আমান। তাতে লবণ ডলতে শুরু করলেন। খানিকটা লবণ মুখে ফেলে পানি দিয়ে গিলে নিলেন।

'তোমরা বাও, থেমো, না,' প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি। 'আমি আর বসতে পারছি না।'

নৌকার তলায় শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

'নৌকা তীরে ভেড়াব, আংকেল?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ভালমত শুতে পারবেন।'

'না না, ওকাজও করো না। জলদি ভাগতে হবে এখান থেকে। ভেব না, আমি

ঠিক হয়ে যাব।'

দেহের স্নায়ু আর মাংসপেশীর যোগাযোগ নষ্ট করে দেয় কিউরেয়ার। ফলে আজকাল ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালে ব্যবহার হচ্ছে এই জিনিস, রোগীর পেশীর পীড়ন দূর করে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে। মিস্টার আমানেরও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কতখানি বিষ ঢুকেছে শরীরে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘুম থেকে আর জাগবেন তো?

মাথা আর ঘাড়ের মাংসপেশী প্রথমে অসাড় হবে। হলোও তাই। মাথা ঘোরাতে পারছেন না মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে অসাড়তা, ছড়িয়ে পড়ছে বুকে, পিঠে, বক্ষপিঞ্জরের ফাঁকে ফাঁকে মাংসপেশীতে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যত ব্যথাই করুক, অসুবিধে হোক, জোর করে শ্বাস টানতে হবে। ফুসফুসকে বাতাস-শূন্য হতে দেয়া চলবে না কিছুতেই। তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু।

অবস্থা কতখানি সঙ্গিন, কিছুটা বুঝতে পারছে রবিন। কিশোর পারছে পুরোপুরিই। কিউরেয়ারের মারণ-ক্ষমতার কথা ভালমতই জানা আছে তার। মুসা জানে না। মুখ খুলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু চোখ টিপে তাকে নিষেধ করল কিশোর। ভয় পেয়ে যাবে মুসা। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন তাদের কিছু করার নেই।

জংলীদের চেঁচামেচি কানে আসছে। বাড়ছে আস্তে আস্তে। তারমানে লোক জড় হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে দূরে।

আট

ড্রিম-ড্রিম-ড্রিম-ড্রিম! ছড়িয়ে পড়েছে একটানা শব্দ।

'ঢাক!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'সতর্ক করে দিচ্ছে গাঁয়ের লোককে।'

শঙ্কিত হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল সে, কিন্তু আর কোন ক্যানু দেখা গেল না। কে কত তাড়াতাড়ি পানিতে দাঁড় ফেলতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন তিনজনে। তার ওপর সাহায্য করছে স্রোত।

স্রোত অবশ্য জংলীদেরকেও সহায়তা করছে।

উত্তেজিত অশ্বশাবকের মত ফুঁসছে নাকু।

'চুপ থাক, খোকা,' মুসা বলল। 'তোকে দেখার সময় নেই এখন।'

দুধের বোতলটার ওপর নজর পড়ল তার। কড়া রোদে পড়ে আছে। গরমে নষ্ট হয়ে যাবে দুধ। অনেক মূল্য দিতে হয়েছে ওর জন্যে। আরও কত দিতে হবে কে জানে। মালপত্রের ছায়ায় বোতলটা ঠেলে দিল মুসা। ভেজা রুমাল দিয়ে ঢেকে দিল।

ম্যাপের কথা ভোলেনি কিশোর। কিন্তু এখন যা অবস্থা, প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল, থাক তো ম্যাপ আঁকা। তার সমস্ত হতাশা আর ক্ষোভ গিয়ে পড়ল যেন দাঁড়ের ওপর, গায়ের জোরে ঝপাত করে ফেলল পানিতে।

সামনে আরেক বিপদ। পানির গর্জনেই বোঝা যায় হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে নদীটা, অনেক গুণ বেড়ে গেছে স্রোতের তীব্রতা। রোদে লাফিয়ে উঠছে সবুজ-সাদা ঢেউ। খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য অনেকখানি মলিন করে দিয়েছে ঢেউয়ের নিচ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়া বড় কালো পাথরের বিষণ্ণ ভোঁতা মুখ।

ফেরার সময় নেই। আর ফিরে যাবেই বা কোথায়? হড়াৎ করে এক টানে সেই তা-থৈ ঢেউয়ের মধ্যে ক্যানূটাকে ফেলল স্রোত।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে চরকির মত পাক খেল নৌকাটা, তারপর নাক নিচু করে ছুটে চলল ভীষণ গতিতে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দানবীয় এক অজগরের মত বার বার এঁকে বেঁকে গেছে নদী, সেই পথ অনুসরণ করল নৌকা। যে কোন মুহূর্তে উল্টে যাওয়ার ভয়কে যেন তোয়াক্কাই করছে না।

বিশাল দুই পাথরের চাঁইয়ের মাঝে যেন ডাইভ দিয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ঢাল। সরু পথ, দু-ধারে পাথরের দেয়াল। সামান্যতম এদিক ওদিক হলেই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে নৌকা।

সামনের গলুইয়ের কাছে বসেছে কিশোর, মাঝে রবিন, পেছনে মুসা—নৌকা বাওয়ায় দক্ষ বলে একই সঙ্গে হাল ধরা এবং দাঁড় বাওয়ার কঠিন দায়িত্বটা নিয়েছে সে।

আতঙ্কিত চোখে গিরিপথের দিকে তাকাল কিশোর। কি করবে? দাঁড় আড়াআড়ি ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করবে? কয়েকটা ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে। প্রচণ্ড তাপ সইতে না পেরে দু-টুকরো হয়ে যেতে পারে দাঁড়। ধাক্কা দিয়ে চিত করে ফেলতে পারে তাকে। কিংবা ছুটে এসে বুকে বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পারে পানিতে। তারমানে, দাঁড় দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।

কিশোর সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই লাফ দিয়ে গিয়ে গিরিপথের মুখে পড়ল নৌকা। শাঁ করে ঢুকে গেল ভেতরে। ভাগ্য আরেকবার পক্ষ নিল তাদের, কোন দেয়ালেই ধাক্কা লাগল না, এমনকি সামান্যতম ঘষাও নয়। স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলল নৌকা।

ভীষণ গর্জন, দু-পাশ দিয়ে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে চলেছে যেন দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন। চাপে পড়ে পাগল হয়ে গেছে বুঝি মাতাল স্রোত, গা ঝাড়া দিয়ে পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে, ফলে বৃষ্টির মত ছিটাচ্ছে পানির ছাঁট, অন্ধ করে দিতে চাইছে যেন অভিযাত্রীদের। এত ঘন ছাঁট, মনে হচ্ছে পথ জুড়ে রয়েছে সাদাটে অসংখ্য চাদর। ওই চাদরকে ছিঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে ক্যানূটা।

ঢালু জায়গা সোজা হয়ে গেছে অনেক আগেই। কমতে শুরু করল স্রোতের তীব্রতা। সামনে সামান্য উঁচু হয়েছে পথ, তার গোড়ায় পানির ফেনা।

পাথরের চাঙড় পেছনে ফেলে এল নৌকা। গর্জন হঠাৎ করে অনেক কমে গেছে। সামনে পথ উঁচু, তাই স্রোতও খুব কম। দাঁড় বাইতে হচ্ছে। পানির আওয়াজ কমে যেতেই এখন আবার শোনা যাচ্ছে ঢাকের শব্দ।

'দারুণ দেখিয়েছ,' নৌকার তলায় শুয়ে দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান।

'মনে হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবে ব্যাটারা,' বলল কিশোর। 'অনেক সময় লাগাবে।'

'ওই যে, আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল কিশোর আর মুসা। ঘুরে নয়, চাঙড়ের ভেতর দিয়েই আসছে ওরাও।

অভিযাত্রীদের দেখে পানির গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জংলীরা। সোজা ছেড়ে দিয়েছে তাদের ক্যানূ, ঢাল বেয়ে পড়ছে। চাঙড় দুটোর মাঝে পড়ে ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে গেল নৌকাটা, আবার যখন ভাসল, দেখা গেল উল্টে গেছে। ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে তিনটে কালো মাথা।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।

কিন্তু তাদেরটা ডুবল না, ইনডিয়ানদেরটা ডুবল কেন? ওরা তো ক্যানূ চালানোয় অনেক বেশি দক্ষ। কিশোর অনুমান করল, মালের বোঝা-ই তাদের নৌকাটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার ওপর তলায় শুয়ে রয়েছেন মিস্টার আমান। তলা ভারি হয়ে যাওয়ার ভারসাম্য ভাল হয়েছে নৌকাটার, গড়াগড়ি করছে কম, কাত প্রায় হচ্ছেই না।

ঢালের ওপরে আরেকটা ক্যানূ দেখা গেল। তার পেছনে আরেকটা। দুটোই নেমে এল ঢালের নিচে। চাঙড়ের মাঝে ঢোকার আগের মুহূর্তে শাঁই করে পাশ কেটে সরে গেল পাশের প্রণালীতে। অভিযাত্রীদের পিছু না দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় পাথরে ঠেকিয়ে নৌকা আটকাল জংলীরা। উল্টে যাওয়া ক্যানূটা তুলতে শুরু করল, আর পড়ে যাওয়া তিনজনকেও।

জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল তিন গোয়েন্দা। খানিকটা সময় পাওয়া গেছে, এই সুযোগে সরে যেতে হবে যত দূরে পারা যায়।

সমান জায়গাটা পেরিয়ে এল। আবার ঢালু হতে শুরু করেছে পথ। অনেক দীর্ঘ একটা মোড় নিয়েছে নদী। তারপরে আরেক সমস্যা।

বিশাল পাহাড়ের মাঝে একটা সরু সুড়ঙ্গ, ওপরে ছাত নেই, তার মাঝে ঢুকে গেছে নদীটা। জায়গাটা ওখানে ঢালু, ফলে স্রোতের বেগ বেড়েছে। এগিয়ে গেলে ওটার মধ্যেই ঢুকতে হবে, আর কোন পথ নেই। মস্ত ঝুঁকি হয়ে যাবে সেটা। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলে আর পিছিয়ে আসা যাবে না, পেছনে উজান। নামতে হবে ভাটির দিকে। চলে যেতে হবে শেষ মাথা পর্যন্ত। সেখানে কি আছে জানে না ওরা।

তীরে ভেড়ানোর সময় আছে এখনও। কিন্তু তাতে লাভটা কি হবে? জঙ্গলের মধ্যে ইনডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে একশো গজও যেতে পারবে না, তার আগেই ধরা পড়বে। ফিরে চেয়ে দেখল কিশোর, উল্টানো নৌকাটা সোজা করে ফেলেছে জংলীরা, আরোহী তিনজনও তাতে উঠে বসেছে। তাড়া করে আসবে আবার

নাহ্, তীরে ভেড়ানো যাবে না। বেশি ভাবারও সময় নেই। দাঁড় বেয়ে এড়িয়ে চলল ওরা সুড়ঙ্গমুখের দিকে।

দূর থেকেই শোনা গেল সুড়ঙ্গের পানি ঢোকার গর্জন। পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে শব্দ, তাতে শব্দ আরও বেশি মনে হচ্ছে।

পেছনে আর একশো গজ দূরেও নেই জংলীরা, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে দ্রুত। একনাগাড়ে চেঁচাচ্ছে। তীর ছুঁড়তে শুরু করেছে কেউ কেউ। কিন্তু রেঞ্জ পাচ্ছে না, অভিযাত্রীদের অনেক পেছনে পড়ছে তীর।

সুড়ঙ্গমুখ তো নয়, যেন হাঁ করে রয়েছে এক মহাদানব। তার কালো মুখগহ্বরে গলগল করে ঢুকছে রাশি রাশি পানি। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। দানবের মুখে ঢুকে পড়ল অভিযাত্রীরা, ছুটে চলল তার কণ্ঠনালী ধরে।

পেছনে আবার শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার। চকিতের জন্যে একবার মুখ ফেরাল কিশোর। সুড়ঙ্গে ঢোকার আগের মুহূর্তে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে জংলীরা, ভেতরে ঢুকছে না।

'আসছে না!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ভয় পেয়েছে।'

কিন্তু কিশোরের মুখ কালো হয়ে গেল। তলপেটে শূন্য এক ধরনের অনুভূতি, শীত শীত লাগল। কড়া রোদ থেকে আচমকা সুড়ঙ্গের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢোকার কারণে নয়, ভয় পেয়েছে সে। ভীষণ ভয়। ইনডিয়ানরা যেখানে ঢুকছে সাহস পায়নি, সেখানে নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু। হয়তো সামনে রয়েছে নিশ্চিত মৃত্যু।

কাউকে কিছু বলল না সে। চুপ করে কান পেতে শুনছে। দ্রুত পেছনে পড়ছে পানির গর্জন, সুড়ঙ্গমুখের পর থেকে আর শব্দ করছে না পানি, নিঃশব্দে বয়ে চলেছে ঢাল বেয়ে। সামান্যতম কুলকুল শব্দও নেই। স্নায়ুর ওপর দশ মন ভারি চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যেন এই অদ্ভুত নীরবতা।

পাহাড়ের দুই দেয়ালের মাঝে মাত্র তিরিশ ফুট মত ফাঁক। খাড়া প্রায় দু-শো ফুট উঠে গেছে দেয়াল। ফিতের মত এক চিলতে নীল আকাশ চোখে পড়ে সেই ফাঁক দিয়ে। আকাশটা যেন অপরিচিত, অন্য কোন পৃথিবীর।

সোজা এগোলে এক কথা ছিল। অভিযাত্রীদের বিপদ বাড়ানোর জন্যেই যেন জায়গায় জায়গায় বাঁক নিয়েছে গিরিপথ, ছোট বড় মোড় নিয়েছে, হাল ধরে নৌকার নাক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মুসা। দেয়ালের সঙ্গে নাকের একটা বাড়ি লাগলেই শেষ।

বড় আরেকটা মোড় পেরোল নৌকা।

জোরে দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ হলো। চমকে উঠল ওরা। ঝট করে তাকাল ওপরে। বাতাস, না পানির শব্দ? না, বাতাস নয়। অনেক ওপরে পাহাড়ের মাথায় গজিয়েছে পাতলা ঝোপ, লতাপাতা। নিথর হয়ে আছে। দুলছে না। তারমানে বাতাসও নয়। ফাঁকের ওপর দিয়ে সারি বেঁধে উড়ে চলেছে একদল রক্তলাল আইবিস পাখি। শব্দটা হয়তো ওরাই করেছে।

রোদ-চকচকে সেই নীল আকাশের দিকে চেয়ে কিশোরের মনে হলো, জেলহাজতের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে মুক্ত দুনিয়া দেখছে। কয়েদীদের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল। এই জায়গাটা আসলেই যেন একটা জেলখানা। তাড়াতাড়ি দাঁড় ফেলল পানিতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যেতে চায়-এই পাথরের কারাগার থেকে। সামনে যা থাকে থাকুক, পরোয়া করে না, মরলে মরবে। এই মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে সেটা অন্তত ভাল।

গায়ে কাঁটা দিল তার। কাছেই বিষুবরেখা, গরম হওয়ার কথা, তা না হয়ে হয়েছে ঠাণ্ডা। হবেই, কারণ, দুই দেয়ালের মাঝের এই কালো ছায়ায় কোন কালেই রোদ ঢুকতে পারে না। তার কাছাকাছিই রয়েছে আরও তিনজন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ভীষণ একা সে, অসহায়। মিস্টার আমানের দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছেন। ঘুম, না বেঁহুশ? মুসা আর রবিনও নীরব। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

অসহ্য এই নীরবতা আর সইতে পারল না মুসা। দুধের বোতলের মুখ খুলে দুধ খাওয়াতে বসল নাকুকে। একহাতে হাল ধরে রেখে আরেক হাতে বোতলটা কাত করে ধরল বাচ্চাটার মুখের কাছে। চুকচুক করে বোতলের মুখ থেকে দুধ খেতে লাগল নাকু, ভেতরে ঢুকছে সামান্যই, বেশির ভাগ গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দুই কষ বেয়ে। খাটো বাঁকা শুঁড়টার জন্যে বোতল থেকে ঠিকমত খেতে পারছে না বেচারা। তার জিভের প্রতিটি শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে কয়েকগুণ জোরাল হয়ে, কানে বাড়ি মারছে, যেন অশরীরী কোন প্রেতের ব্যঙ্গ-ঝড়া হাসি।

পথ এখন সোজা। কাজেই হাল ধরে রাখতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না মুসার।

ভাবছে কিশোর, ভুল সিদ্ধান্ত নিল না তো? সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে জংলীদের সঙ্গে লড়াই করাটাই কি উচিত ছিল না? ওদের কাছে বন্দুক রয়েছে, নয়জন ইনডিয়ানকে শেষ করে দিতে পারত।

কিন্তু সত্যিই কি পারত? জংলীরাও বসে থাকত না, তীর ছুঁড়ত। ওই বিষমাখা তীর গায়ে গাঁথলে তাদের অবস্থাও হত মিস্টার আমানের মত। ওই তিনটে ক্যানূ আর নয়জন জংলীই শেষ নয়, গাঁয়ে আরও আছে। নয়জন মরলে শতজন এসে চড়াও হত। খেপে যেত ওরা তখন। যেভাবেই হোক, ধরতই অভিযাত্রীদের।

আবার শোনা গেল দীর্ঘশ্বাস। ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না।

ছোট একটা মোড় পেরোল ক্যানূ। কিশোর আশা করেছিল, ওপাশে চওড়া হবে দেয়াল। তা না হয়ে হলো আরও সরু। সামনে ধীরে ধীরে সরে আসছে, গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে যেন। ওপরে ঝোপঝাড় বেশ ঘন, বড় গাছের চারাও আছে অনেক। দেয়াল যতই কাছাকাছি হলো, গাছের গায়ে গাছ ঠেকে গিয়ে চাঁদোয়া তৈরি করে ফেলতে লাগল। এতক্ষণও যা-ও বা আকাশ দেখা যাচ্ছিল, এখন আর তা-ও দেখা গেল না, অন্ধকার।

দুধ খাওয়ানো অনেক আগেই বাদ দিয়েছে মুসা শক্ত হাতে হাল ধরেছে।

যতই এগোচ্ছে, ঘন হচ্ছে অন্ধকার। হাতের দাঁড়ই ভালমত দেখা যায় না।

কেন আসেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা যাচ্ছে এখন। অবাক হয়ে ভাবছে কিশোর, পাতালনদীর সঙ্গে এর তফাৎ কতখানি?

'আরি! কি ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি জানি গায়ে লাগল!'

ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে চারপাশে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস।

'বাদুড়-টাদুর হবে।'

একটা দুটো নয়, ডানার আওয়াজেই বোঝা যায়, শ-য়ে শ-য়ে। মাথা নিচু করে রাখল কিশোর, যাতে বাড়ি না লাগে। জানে যদিও, ইচ্ছে করে যদি বাড়ি না লাগায় বাদুড়েরা, লাগবে না। রাডারের মত যন্ত্র রয়েছে তাদের শরীরে, নিকষ অন্ধকারেও পথ চিনে নিতে পারে সেই যন্ত্রের সাহায্যে। কোথায় একটা খুদে পোকা লুকিয়ে রয়েছে, তা-ও বুঝতে পারে।

এই সময় কথাটা মনে পড়ল কিশোরের—ভ্যাম্পায়ার ব্যাটা নয়তো? বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল। শুনেছে, দক্ষিণ আমেরিকার এসব এলাকায় রক্তচোষা বাদুড়ের বাস। উষ্ণ-রক্তের প্রাণীদের দিকেই ওদের ঝোঁক।

মসৃণ কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেছে সুড়ঙ্গ। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে আরেকটা শব্দ, বেশ ভারি। দূর থেকে আসা গর্জনের মত।

পানির গর্জন, কোন সন্দেহ নেই। দূরে রয়েছে এখনও।

তবে কি পাতালনদীতে পড়তে হবে শেষ অবধি? বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ না করে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী নদী!

হঠাৎ মোড় নিল সুড়ঙ্গ। খ্যাঁচ করে দেয়ালে ঘষা লাগল নৌকার ধার। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরাতে গিয়ে কিশোরের হাত পড়ল নরম কিছুর ওপর। ফুরফুর করে উড়ে পালাল ওগুলো। ছোট আকারের বাদুড়।

ক্যানূটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে স্রোত।

দূরে আবছা আলো চোখে পড়ল। মাথার ওপর আর আশপাশে উড়ন্ত বাদুড়গুলোর আকৃতি বোঝা যাচ্ছে এখন। যতই এগোচ্ছে নৌকা, আলো বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে পানির গর্জন।

বেরোতে পারব মনে হচ্ছে, আশা হলো রবিনের। সামনে যা-ই থাক, পেছনের ওই মৃত্যুফাঁদ থেকে ভাল, ভাবল সে।

মাথার ওপরে ফাটল শুরু হয়েছে, চোখে পড়ছে আকাশ। ওদের মনে হলো, কতযুগ পরে যেন আবার দেখা পেল ওই নীল আকাশের।

আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড়। হুস করে হঠাৎ খোলা জায়গাটা বেরিয়ে এল নৌকা। চোখ ধাঁধিয়ে দিল তীব্র আলো। খোলা মুখে আদর করে চাপড় মারল যেন ভেজা

বিশুদ্ধ বাতাস। বড় বড় এলোমেলো ঢেউ একে অন্যের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ইলশেগুঁড়ির মত মিহি পানির কণা ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে গা।

সামনে মুখ বাড়াল মুসা। 'যাচ্ছি কোথায়?'

নদীটা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে সামনে। খেপা ঘোড়ার মত সেদিকে ছুটে চলেছে ক্যানূ। আর বড় জোর বারো-চোদ্দ গজ। তীরের দিকে নৌকা ঘোরানোর উপায় নেই।

'জলপ্রপাত!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। পানির গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল চিৎকার।

রবিন আর মুসাও অনুমান করতে পেরেছে। জোরে জোরে উল্টো দিকে দাঁড় বাইছে ওরা, নৌকাটাকে টেনে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

চট করে একবার বাবার দিকে তাকাল মুসা। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন, চেতনা নেই যেন।

শূন্যে উঠে গেল নৌকা। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল আবার পানিতে। মাত্র দশ গজ নিচে পড়ল। তাতে সময় আর কতটা লাগে? কিন্তু গোয়েন্দাদের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে শূন্যে ভেসে থাকার পর যেন পড়ল। তবে মালপত্র বোঝাই ভারি একটা ক্যানূর জন্যে ওইটুকু উচ্চতাও অনেক।

ওদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই যেন তলিয়ে যেতে যেতেও সোজা হয়ে গেল নৌকা। হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা, ঢিল দিল, এবং ভুলটা করল। পাশ থেকে সজোরে এসে ধাক্কা মারল বিশাল ঢেউ, চোখের পলকে কাত করে দিল নৌকা।

একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। পানিতে পড়েই মাথা তুলল মুসা। ভেসে যাচ্ছেন তার বাবা। পানির মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে তাঁর কাছে চলে এল মুসা, দুই বাহুর তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল। ডুবন্ত মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করতে হয় জানা আছে তার, স্কাউটিঙে ট্রেনিং আছে। সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

কিশোর আর রবিন নৌকার দুই ধার দু-দিক থেকে আঁকড়ে ধরেছে। বেশির ভাগ মালপত্রই বাঁধা রয়েছে নৌকার সঙ্গে, ভেসে গেল না। ঠেলাঠেলি করে সোজা করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কাত হয়েই থাকল ক্যানূ। সোজা করার চেষ্টা বাদ দিয়ে শেষে ওটাকে ঠেলে নিয়ে চলল ওরা।

নৌকা নিয়ে তীরে পৌঁছে দেখল, বালিতে চিত হয়ে আছে বাপ-বেটা, যেন দুটো লাশ। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে মুসার বুক। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছেন মিস্টার আমান, চোখ আধখোলা। ধাক্কার চোটে ঘুম ভেঙেছে, কিংবা হুঁশ ফিরেছে।

টেনে নৌকাটা শুকনোয় তুলল তিন কিশোর। জিনিসপত্র সব খুলে ছড়িয়ে দিল রোদে শুকাতে। তারপর নাকুর কথা মনে পড়ল ওদের।

যার জন্যে এত কাণ্ড, সে-ই গেল হারিয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল ছেলেদের।

কিন্তু মন খারাপ করেছে অযথাই। পাওয়া গেল ওকে। বড় একটা পাথরের চাঙড়ের ওপাশে খুদে একটা ডোবায় পড়ে আছে নাকু। ডুবছে-ভাসছে, নাক দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। আছে মহাআনন্দে। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনেই হবে না সে

ডাঙার জীব।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোটবড় নানারকম পাথর। ওসবের মাঝে পরিষ্কার পানিতে গোটা দুই ক্যানূর ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। নৌকা দুটোয় করে কারা এসেছিল—ইনডিয়ান নাকি শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারী, বেঁচে ফিরে গেছে, না মারা গেছে, জানা যাবে না কোনদিন।

নাকুকে নিয়ে ফিরে এল ওরা।

সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন মিস্টার আমান। 'থ্যাংক ইউ বয়েজ।'

নয়

মেহমান এল সে-রাতে। অভিযাত্রীরা আশা করেছিল জিভারোরা আসবে, কিন্তু এল অন্য অতিথি। নরমুণ্ড শিকারীদের চেয়ে এরা কম ভয়ঙ্কর নয়।

শুরুতেই এল সৈনিক পিঁপড়ের খুদে একটা দল। মার্চ করে এগোতে গিয়ে থমকে গেল, মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো মুসার দিকে। কোন কোনও মানুষের দেহে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে, কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে তার গন্ধ। মুসার গায়েও এই জিনিস বেশি।

মাটিতে আর শোয়া গেল না, বাধ্য হয়েই চরার কাছ থেকে ভেতরের দিকে সরে যেতে হলো সবাইকে। গাছে হ্যামক টাঙিয়ে শোয়ার জন্যে।

হ্যামকে শোয়ার পর বড় জোর ঘন্টাখানেক ঘুম, তারপরই আবার জেগে যেতে হলো। ডান পায়ের আঙুলের মাথায় খুব হালকা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল মুসা। তাতেই ঘুমটা ভাঙল তার। ছুঁয়ে দেখল আঠা আঠা লাগে।

টর্চ জ্বেলে দেখল, তুরপুন দিয়ে যেন নিখুঁতভাবে করা হয়েছে ছোট্ট একটা ছিদ্র। সেখানে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

'খাইছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে নাকি!'

দুঃস্বপ্নে মানুষখেকো জংলীরা তাড়া করছিল কিশোরকে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল সব। জেগে উঠে দেখল, ঘামে জবজবে শরীর। তাতে কোন দুঃখ নেই তার, জংলীদের কবল থেকে যে বেঁচেছে এতেই খুশি।

মুসার ক্ষতটা দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবিন, 'হুঁ, কাঁটা ফুটেছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর, 'কাঁটা কই এখানে?'

হ্যামক থেকে দুর্বল কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান, 'এই, শুনতে পাচ্ছ তোমরা?'

অসংখ্য, অগুনতি ডানার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের বাদুড়গুলোর কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। মুসার ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে থেকে শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আপনমনেই বলল, 'বাদুড় না তো!'

'তাতে কি?' রুমাল দিয়ে রক্ত মুছছে মুসা। 'বাদুড়ে কামড়ালে আর কি হয়?'

'তাতে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'সাধারণ বাদুড় যদি না হয়? যদি ভ্যাম্পায়ার হয়?'

এইবার ভয় পেল মুসা। শিউরে উঠল ভূতের ভয়ে। সাংঘাতিক রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার পিশাচ ড্রাকুলার গল্প সে পড়েছে। রুমালটা পুঁটুলি বানিয়ে শক্ত করে ঠেসে ধরল ক্ষতস্থানে। ককিয়ে উঠল, 'রক্ত বন্ধ হচ্ছে নাতো!'

'রবিন, আয়োডিনের বোতল বের করতে পারবে?' মুসার হাত থেকে রুমাল নিতে নিতে অনুরোধ করল কিশোর।

রুমাল দিয়ে ক্ষতের নিচে আঙুলটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল সে। ঘষে ঘষে আয়োডিন লাগাল।

আবার শুয়ে পড়ল সবাই।

দশ মিনিটও গেল না, চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আল্লাহ্‌রে, আজ শেষ করে ফেলবে আমাকে!'

কম্বল মুড়ি দিয়েই শুয়েছিল মুসা। ঘুমের মধ্যে সরে গেছে কম্বল। নিতম্বের কাছে খানিকটা জায়গার প্যান্ট ছেঁড়া। তুরপুন ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানেই।

রক্ত বন্ধ করে আবার আয়োডিন লাগিয়ে দিল সেখানে কিশোর।

ডবল ভাঁজ করে কম্বল মুড়ি দিল এবার মুসা।

তার সঙ্গে আর সুবিধে করতে না পেরে অন্যদের দিকে নজর দিল তুরপুনধারীরা।

থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেন মিস্টার আমান। একটাকেও ধরতে পারলেন না। সব পালাল।

ছোট একটা হাতে বোনা জাল বের করল কিশোর। 'জাল দিয়ে ধরব।'

'টোপ হচ্ছে কে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তুমি,' কিশোর হাসল।

'আমি বাপু এসবে নেই। পারলে তুমি হওগে,' তাড়াতাড়ি আবার কম্বলে মুখ ঢাকল সে।

নিজেই টোপ হলো কিশোর। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল রক্তচোষা বাদুড়ের কথা।

নানারকম কথা প্রচলিত আছে রহস্যময় এই প্রাণীটাকে নিয়ে। শোনা যায়, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভ্যাম্পায়ার। পাখার বাতাসে জাদু করে ঘুম পাড়ায় শিকারকে। তারপর রক্ত চুষে খেয়ে পালায়।

গল্পটা সত্য কিনা, যাচাই করে দেখার ইচ্ছে কিশোরের। প্রমাণ ছাড়া, যুক্তি ছাড়া কোন কথা মানতে রাজি নয় সে। হাত লম্বা করে ফেলে চুপচাপ পড়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না।

তারপর ডানা ঝাপটানোর খুব মৃদু শব্দ কানে এল। কাছে আসছে। হালকা কিছু বুকে এসে নামল বলে মনে হলো কিশোরের। জেগে থেকেই অনুভব করতে পারছে না ঠিকমত, ঘুমের মধ্যে হলে টেরই পেত না।

আর কোন রকম নড়াচড়া নেই।

এসেই যদি থাকে, কিছু করছে না কেন ওটা? নাকি সব তার কল্পনা? কিছুই নামেনি?

কব্জির সামান্য নিচে মৃদু বাতাস লাগল জোরে নিঃশ্বাস ফেলল যেন ওখানে কেউ। ডানার বাতাস? নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। মুখ ফিরিয়ে দেখতেও পারছে না, নড়লেই যদি উড়ে যায়।

কনুইয়ের দিকে সরে আসছে বাতাসটা। ফুঁ দেয়া হচ্ছে যেন ওখানটায়। বাতাসও হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। কনুইয়ের উল্টোদিকে সামান্য একটু জায়গায় ঝিমঝিম শুরু হয়েছে, অসাড় হয়ে আসছে। মনে মনে চমকে গেল কিশোর। ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। তবে যেটুকু জেনেছেন, তাজ্জব করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, শিকারের গায়ে এত সাবধানে ছিদ্র করে এই বাদুড়, যে শিকার সেটা টেরই পায় না। আসল ব্যাপারটা তা নয়। যেখানে ছিদ্র করে, তার চারপাশে আগেই লালা লাগিয়ে দেয় ওরা, ফলে সাময়িক ভাবে অবশ হয়ে যায় জায়গাটা। ছিদ্র করার ব্যথা টের পায় না তখন শিকার।

কিশোর কল্পনা করল, ছিদ্র হয়ে গেছে। রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু নড়ল না।

একটু পরেই বুঝতে পারল, কল্পনা নয়, সত্যি। যেটুকু জায়গা অবশ হয়েছে, রক্ত গড়িয়ে তার বাইরে চলে আসতেই টের পাওয়া গেল। তার মানে রক্ত খাওয়া শুরু করেছে বাদুড়টা।

প্রথমবারেই অনেক জ্ঞান হয়েছে, অনেক কিছু জেনেছে। আর বেশি জানার চেষ্টা করল না। রক্ত খেয়ে পেট ভরে গেলে উড়ে যাবে বাদুড়, তার আগেই ধরতে হবে।

মনের আর বাঁ হাতের সমস্ত জোর এক করে জালটা ঘুরিয়ে এনে ফেলল সে ডান হাতের ওপর। এমন ভাবে চেপে ধরল, যাতে কোন ফাঁক না থাকে, বেরিয়ে যেতে না পারে শিকার। খুব সাবধানে আস্তে করে ডান-হাতটা সরিয়ে আনল জালের তলা দিয়ে। তারপর জালের মুখের দড়ি টেনে ফাঁস আটকে বন্ধ করে দিল থলের মুখ বন্ধ করার মত করে।

টর্চ জ্বালল।

না, কল্পনা নয়, ঠিকই। হাতের ইঞ্চি দুয়েক জায়গা জুড়ে রক্ত। থাকুক, কিছু হবে না। পরে মুছে নিলেই চলবে। জালের ভেতরে কি আছে দেখল।

ছটফট করছে কুৎসিত চেহারার একটা প্রাণী।

'ধরেছি! ধরেছি!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

লাফ দিয়ে হ্যামক থেকে নেমে এল রবিন আর মুসা।

'আরে, এ যে দেখছি একেবারে সেই লোকটার চেহারা। ওই ব্যাটাই ভূত হয়ে এল না তো!' বলে উঠল মুসা।

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রাতে কুইটোতে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

ভুল বলেনি মুসা, লোকটার সঙ্গে এই জীবটার চেহারার অনেক মিল।

ভ্যাম্পায়ারকে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প, পিশাচকাহিনী লেখা হয়েছে। খুব জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলো। বাদুড়টাকে দেখে সে-সব মনে পড়ছে কিশোরের। সবচেয়ে সাড়া জাগানো ভ্যাম্পায়ারের গল্প ড্রাকুলা। জীবটার চেহারা দেখে মনে হয় না, গল্পগুলোতে বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিছু। অন্ধকারের জীব, যেন অন্ধকারে মিশিয়ে রাখার জন্যেই কালো রোমশ চামড়া দিয়েছে ওকে প্রকৃতি। লাল লাল চোখ, ছবিতে দেখা শয়তানের চোখের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভোঁতা নাক, খাড়া চোখা কান, চূড়ার কাছে কয়েকটা লম্বা রোম। নিচের চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে, কুৎসিত, ভীষণ কুৎসিত।

'এই, আনো তো দেখি,' ডাকলেন মিস্টার আমান। দেখেটেখে বললেন, 'হুঁ, শয়তান আর বুলডগের মাঝামাঝি চেহারা।'

হঠাৎ বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জীবটা। বেরিয়ে পড়ল লম্বা চোখা জিভ, টকটকে লাল, তাতে রক্ত লেগে রয়েছে। দাঁত মাত্র কয়েকটা, ছোট ছোট কিন্তু ধারাল। ওপরের পাটিতে দুই দিকে দুটো শ্বদন্ত—সরু, চোখা, একেবারে যেন ড্রাকুলা ছবিতে দেখা ড্রাকুলার দাঁত, যেগুলো দিয়ে মানুষের গলা ফুটো করে রক্ত খায় ভূতটা।

বাদুড়টার মুখে রক্তের পাশাপাশি চটচটে পিচ্ছিল এক ধরনের পদার্থ লেগে রয়েছে। নিশ্চয় তার দেহ-কারখানায় তৈরি কোন সাংঘাতিক ক্রিয়াশীল অবশকারী পদার্থ মিশে আছে ওই লালায়। যা লাগলে দেহ তো অবশ হয়ই, রক্তও বেরিয়ে জমাট বাঁধতে পারে না।

হাতের দিকে তাকাল আবার কিশোর। জমাট বাঁধছে না রক্ত। চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা এখনও বেরোচ্ছে।

খুব খারাপ এটা, বিশেষ করে ছোট ছোট প্রাণীর জন্যে। ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মরে না প্রাণীগুলো। বাদুড় রক্তও খায় খুব সামান্য, ওটুকু রক্ত শরীর থেকে গেলে কিছুই হওয়ার কথা নয়। মরে অন্য কারণে। রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, ক্ষত দিয়ে অনবরত বেরোতে থাকে বলে। রক্তক্ষরণে মারা যায় তার শিকার।

জোরে ডানা ঝাপটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বাদুড়টা। কিন্তু শক্ত জাল। একটা সুতোও ছিঁড়তে পারল না, পারবেও না।

ফলখেকো বিশাল বাদুড়ের তুলনায় এটা অনেক ছোট। ওগুলোর ডানা ছড়ালে

হয় তিন ফুট, এটা বারো ইঞ্চি হবে কিনা সন্দেহ। আর শরীরটা এতটুকুন, এই ইঞ্চি চারেক। শয়তানীর বেলায়ও এর সঙ্গে ফলখেকো বাদুড়ের কোন তুলনা হয় না।

'নিয়ে যেতে পারলে পুরো পাঁচ হাজার ডলার,' হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল কিশোর। 'যে কোন চিড়িয়াখানাই দেবে। কিন্তু বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই হবে মুশকিল।'

'হ্যাঁ, মুশকিলটা হবে খাওয়া নিয়ে,' বলল রবিন। 'খাওয়াবে কি?'

হেসে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

দুই হাত নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল মুসা, 'খবরদার, আমার দিকে চেয়ো না! আমি রক্ত দিতে পারব না।'

হেসে ফেলল সবাই।

'সে পরে দেখা যাবে।' জালটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর, 'ধরো এটা। রক্ত বন্ধ করি আগে। থামে তো না আর। রবিন, আয়োডিন...'

বোতল আনার জন্যে রওনা হয়ে গেল রবিন।

ভ্যাম্পায়ার তো ধরা পড়ল, সমস্যা হলো খাওয়াবে কি সেটা নিয়ে।

মিস্টার আমান পরামর্শ দিলেন, উষ্ণ রক্তের কোন প্রাণী শিকার করে আনার জন্যে।

সকালে নাস্তা সেরে শিকারে চলল তাই কিশোর আর মুসা। মিস্টার আমান দুর্বল, হ্যামকে শুয়ে রইলেন। ক্যাম্প পাহারায় রইল রবিন।

কিশোর শটগান নিয়েছে।

মুসা নিয়েছে তার বাবার পয়েন্ট টু-টু মসবার্গ রাইফেল। টেলিস্কোপ লাগানো। পনেরো গুলির ম্যাগাজিন। হাইস্পিড লং-রেঞ্জ রাইফেল বুলেট ভরা আছে তাতে। হালকা, কিন্তু বেশ শক্তিশালী অস্ত্র। এটা দিয়ে কলোরাডোতে পুমার মত জানোয়ার মেরেছেন মিস্টার আমান।

পুমা যখন মরেছে, মুসার আশা টিগ্রেও মরবে।

আধ ঘন্টা ঘোরাঘুরির পর পছন্দসই একটা জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল। কিশোর জানাল, ওটা ইঁদুর-গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় প্রাণী ক্যাপিবারা। বড়গুলো আকারে ভেড়ার সমান হয়। তবে এটা অনেক ছোট, বোধহয় বাচ্চা।

একটা ঝোপে লুকিয়ে নিশানা করল মুসা। টিপে দিল ট্রিগার।

বাজ পড়ল যেন। রাইফেলের আওয়াজ সামান্যই, এত জোরে হয় না। তাহলে কে করল ওই শব্দ? মুসার ধারণা হলো ক্যাপিবারাটাই গর্জন করেছে। লুটিয়ে পড়ল ওটা।

দু-জনকেই চমকে দিয়ে ঝড় উঠল যেন ক্যাপিবারার পেছনের একটা ঝোপে। লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা হলদে জানোয়ার, গায়ে কালো কালো গোল ছাপ। টিগ্রে! ওটাই গর্জন করেছে। ঝোপের আড়ালে থেকে নিশানা করছিল ক্যাপিবারাটাকে। গোলমাল হয়ে গেছে দেখে গর্জন করে বেরিয়ে এক লাফে গিয়ে

ঢুকল আরেকটা ঝোপে।

আরিব্বাবা, কতবড় দানব! ক্ষিপ্রতা কি! শক্তিও নিশ্চয় তেমনি। পয়েন্ট টু-টু দিয়ে টিগ্রে মারার চিন্তা বাদ দিল মুসা। ক্যাপিবারাটাকে মারার আগে যে জাগুয়ারটাকে দেখেনি, গুলি করে বিপদে পড়েনি সে জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। এই খেলনা দিয়ে ওই দানব ঠেকাতে পারত না।

টিগ্রে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না দুজনে। তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সাবধানে বেরোল। পা টিপে টিপে চলল শিকারের দিকে।

ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে ক্যাপিবারা। অনড়।

এদিক ওদিক চেয়ে জানোয়ারটাকে তুলল মুসা। শটগানে এল জি ভরে পাহারা দিচ্ছে কিশোর।

ক্যাপিবারা নিয়ে দু-জনে দিল ছুট। এক দৌড়ে চলে এল ক্যাম্পে।

তারের জাল, খুব সরু লোহার শিক, আর খাঁচা বানানোর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটা খাঁচা প্রায় বানিয়ে ফেলেছে রবিন।

মুসা আর কিশোরও হাত লাগাল।

খাঁচা তৈরি করে তার ভেতরে ভ্যাম্পায়ারকে রাখা হলো।

'এর একটা নাম রাখা দরকার,' প্রস্তাব দিল রবিন।

'ইবলিস,' বলে উঠল মুসা।

'শুনতে ভাল্লাগে না,' কিশোর বলল।

'তাহলে কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'রক্তচোষা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল। ইংরেজি ব্লাড সাকারের চেয়ে ভাল।'

ক্যাপিবারাটাকে ভরে দেয়া হলো রক্তচোষার খাঁচায়। ঘিরে এল তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে দেখছে।

নড়লও না রক্তচোষা। খাঁচার কোণে উল্টো হয়ে চুপচাপ ঝুলে রইল।

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। বড় বেশি আলো খাঁচার ভেতর। একটা কম্বল দিয়ে ওপরটা ঢেকে দিল সে। ছায়া তৈরি করল ভেতরে।

আগের মতই ঝুলে রইল রক্তচোষা। তারপর নড়তে শুরু করল। খাঁচার জালে নখ আটকে ঝুলে ঝুলে এগোল। খুব সতর্ক। ক্যাপিবারাটার ওপরে এসে ঝুলে রইল এক মুহূর্ত। তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল নখ। হালকা পালকের মত পড়ল ওটার ওপর। গুলির ক্ষতের কাছে রক্ত জমে আছে। আস্তে করে ওটার কাছে গিয়ে অনেকটা মাকড়সার মত ঝাপটে ধরল চামড়া, চেটে চেটে খেতে শুরু করল রক্ত।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। বেশির ভাগ লোকের ধারণা, ভ্যাম্পায়ার চুষে রক্ত খায়। কেউ কেউ অন্য কথা বলে, চেটে খায়। তাই তো করছে দেখা যাচ্ছে। কুৎসিত মুখ থেকে স্ফুলিঙ্গের মত ছিটকে বেরোচ্ছে যেন নীলচে-লাল জীবটা। ঢুকছে-বেরোচ্ছে, ঢুকছে-বেরোচ্ছে, সেকেণ্ডে চারবারের কম

না, অনুমান করল কিশোর। বেড়াল আর কুকুর যেমন করে তরল খাবার খায় তেমনি করে খাচ্ছে ওটা, তবে অনেক দ্রুত।

'ওর নাম রক্তচাটা হওয়া উচিত,' বলল সে।

অন্য দুজনের আপত্তি নেই।

মালপত্র গুছিয়ে আবার ক্যানূ ভাসাল ওরা।

সেদিন আরেকটা জীব ধরা পড়ল।

দুপুরে খাওয়ার জন্যে নৌকা থামিয়ে নেমেছিল ওরা।

মুসা দেখল জীবটাকে। মাথার ওপর গাছে বসে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। খুদে, লেজ বাদ দিলে ইঞ্চি তিনেক হবে। কয়েক আউন্স ওজন। নরম, সোনালি রোমে ঢাকা শরীর, চোখের চারপাশ আর মুখটা বাদে। সেখানটা সাদা, যেন চুরি করে টিন থেকে ময়দা খেতে গিয়ে ময়দা লাগিয়েছে।

ইশারায় কিশোর আর রবিনকে দেখাল সে। বাবাকেও দেখাল।

'পিগমি মারমোসেট,' ফিসফিসিয়ে বললেন মিস্টার আমান। 'ধরতে পারো কিনা দেখো। ভাল টাকা পাওয়া যাবে।'

বসেই আছে জীবটা। বাতাসে ডাল দুলছে, আঁকড়ে ধরে ওটাও দুলছে ধীরে ধীরে।

ব্যাগ খুলে ডার্টগান বের করল কিশোর। ডার্ট ভরল।

আগের জায়গাতেই রয়েছে মারমোসেট। অন্যান্য বানরের মতই কৌতূহলী, মানুষের কাজকর্ম দেখছে। তবে আর সব জাতভাইয়ের মত 'বানর' নয়, দুষ্টুমি নেই, লাফালাফি নেই, শান্ত-সুবোধ-লক্ষ্মী ছেলে।

'নাও, মারো,' ডার্টগানটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। গোয়েন্দা-সহকারীর নিশানার ওপর এখন অগাধ আস্থা তার।

'তুমিই মারো,' মুসা বলল।

অনেকক্ষণ লাগিয়ে ভালমত সই করল কিশোর। ট্রিগার টিপল। ভেবেছিল লাগবে না। কিন্তু লাগল।

পাখির মত কিচির মিচির করে উঠল বানরটা। সুচের মত জিনিসটা ধরে টানাটানি শুরু করল। মুখে বিরক্তি। যেন বলছে, আহ্, কি জ্বালাতন! মানুষের জ্বালায় একটু শান্তিতে বসার জো নেই।

ক্রিয়া শুরু করেছে ঘুমের ওষুধ। টলে উঠল বানরটা। মাথা উল্টে দিল, ডাল থেকে ছুটে গেল আঙুল, খসে পড়তে শুরু করল। পেছনে সোজা হয়ে রইল লেজটা।

এতই হালকা, প্রায় নিঃশব্দে ঘাসের ওপর পড়ল জীবটা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল মুসা।

ঘুম ভাঙতে বেশি সময় নিল না। চোখ মেলল মারমোসেট। চোখের ঘোলাটে তারা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো। লেজের সোনালি রোম ফুলে উঠল কাঠবেড়ালীর

লেজের মত। কিচমিচ শুরু করল। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে অদ্ভুত সাদা জিভ। গাল দিচ্ছে যেন ঃ *মানুষের বাচ্চা মানুষ, জীবনে আর বানর হবি না তোরা। একেবারে বখে গেছিস।*

হেসে আদর করে ওটার মাথায় হাত বোলাল কিশোর, 'কেমন লাগছে, ময়দাখেকো?'

ব্যস, নাম একটা হয়ে গেল মারসোসেটেরও।

'ওই খেকো-টেকো বাদ দাও,' প্রতিবাদ করল মুসা। 'খালি ময়দা।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, তাই সই।'

রবিন কিছু বলল না। জানে, বলে লাভ নেই। একবার মুসা বলে যখন ফেলেছে, আর পাল্টাবে না। নাম রাখার ব্যাপারে মুসার কিছু জেদ আছে। ভুল করে পুরুষ ভেবে একবার একটা কবুতরের নাম রেখে ফেলেছিল টম। যখন জানা গেল ওটা মেয়ে, তারপরও ওটার নাম টমই রইল, কিছুতেই পাল্টাতে রাজি হলো না সে।

'পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে বানর,' বিড়বিড় করল রবিন। 'হ্যাপেইল পিগমেইয়াস।'

'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা।

'ওটার ল্যাটিন নাম। বৈজ্ঞানিক...'

'চুলোয় যাক ল্যাটিন। বাংলা অনেক সোজা, ময়দা। ওই হ্যাপেল-ফ্যাপেল মুখে আসবে না আমার।'

আবার ভাসল ক্যানূ।

গুণ আর রূপ দিয়ে দেখতে দেখতে সবাইকে আপন করে নিল ময়দা। পাখির মত কিচমিচ করে বড় বড় লাফ মারে। একবার এর ওপর গিয়ে পড়ে, একবার ওর ওপর। কিন্তু এত হালকা সে, কারও কোন অসুবিধে হয় না।

ওর সবচেয়ে আনন্দ, কিকামুর সঙ্গে খেলা করা। ভিজে যাওয়ার পর নষ্ট হওয়ার ভয়ে বস্তা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে ওকে। নৌকায় একটা খুঁটি বেঁধে তাতে ওর চুল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লম্বা কালো চুলে ঝুলে ঝুলে যেন বাতাস খায় মহাবীর। তার চুল নাড়াচাড়া করতে খুব ভালবাসে বানরটা।

নাকুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে ময়দার। রক্তচাটাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। খানিক পর পরই লাফ দিয়ে গিয়ে তার খাঁচার ওপর উঠে কয়েকটা করে গাল দিয়ে আসে।

দুধের অভাবে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়েই যেন ঘাস খাওয়া শুরু করেছে নাকু। তার খাবার নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই কারও।

বিকেলের দিকে রোদ যেন আগুন হয়ে উঠল। আর নৌকায় থাকতে পারল না নাকু। লাফিয়ে পড়ল পানিতে। কেউ কিছু বলল না। নৌকায় বাঁধা রয়েছে তার গলার লম্বা দড়ি। ক্যানূর পাশে-পাশে সাঁতরে চলল।

গম্ভীর হয়ে ব্যাপারটা দেখল কিছুক্ষণ ময়দা। তারও গরম লাগছে কিনা যেন

বোঝার চেষ্টা করল। তারপর দিল লাফ। পানিতে পড়েই বুঝল, মহাভুল হয়ে গেছে। এই জায়গা তার জন্যে নয়। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে উঠল নাকুর নাকে, তারপর পিঠে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে এসে একেবারে মুসার কোলে।

গা ঝাড়া দিয়ে রোম থেকে পানি ঝাড়ল ময়দা। ঠাণ্ডা কমছে না দেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল মুসার শার্টের ভেতরে। গায়ে গা ঠেকিয়ে রইল, উষ্ণতা খুঁজছে।

'দুটো ছেলে পেলে,' নৌকার তলায় শুয়ে থেকে হাসিমুখে বললেন মিস্টার আমান।

'দুটো না, তিনটে,' শুধরে দিল রবিন। 'বাদুড়টা বাদ কেন?'

'দূর!' মুখ বাঁকাল মুসা, 'ওই ইবলিসের বাপ হতে যায় কে?'

হেসে ফেলল সবাই।

দশ

'আমাজন! আমাজন! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

অনেক বড় একটা মোড় ঘুরেই বিশাল জলরাশিতে ঝাঁপ দিল ক্যানূ। মোহনায় পৌঁছে গেছে। পাক খেয়ে খেয়ে বইছে বাদামী স্রোত। কোথাও ঢেউ উটের পিঠের মত কুঁজো, কোথাও ফুলে ফুলে উঠছে সিংহের কেশরের মত। দেখেই অনুমান করা যায় স্রোতের প্রচণ্ডতা।

ম্যাপে আঁকা 'রহস্যময় বিন্দু রেখা' ধরে পাঁচ দিন চলেছে ওরা। নতুন একটা ম্যাপ যখন তৈরি হবে, ওই বিন্দুগুলো আর থাকবে না, পুরোপুরি রেখা হয়ে যাবে। মাঝখানে কিছু সময় বাদে, ম্যাপ আঁকা চালিয়ে গেছে কিশোর। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাগজটা যত্ন করে একটা ওয়াটারপ্রুফ বোতলে ঢুকিয়ে সেটা আবার ঢুকিয়েছে ওষুধের বাক্সে।

আমাজন, পৃথিবীর বৃহত্তম নদী।

মিস্টার আমান উত্তেজিত, ছেলেরা উত্তেজিত। ক্যানূর অন্য আরোহীদের মাঝেও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে—নদী দেখে নয় হয়তো, নৌকা বড় বেশি দোল খাচ্ছে বলেই।

তাপিরের বাচ্চা গোঁ গোঁ করল, মারমোসেট কিচমিচ করল, এমন কি তন্দ্রালু ভ্যাম্পায়ারও কর্কশ চিৎকার করে উঠল খাঁচার অন্ধকার কোণ থেকে। একমাত্র কিকামু নির্বিকার। আধবোজা চোখ মেলল না। লম্বা চুলে ঝুলে থেকে ঢেউয়ের তালে তালে খালি মাথা দোলাচ্ছে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে।

'সত্যিই এটা আমাজন!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'হ্যাঁ-না দুটোই বলা যায়,' মুখ খুলল কিশোর। 'তবে হ্যাঁ বলাই ঠিক। আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ম্যাপ খুলে দেখো। দেখবে, এখান থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পুরোটার নামই আছে। যেমন এই অংশটার নাম ম্যারানন,

ম্যারানন নদী এসে মিশেছে বলে। পরের অংশটার নাম সলিমোজ। আসলে, সবটাই আমাজন।'

'তা, ভেলাটা বানাচ্ছি কখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

সরু প্যাসটাজায় ইনডিয়ান ক্যানূ উপযুক্ত জিনিস, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশাল পানিতে ওটা মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া ছোট্ট ক্যানূতে জানোয়ার রাখার অসুবিধে, জায়গাই নেই। দরকার, বড়সড় একটা ভেলা।

ভেলার নামও বাছাই করে ফেলেছে রবিন ঃ নূহ্ নবীর বজরা। আল্লাহ্র আদেশে মস্ত এক বজরা বানিয়ে নাকি তাতে সব রকমের প্রাণী তুলেছিলেন তিনি। ভেসে থেকেছিলেন ভয়াবহ বন্যায়।

আলাপ-আলোচনার পর নাম ঠিক হলো শুধু 'বজরা'।

'যত তাড়াতাড়ি পারো, বানিয়ে ফেলো,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিস্টার আমান। 'ক্যানূতে থাকা আর ঠিক না।'

মাইলখানেক দূরে নদীর অপর পাড় থেকে বয়ে আসছে বিশুদ্ধ হাওয়া। এক পাড় থেকে আরেক পাড়ের দূরত্ব এত বেশি, স্রোত না থাকলে নদীটাকে হ্রদ বলেই মনে হত। এপাড়ে গাছে গাছে যেন বুনোফুলের মেলা বসেছে। মাটির কাছাকাছি অগভীর পানিতে ডুবছে-ভাসছে অসংখ্য জলমুরগী। ক্যানূ ওগুলোর কাছাকাছি হলেই কঁক কঁক করে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে।

শটগানের দিকে হাত বাড়াল মুসা। কিন্তু বাধা দিলেন মিস্টার আমান। নৌকা দুলছে। নিশানা ঠিক হবে না।

গাছে ফুল যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পাখি। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা রকম আজব তাদের ডাক। জায়গাটা পাখির স্বর্গ। তীরে পানির ধারে এক আজব পাখি দেখা গেল। এক জাতের সারস, নাম তার জ্যাবিরু স্টর্ক। প্রায় মানুষের সমান লম্বা। তীর ধরে হাঁটছে গম্ভীর রাজকীয় চালে।

মোড় নিল ক্যানূ। মস্ত এক বাঁক পেরিয়ে এল। তেরছা ভাবে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল যেন ঢেউ, আরোহীদের ভিজিয়ে দিল। স্রোতও এলোমেলো। খানিক দূরে সরু একটা খাল ঢুকে গেছে ডাঙার ভেতরে। শেষ মাথায় ছোট একটা প্রাকৃতিক পুকুর। খালে নৌকা ঢুকিয়ে দিল মুসা। চলে এল পুকুরের নিথর পানিতে।

এক চিলতে বেলাভূমি রয়েছে পুকুরের পাড়ে। ঝকঝকে মসৃণ বালি। ঘ্যাঁচ করে তাতে নৌকার আধখানা তুলে দিয়ে লাফিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা। দানবীয় এক সিবা গাছের শেকড়ে বাঁধল দড়ি। এত বড় গাছ সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় এক একর জুড়ে রয়েছে। তলায় ছোট ঘাস ছাড়া আর কিছু জন্মানোর সাহস পায়নি। সুন্দর ছায়াঢাকা একটা পার্কের মত।

ক্যাম্প করার জন্যে তো বটেই, ভেলা বানানোর জন্যেও খুব চমৎকার জায়গা। মালমসলারও অভাব নেই। পুকুরের পাড়ে রয়েছে ঘন বাঁশবন, আছে লিয়ানা লতা।

ভেলা বানাতে দুই দিন লাগল। পাকা লম্বা বাঁশ কেটে শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা হলো। ওরকম কয়েকটা ভেলা নদীতে ভেসে যেতে দেখেছে গত দু-দিনে। ইনডিয়ানদের জলযান। আমাজনে এই ধরনের ভেলা বেশ চালু জিনিস।

'সব ভেলায়ই তো ঘর দেখলাম,' মুসা বলল। 'আমরাও একটা বানিয়ে নিই।'

বাঁশ দিয়েই তৈরি হলো ঘরের খুঁটি, চালার কাঠামো। বেড়া হলো নল-খাগড়ায়, তালপাতার ছাউনি। বাঁশের ভেলায় ভাসমান এক মজার কুটির।

বেশ বড় করে বানিয়েছে ভেলা। বড় জানোয়ার কিছুই ধরা হয়নি, জায়গার অভাব আর পরিবহনের অসুবিধের জন্যে, এবার ধরবে।

প্রথমেই ধরা পড়ল এক মস্ত ইগুয়ানা, ছয় ফুট লম্বা।

নিচু গাছের ডালে শুয়েছিল ওটা। একটা পাখিকে নিশানা করতে গিয়ে চোখে পড়ল মুসার। মাত্র বারো-তেরো ফুট দূরে।

তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। সিনেমায় দেখা এক প্রাগৈতিহাসিক দানবের প্রতিমূর্তি যেন। সবুজ শরীর, লেজে বাদামী ডোরা পেঁচিয়ে রয়েছে। পিঠে কয়েক সারি কাঁটা, এদিক ওদিক মুখ করে আছে। থুতনির নিচেও এক গুচ্ছ কাঁটা।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল মুসা, তারপর ক্যাম্পের দিকে দিল দৌড়।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বললে বিশ্বাস করবে না,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'ডাইনোসর। গাছের ডালে।'

'ডাইনোসর? ঠিক দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'চলো তো, দেখি,' রবিন আর কিশোর দু-জনেই আগ্রহী হলো।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

আগের জায়গায়ই রয়েছে জীবটা। টেরই পায়নি যেন। বোধহয় গভীর ঘুমে অচেতন।

'ইগুয়ানা!' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব খাদে নামিয়ে বলল কিশোর। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

'কিন্তু ধরি কি করে?' রবিন বলল।

'চলো, বাবাকে জিজ্ঞেস করি,' মুসা বলল।

'গলায় ফাঁস আটকাতে হবে,' শুনে বললেন মিস্টার আমান।

'ফাঁস? কাছে যেতে দেবে?' গাল চুলকালো মুসা।

'তা হয়তো দেবে, তবে ফাঁস পরাতে দেবে না সহজে।'

'তাহলে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কাছে গিয়ে গান গাইতে হবে। আর পিঠ চুলকাতে হবে,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার আমান।

'মারছে!' আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল মুসা। বিষের ক্রিয়া নয় তো?

গোলমাল দেখা দিয়েছে মাথায়? 'গানের কি বুঝবে ওটা?'

'কি বুঝবে জানি না, তবে ইনডিয়ানরা ওভাবেই ধরে,' বললেন মিস্টার আমান।

'ঠিক,' মনে পড়ল রবিনের। 'আমিও শুনেছি…মানে, বইতে পড়েছি। 'সুরের ওপর নাকি বিশেষ মোহ আছে ইগুয়ানার, গায়ে হাত বোলানো পছন্দ করে।'

'হাত নয়, লাঠি,' বললেন মিস্টার আমান। 'লম্বা দেখে একটা লাঠি নিয়ে যাও। খুব আস্তে আস্তে বাড়ি দেবে…আমারই যেতে ইচ্ছে করছে…'

'না না, তুমি শুয়ে থাকো,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মুসা।

ভাল অভিনেতা কিশোর, কিন্তু গলা সাধায় একেবারে আনাড়ি। তবু তাকেই গান গাইতে হলো। দড়ির ফাঁস নিয়েছে মুসা, রবিনের হাতে লাঠি।

হেঁড়ে গলায় গান ধরল গোয়েন্দাপ্রধান। মানুষ, জানোয়ার কোন কিছুকেই আকৃষ্ট করার কথা নয় সে গান, তবু দেখা যাক ইগুয়ানার বেলায় কি ঘটে।

দূরে দাঁড়িয়ে জীবটার খসখসে চামড়ায় আলতো খোঁচা দিল রবিন। খুব আস্তে বাড়ি মারল কয়েকবার।

ফাঁস হাতে দাঁড়িয়ে আছে মুসা, উত্তেজনায় কাঁপছে।

নড়ল ইগুয়ানা। চোখ মেলল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল অভিযাত্রীদের দিকে। প্রতিটি নড়াচড়ায় কুঁড়েমির লক্ষণ। হাঁ করে হাই তুলল। নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে চোয়াল। আঁতকে উঠল মুসা। সারি সারি ধারাল দাঁত।

গান থেমে গেল কিশোরের।

'শক্ত কামড় দেয়,' হুঁশিয়ার করল রবিন। 'তবে খারাপ ব্যবহার না করলে কিছু বলবে না। কিশোর, থামলে কেন? গাও।' বাড়ি মারা থামাল না সে। 'মুসা, তাড়াহুড়ো করো না। ঘাবড়ে দিও না ওকে। লেজ খসে গেলে কোন চিড়িয়াখানাই নেবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'লেজ খসে যাবে?'

'হ্যাঁ, টিকটিকির মত।…ওভাবে না, ওভাবে ফাঁস পরাতে পারবে না।'

'একটা লাঠিতে বেঁধে নাও। তারপর আস্তে করে গলিয়ে দাও ওর মুখের ওপর দিয়ে।…ওকি কিশোর, গান থামাও কেন? গাও গাও।'

'মুখ ব্যথা হয়ে গেল যে।'

'চলে যাবে তো। গাও।'

লাঠি জোগাড় করে আনল মুসা। গান আর লাঠির বাড়ি সমানে চলছে। লাঠির মাথায় ফাঁসটা ঝুলিয়ে আস্তে সামনে বাড়িয়ে দিল সে। ইগুয়ানা নড়লেই থেমে যাচ্ছে তার হাত, ওটা স্থির হলেই আবার ধীরে ধীরে সামনে বাড়াচ্ছে।

ফাঁস গলার কাছাকাছি নিয়ে সাবধানে টেনে আটকে দিল মুসা। লাঠি ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিয়েছি আটকে! আর পালাতে পারবে না।'

'চুপ!' বলল কিশোর। 'টানাটানি কোরো না! লেজ খসাবে!'

দু-জনে মিলে খুব নরম হাতে দড়ি ধরে টান দিল।

গ্যাঁট হয়ে রইল ইগুয়ানা। দড়িতে টান বাড়ছে। মাথা ঘোরাতে শুরু করল সে। এত কুঁড়ে, নড়তেই চাইছে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাছ বেয়ে নেমে এল মাটিতে। পেছনে লেজের খানিক ওপরে বাড়ি মেরেই চলেছে রবিন।

চাপাচাপি করল না ওরা, কিন্তু দড়িতে ঢিলও দিল না। টেনেটুনে ক্যাম্পের কাছে নিয়ে এল ইগুয়ানাটাকে।

ভেলায় তুলতে হবে।

কাজটা অনেকখানি সহজ করে দিল ইগুয়ানা। মুসা ভেলায় উঠে টানছে। অনেক সহ্য করেছে এতক্ষণ ইগুয়ানা, আর করল না। পায়ে কামড় বসাতে ছুটে গেল। লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। ততক্ষণে শরীরের বেশির ভাগটাই ভেলায় উঠে গেছে জীবটার। বাকিটুকু তুলতে বিশেষ কষ্ট হলো না ছেলেদের।

ভেলা থেকে মাটিতে নেমে বসে পড়ল মুসা। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে। 'ধরলাম তো। খাওয়াব কি?'

'সবই খায় ব্যাটা,' কিশোর বলল, 'নরম পাতা, ফল, পাখি, ছোট জানোয়ার, সব।'

তারমানে ইগুয়ানার খাবারের জন্যে ভাবতে হবে না।

সেদিনই আরেকটা প্রাণী ধরা পড়ল। ইগুয়ানার মতই ছয় ফুট লম্বা, তবে লেজ থেকে মুখ নয়, পায়ের আঙুল থেকে চাঁদি পর্যন্ত। বড়শি দিয়ে অনেকগুলো মাছ ধরে জমিয়েছে মুসা, সেগুলোর গন্ধেই পায়ে পায়ে এসে হাজির হয়েছে। জ্যাবিরু স্টর্ক, মুসার ভাষায় লম্বু 'বগা,' অর্থাৎ বক।

পাখিটাকে এগোতে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। মাছগুলো যেখানে আছে রেখে উঠে চলে এল।

লম্বা লম্বা পায়ে যেন রনপা-য় ভর করে এগিয়ে এল বিরাট পাখিটা। মাথা কাত করে গম্ভীর চোখে তাকাল মাছের ঝুড়ির দিকে। জ্যাবিরুর চেহারায় একটা ঋষি ঋষি ভাব আছে, প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে—যদিও এই ধ্যানের বেশির ভাগটাই মাঝের ভাবনায়—তাই একে দার্শনিক পাখি বলে অনেকে।

না, কিছু না, মাছ কেমন পড়েছে দেখছি শুধু—এরকম চেহারা করে মাছগুলো দেখল পাখিটা। নদী থেকে ধরার চেয়ে এখান থেকে খেয়ে ফেলা যে অনেক সহজ, বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগল না।

সত্যিই একটা রাজকীয় পাখি, ভাবল মুসা। দুধের মত সাদা পালকে ঢাকা শরীর। মাথাটা কুচকুচে কালো। লম্বা গলায় লাল রঙের আঙটি। পাখা সামান্য তুলে রেখেছে, লড়াইয়ের আগে কুস্তিগীররা যেমন বাহু তুলে রাখে অনেকটা তেমনি। মুসা আন্দাজ করল, ওটার এক ডানার মাথা থেকে আরেক ডানার মাথা সাত ফুটের কম হবে না। মানসচক্ষে দেখতে পেল, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সারসটা লস অ্যাঞ্জেলেস চিড়িয়াখানায় হেঁটে বেড়াচ্ছে রাজকীয় চালে, আর তাকে দেখার জন্যে

ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য দর্শক।

হঠাৎ পেছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রনপা পা। ঝুড়িতে ঠোকর মেরে বসল সারসরাজ। দেখে যতখানি চালাক মনে হয় পাখিটাকে, আসলে তা নয়। বোকাই বলা যায়। নইলে দেখা নেই. শোনা নেই, ফেলে রাখা খাবারে এভাবে ঠোকর মারে কেউ? কত রকম বিপদের ভয় আছে।

দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল মাছের ঝুড়ি। মুসার ইচ্ছে ছিল, ফাঁস ছুঁড়ে ধরবে। কিন্তু সে এগোনোর আগেই মাছ খতম। খাওয়া শেষ, আর এখানে থাকার কোন কারণ নেই। ডানা মেলে উড়ে গেল জীবন্ত এরোপ্লেন।

আফসোস করল না মুসা। পাখিটার স্বভাব-চরিত্র দেখে তার যা মনে হয়েছে, অত্যন্ত লোভী, আবার আসবে। এত 'সহজ খাবারের' আশা সহজে ছাড়তে পারবে না।

আরও কিছু মাছ ধরে ঝুড়ি ভরল মুসা। ফেলে রাখল ওখানেই। ফাঁস ছুঁড়ে লম্বুকে ধরা যাবে না, বুঝে গেছে। জাল পাতল। ঝুড়ির চার পাশে আট ফুট উঁচু চারটে সরু খুঁটি পেতে তার ওপর বিছিয়ে রাখল জাল। একটা দড়ি বাঁধল জালে, এমন ভাবে, যাতে দূর থেকে ওই দড়ি টেনেই জালটা ফেলতে পারে। সিবা গাছটার অনেক শেকড় আর ঝুড়ি আছে। দড়িটা নিয়ে গেল ওগুলোর কাছে। আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

এই আসে এই আসে করতে করতে দিনই ফুরিয়ে গেল। পাটে বসল টকটকে লাল সূর্য। 'বগাটার' আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মুসা, এই সময় আকাশে দেখা দিল ছড়ানো ডানা। শাঁ করে উড়ে এসে ঝুড়ির বিশ ফুট দূরে নামল লম্বুমান।

আরি! ঝুপড়ি এল কোত্থেকে!—ভাবল যেন সারসটা। আগে তো এটা ছিল না ওখানে? ভাবনা দরকার। আচ্ছা, দেখি ধ্যানে বসে। আশ্চর্য কৌশলে এক পায়ের ওপর ভারি শরীরের ভর রেখে, লম্বা ঠোঁটের আগা বুকের ফোলানো পালকে গুঁজে ধ্যানমগ্ন হলো সে।

কিন্তু সামনে লোভনীয় খাবার থাকলে ধ্যান আর কতক্ষণ? যখন দেখল, ঝুড়িও নড়ে না, ঝুপড়িটাও না, চুলোয় যাক ধ্যান বলে যেন ঠোঁট সোজা করল সে। পলকে বেরিয়ে এল আরেক পা। রনপা-য় ভর দিয়ে এগোল।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল ঝুপড়ির কাছে এসে, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। খ্যাচাং করে মাছের ঝুড়িতে ঢুকে গেল চোখা ঠোঁট।

মুসাও মারল দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান। ঝুপ করে জালের চারদিক খুলে ছড়িয়ে পড়ল নিচে। উড়তে গেল সারস, এবং দ্বিতীয় ভুলটা করল। জড়িয়ে পড়ল জালে।

আঙুল, ডানার মাথা, ঠোঁট, ঢুকে গেল জালের খোপে। ছুটাতে গিয়ে আরও জড়াল। ছেঁড়া বালিশের তুলোর মত বাতাসে উড়তে থাকল সাদা পালক।

থামল না পাখিটা। যেভাবে ঝাপটা-ঝাপটি করছে, জাল ছিঁড়তে দেরি হবে না।

কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে।

দূরে বসে দেখছেন মিস্টার আমান। বললেন, 'জলদি পা বাঁধো।'

ছুটে গিয়ে দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এল মুসা।

কিশোর আর রবিন এগোল তাকে সাহায্য করতে।

প্রথমেই পেটে সারসের জঘন্য লাথি খেল রবিন। বাঁশ দিয়ে তার পেটে খোঁচা মারা হলো যেন। আউফ্ করে পেট চেপে ধরল।

লাথি খেয়ে তার জেদ গেল বেড়ে। যে পায়ে লাথি মেরেছে, সারসের সেই পাটা দু-হাতে চেপে ধরল।

দড়ির এক মাথায় গিঁট দিয়ে ফাঁস বানিয়ে ফেলেছে কিশোর। সেটা সারসের পায়ে পরিয়ে টেনে আটকে দিল মুসা।

জাল ছিঁড়ছে। ঝাড়া দিয়ে রবিনের হাত থেকে পা ছুটিয়ে নিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠল সারস।

সড়াৎ করে মুসার হাত থেকে অনেকখানি দড়ি চলে গেল। জ্বালা করে উঠল হাত, চামড়া ছিলে গেছে। কিন্তু দড়ি ছাড়ল না।

রবিনও দড়ি চেপে ধরল।

ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো ওদের, সিন্দবাদ নাবিকের রুক পাখির মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে লম্বু বগা। আঙুল ঢিল করে দড়ি ছাড়তে লাগল।

শাঁই শাঁই করে উড়ে গেল সারস। পঞ্চাশ ফুট উঠে শেষ হয়ে গেল দড়ি, ঝটকা দিয়ে টানটান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দড়ির অন্য মাথাটা নিয়ে গিয়ে ভেলার একটা খুঁটিতে বেঁধে ফেলেছে কিশোর। উঁচুতে আর উঠতে না পেরে চক্কর দিয়ে উড়তে লাগল পাখিটা। ভয় আর বিস্ময় ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছে না যেন তাকে।

কিন্তু খানিক পরেই ভয়-ডর সব চলে গেল। অবাক হয়ে যেন ভাবল সারস, 'আমি না জ্যাবিরু? এত ভয় পাওয়া কি আমার সাজে?' দ্রুত নামতে শুরু করল সে। ভেলা আলো করে জুড়ে বসল। গম্ভীর ভঙ্গিতে একবার এদিক একবার ওদিক তাকিয়ে আশপাশের সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করল। যেন বলল, 'ভয় আমি পাইনি, তোমাদেরকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। যাকগে, অনেক হয়েছে। এবার খানিক ধ্যানমগ্ন হই। খবরদার, আমাকে বিরক্ত করবে না।'

বেশবাস ঠিক করল সে। ঝাড়া দিয়ে আলগা পালক ঝড়িয়ে ফেলল, ঠোঁট দিয়ে ডলে সমান করল এলোমেলো হয়ে থাকা পালক। একটা পা গুটিয়ে লুকিয়ে ফেলল ডানার তলায়। তারপর আরেক পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে ঠোঁট গুঁজল বুকের পালকে। ধ্যানমগ্ন হলেন দার্শনিক।

পরদিন সকালে আমাজনে 'বজরা' ভাসাল অভিযাত্রীরা।

কিশোর সাজল ক্যাপ্টেন, মুসা ফার্স্ট মেট, আর রবিন স্টুয়ার্ড। মিস্টার আমানের দুর্বলতা কাটছে না চিন্তিত হয়ে পড়েছে ছেলেরা। বিষের ক্রিয়া কাটেনি যে এটা পরিষ্কার। তাঁকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না ওরা।

সাগরে চলেছে স্রোত, ভেলাও চলেছে সেদিকে।

বিচিত্র সব যাত্রী : তাপিরছানা, ভ্যাম্পায়ার, পুঁচকে বানর মারমোসেট, দানব ইগুয়ানা, দার্শনিক জ্যাবিরু, চারজন হোমো স্যাপিয়েনস (মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম), আর মহাবীর কিকামুর মমি করা শুকনো মাথা।

নাকু এখন ঘাসই খায়, কচি পাতাও খায়। রক্তচাটা বেশ ঝামেলা করে, গরম রক্ত না হলে তার চলে না। ফলে দিনে অন্তত একবার তীরে নেমে ছোট জানোয়ার শিকার করতে হয় মুসাকে। জাতভাই অন্য বানরের মত শব্জি আর ফল ভালবাসে না ময়দা, পোকামাকড় আর ছোট গিরগিটি না পেলে মুখ ভার করে রাখে। ডাইনোসরকে (ইগুয়ানাটার নাম) নিয়ে ভাবনা নেই। পাতা, ফল মাংস সবই খায়। আর লম্বুর জন্যে তো রোজই ঈদ। মাছের অভাব নেই নদীতে। ভেলার কিনারে দাঁড়িয়ে নিজেও ধরে, বড়শি ফেলে মুসাও ধরে দেয়।

দিনে চলে, রাতে ভেলা তীরে ভিড়িয়ে কোন গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তারপর ঘুমায় অভিযাত্রীরা। মাঝেসাঝে দু-একটা ভেলা দূর দিয়ে চলে যেতে দেখে। ইনডিয়ানদের ভেলা। নদীর পাড়ে কোন গ্রাম চোখে পড়ে না, খালি জঙ্গল। কোথা থেকে আসে ইনডিয়ানরা, কোথায় যায় ওরাই জানে। অভিযাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

মিস্টার আমানের অবস্থা আরও খারাপ হলো। উঠতেই পারেন না এখন।

এই সময় একদিন সকালে দেখা গেল শহর।

এগারো

খুদে শহর, কিন্তু দীর্ঘ দিন শুধু জঙ্গল দেখে দেখে ওটাকেই নিউইয়র্ক নগরী বলে মনে হলো ওদের। শহরটার নাম ইকিটোজ।

তাদের যাত্রাপথে এটাই শেষ শহর। সামনে একটানা গহীন অরণ্য, নদীর দুই তীরেই।

জেটিতে ভিড়ে একটা খুঁটিতে ভেলা বাঁধল ওরা। শতশত ছোটবড় নৌকা রয়েছে ঘাটে। প্রায় সবাই মাল নিয়ে এসেছে। খালাস করা হচ্ছে রবার, তামাক, তুলা, কাঠ, নানা রকমের বাদাম।

সীমান্ত শহর। বেশির ভাগই কলকারখানা। কাঠের মিল, জাহাজ আর নৌকা মেরামতের ডকইয়ার্ড, সুতার কল, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা আছে। আর আছে মদ চোলাইয়ের বিশাল কারখানা—আখের রস থেকে রাম তৈরি করে। কাস্টম্‌স আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে, একটা সিনেমা হলও আছে। বিকেলের দিকে শহর ঘুরতে গিয়ে ছেলেরা দেখল, তাতে চলছে অনেক পুরানো একটা ছবি। কয়েক বছর আগেই রকি বীচে দেখে ফেলেছে ওটা ওরা।

ভেলায় ফিরে দেখল, নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার আমান। ছেলেদের

সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন। বললেন, 'আমাদের বোধহয় বাড়িই ফিরে যেতে হবে।'

কেন যেতে হবে, বলতে হলো না, বুঝল ছেলেরা। হাসপাতাল ছাড়া ভাল হবেন না মিস্টার আমান।

মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবারে প্লেন ছাড়ে ইকিটোজ থেকে। কাল সকালেই একটা ছাড়বে। যেতে হলে কালই যাওয়া দরকার।

মাঝরাত পর্যন্ত গুজগুজ ফিসফাস করল ছেলেরা।

ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ছেলেদের ডেকে তুললেন মিস্টার আমান। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে টিকেট কাটতে যেতে বললেন।

খেতে খেতে মুসা বলল, 'বাবা, একটা টিকেট কাটলেই চলবে।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিস্টার আমান। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা। অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল কপালে।

বাবার জন্যে কষ্ট হলো মুসার। 'আমরা থেকে যাই। শেষ করেই যাই কাজটা।'

'না, পারবে না। তোমরা সবাই ছেলেমানুষ।'

'কেন পারব না, আংকেল?' কিশোর বলল, 'আমরা তো চালিয়ে এসেছি এযাবত। পারব না কেন? কয়েকজন লোক ভাড়া করে নেব শুধু।'

হাসলেন মিস্টার আমান। শুকনো ঠোঁটে দুর্বল দেখাল হাসিটা। 'কিন্তু সামনে গভীর জঙ্গল...'

'তাতে কি?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'যা পেরিয়ে এসেছি, তার চেয়ে বেশি বিপদ হবে? বাবা, ভেবে দেখো, তোমার জমানো টাকা প্রায় সব খরচ করেছ এই অভিযানের পেছনে। কাজ শেষ করে যেতে না পারলে ফকির হয়ে যাবে। অতগুলো টাকা জমাতে কত বছর সময় লাগবে আবার? শোধ করবে কিভাবে? যে কটা জানোয়ার ধরেছি, বিক্রি করে ধারই শোধ করতে পারবে না...'

'সবই বুঝি। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ...'

'ছেলে ছেলে করছ কেন? এতখানি যখন আসতে পেরেছি বাকিটাও যেতে পারব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা।

'কিন্তু কিশোরের চাচী আর তোমার মাকে কি বলব? রবিনের বাবা-মাকে হয়তো বোঝাতে পারব...'

'কি আর বলবে? মা বকবক করবে, তুমি চুপ করে থাকবে।'

হ্যাঁ,' হাসল কিশোর। 'আমরা ঠিকমত ফিরে গেলেই তো হলো। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মেরিচাচীর বকা আপাতত আপনাকে খেতে হবে না। চাচার ঘুম হারাম করে দেবে। দিকগে, আপনার কি? তাছাড়া এখনই আপনাকে পাচ্ছে কোথায় ওরা? আপনি তো থাকবেন হাসপাতালে।'

ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মিস্টার আমানের। হাসিটা অবিকল মুসার

মত। বাপ-ছেলে দু-জনেই একরকম করে হাসে। 'গভীর ষড়যন্ত্র! হাহ্ হা…কিন্তু দেখো ছেলেরা, আমাকে কথা দিতে হবে, জ্যান্ত ফিরে যাবে তোমরা। যদি তা না পারো, আমাকে খামোকা ফেরত পাঠিও না। হাসপাতাল থেকে হয়তো বেঁচে ফিরব, কিন্তু আমি শিওর, তারপর খুন করা হবে আমাকে।'

হাসল সবাই।

সেদিন সকালের প্লেনেই চলে গেলেন মিস্টার আমান।

বারো

চেয়েই রইল ছেলেরা। দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা।

ফিরে তাকাল ওরা পরস্পরের দিকে। বিষণ্ণ। বড় একা লাগছে। ভীষণ অরণ্যের বিরুদ্ধে ওরা তিন কিশোর। খানিক আগে মিস্টার আমানকে বলা বড় বড় কথাগুলো এখন অর্থহীন মনে হচ্ছে ওদের।

'কিছু হবে না,' বলল কিশোর, নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'মুণ্ডুশিকারীদের সামনে না পড়লেই হলো। কয়েকটা জন্তুজানোয়ার ধরা তো। পারব। আমাজনের অনেকখানি চেনা হয়ে গেছে আমাদের।'

ঘাটে ফিরে এল ওরা।

আগের জায়গায়ই বাঁধা রয়েছে ভেলাটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। কেন যেন মনে হচ্ছিল তার, জায়গামত পাবে না ওটা।

ওরা ভেলার দিকে যেতেই এগিয়ে এল একজন পুলিশ।

উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে আর হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শিখে ফেলেছে এতদিনে কিশোর। লোকটার কথার তুবড়ি থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পারল তা হলো, ওদের অনুপস্থিতিতে নৌকা করে কয়েকজন লোক এসে ভেলার দড়ি খুলতে শুরু করেছিল।

লোগুলোর হাবভাবে সন্দেহ হয়েছিল পুলিশ কনস্টেবলের, চ্যালেঞ্জ করেছিল। নৌকার একজন জবাব দিয়েছে, সে ভেলার 'একজন' মালিক। এখানে সুবিধে হচ্ছে না, নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চায়। সন্দেহ আরও বেড়েছে পুলিশম্যানের। তর্কাতর্কি করেছে। শেষে সাফ বলে দিয়েছে, অন্য মালিকরাও আসুক, তারপর ভেলার দড়ি খুলতে দেবে।

অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি লোকটা। পরে আসবে বলে নৌকা নিয়ে চলে গেছে।

লোকটার চেহারার বর্ণনা চাইল কিশোর।

কনস্টেবল যা বলল, তাতে বোঝা গেল, লোকটা বিশালদেহী, খারাপ চেহারা এবং 'নো জেন্টলম্যান'। ইংরেজির টানে স্প্যানিশ বলে।

কনস্টেবলের হাতে একটা ডলার গুঁজে দিল কিশোর। খুশিতে ময়লা দাঁত সব বেড়িয়ে পড়ল লোকটার।

মুসা আর রবিনকে ভেলা পাহারায় রেখে থানায় গেল কিশোর ডায়রি করাতে।

থানার লোকেরা হেসেই উড়িয়ে দিল।

'ভুল করেছে আরকি,' বলল চীফ। 'যাও তুমি, আবার কোন গোলমাল হলে এসে বলো।'

পরিষ্কার বুঝল কিশোর, আবার কিছু হলে তাদেরকেই সামলাতে হবে, পুলিশের সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। ইউ এস কনসালের সঙ্গে দেখা করল সে। খুলে বলল সব।

'শুধু চেহারার ওই বর্ণনা দিয়ে এখানে ধরা যাবে না কাউকে,' কনসাল বললেন। 'ওরকম চেহারার অনেক আছে। দেখো, তোমরা যদি খুঁজে বের করতে পারো। কিন্তু তাহলেও কিছু করার নেই। ওর বিরুদ্ধে কোন কিছু খাড়া করতে পারবে না, কোন প্রমাণ নেই তোমাদের হাতে। দড়ি খুলতে এসেছিল, কনস্টেবল মানা করায় চলে গেছে। জেলে যাওয়ার মত কিছুই করেনি সে। কোন অ্যাকশন না নিয়ে ঠিকই করেছে পুলিশ। ধরলেও আবার ছেড়ে দিতে হত। সেক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া হয়ে যেত তোমাদের ভিলেন।'

ঠিকই বলেছেন কনসাল। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আপনার পরামর্শ কি?'

'বলব? মিস্টার আমানের পথ ধরো। প্লেনে চড়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। বুঝতে পারছি, তোমাদের শত্রু আছে এখানে। জানোয়ারগুলোর অনেক দাম। চোর-ডাকাতের চোখ তো পড়বেই। এখানে ওদের অভাবও নেই। গলাকাটা ডাকাত অনেক আছে। ইকিটোজে যতক্ষণ আছ, আইনের সাহায্য পাবে, সে-ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু জঙ্গলে পুলিশ যাবে না। সেখানে একটাই আইন ঃ হয় মারো, নয় মরো। সেটা অভিজ্ঞ পুরুষমানুষের কাজ, তোমরা ছেলেমানুষ, টিকতে পারবে না।'

'ছেলেমানুষ' শুনতে শুনতে কান পচে গেছে কিশোরের। মনে মনে রেগে গেল। পেয়েছে কি বুড়োরা? বয়েস কম হতে পারে, কিন্তু যে কোন বড়মানুষের চেয়ে কম কি ওরা? আর শিখতে শিখতেই ছেলেরা বড় হয়, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞ হয়।

'অনেক ধন্যবাদ,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'কারও সাহায্য পাই আর না পাই, কাজ চালিয়ে যাব আমরা, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজতক পারেনি কেউ।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কনসাল। হাসি ফুটল ধীরে ধীরে। 'খুব জেদি ছেলে। ওরকম মনোবল থাকা ভাল। গুড লাক।'

কনসালের অফিস থেকে বেরোল কিশোর।

জেটিতে পৌঁছে দেখল ভেলায় টহল দিচ্ছে রবিন আর মুসা। দু-জনের হাতেই

রাইফেল। মুসার কোমরের ডান পাশে ঝোলানো খাপে ভরা পিস্তল, তার বাবার কোল্ট ·৪৫, বাঁ পাশে বিরাট ছুরি। রবিনের কোমরে শুধু ছুরি। 'ভেলার কাছে খালি এসে দেখো, দেখাব মজা!'—এমনি ভাবভঙ্গি।

আসলে ভয়ে কাতর হয়ে আছে দু-জনে। কিশোরকে দেখে হাঁপ ছাড়ল।

'কাজ হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না। যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

'সে-ভয়ই করছি। পারব?'

'দেখা যাক পারি কিনা। আগে থেকেই কেঁচো হয়ে গিয়ে লাভ নেই।'

যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগল ওরা।

নদীর উজানে ভেলা দিয়ে মোটামুটি কাজ চলেছে। কিন্তু ভাটিতে যেখানে স্রোত বেশি, ঝড়তুফানেরও ভয়, সেখানে এই জিনিস টিকবে না। ভাল, বড় নৌকা দরকার। জাগুয়ার কিংবা অ্যানাকোণ্ডার মত বড় ভারি জীব রাখতে হলে অনেক বেশি জায়গা প্রয়োজন। আর বড় নৌকা চালানোর জন্যে মাল্লাও লাগবে।

সেই পুলিশ কনস্টেবলকে আবার দেখা গেল জেটির কাছে। বোধহয় আবার ডিউটি পড়েছে এদিকে। মুসা আর রবিনকে ভেলায় রেখে তীরে উঠল কিশোর। পুলিশম্যানকে ভেলার দিকে নজর রাখতে বলে চলল ডকইয়ার্ডের অফিসে, নৌকা কিনতে।

ম্যানেজার লোক খুব ভাল। সহজেই বোঝানো গেল তাকে, কি জিনিস চায় কিশোর। একটা নৌকা দেখাল।

নৌকা বা জাহাজের ব্যাপারে বাস্তব ধারণা প্রায় নেই কিশোরের, শুধু বই পড়ে যা জেনেছে। তবু দেখেই বুঝল, এই জিনিসই তাদের দরকার।

নৌকাটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। খুবই মজবুত। এর স্থানীয় নাম ব্যাটালাও। সামনের গলুইয়ের কাছে কিছুটা বাদ দিয়ে পুরো নৌকার ওপরেই ছাত, ঘরের মত। একে বলে টলডো। বাংলাদেশী বজরার ছবি দেখেছে কিশোর, এই নৌকাটাও অনেকটা বজরার মতই। তাই এর নাম রাখল 'বড় বজরা'।

বেশ চওড়া বড় বজরা, পেটের কাছে প্রায় দশ ফুট। পেছনে হালের কাছে একটা উঁচু মঞ্চ। ওখানে দাঁড়িয়ে হাল ধরে মাঝি। আশপাশ তো বটেই, ছাতের ওপর দিয়ে সামনের দিকেও নজর রাখা যায় ওখানে থেকে। চারটে দাঁড়ের ব্যবস্থা রয়েছে, একসঙ্গে দাঁড় টানতে পারবে চারজন মাল্লা। বাড়তি পাটাতনমত রয়েছে নৌকার দুই ধারে। ওগুলো থাকাতে অল্প পানিতে লগি বেয়ে যাওয়া যাবে।

নৌকাটা কিনল কিশোর পঁচিশ ফুট লম্বা আরেকটা ছোট নৌকা কিনল, ওটার স্থানীয় নাম মনট্যারিয়া। সে নাম দিল 'ছোট বজরা'। বড় বজরার মত এর ওপরেও টলডো রয়েছে। হালকা বলে বড়টার চেয়ে জোরে ছুটতে পারে।

ডকইয়ার্ডের ম্যানেজারই মাল্লা জোগাড় করে দিল। ছয় জন। নৌকা বাইবে ওরা, জানোয়ার ধরায়ও সাহায্য করবে। পাঁচজন ইনডিয়ান, আর অন্য লোকটা

ক্যাবোক্লো—ইনডিয়ান ও পর্তুগীজের মিশ্র রক্ত; তার নাম জিবা।

ভেলার আর দরকার নেই, কিন্তু ক্যানূটা ফেলল না কিশোর। ওটাতে করেই এতদূর এসেছে। কাজের জিনিস। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। দুই বজরার সঙ্গে বেঁধে নিল ওটাও।

সামনে দীর্ঘ যাত্রা। তিন গোয়েন্দা উত্তেজিত। ভেলার পাশে বজরা বেঁধে ওগুলোতে মাল আর জানোয়ার তুলতে শুরু করল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে চায় কিশোর। পরদিন খুব ভোরে উঠে রওনা দেবে।

ঘাটে অনেক দর্শক জমেছে। জানোয়ার তোলা দেখছে ওরা, মাঝেসাঝে দু-একটা পরামর্শও দিচ্ছে। তাপিরের বাচ্চা, বানর আর বাদুড় তোলাটা কিছুই না। ঝামেলা করল ইগুয়ানা। নড়তে চায় না। ওটাকে বেশি চাপাচাপিও করা যায় না, লেজ খসে যায় যদি?

যা-ই হোক, তোলা গেল অবশেষে।

হাঁকডাকে জ্যাবিরু গেল ঘাবড়ে। উড়ে গেল ওটা। পায়ে বাঁধা পঞ্চাশ ফুট দড়িতে হ্যাঁচকা টান লাগতেই ওপরে উঠা থামিয়ে চক্কর দিয়ে উড়তে শুরু করল। দড়ি ধরে ধীরে ধীরে টেনে নামিয়ে আনা হলো ওটাকে।

কাজ প্রায় শেষ, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বিশালদেহী এক লোক। ভেলায় এসে উঠল।

দেখামাত্র চিনল ওকে কিশোর আর মুসা। অন্ধকার হয়ে গেছে। আরও ভালমত দেখার জন্যে লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। না, কোন ভুল নেই। সেই লোকটাই। চোখা কান। কুৎসিত নিষ্ঠুর চেহারা।

'হাল্লো,' বলল কিশোর। 'আপনাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়?'

'হ্যাঁ। কুইটোতে। গির্জা খুঁজছিলাম।'

'মোম নিশ্চয় জ্বেলেছেন?'

'মিছে কথা বলেছি। আসলে তোমাদের পিছুই নিয়েছিলাম।'

'আজ ভেলার দড়ি কে খুলতে এসেছিল? আপনি?'

'ভুল করেছিলাম। আমাদের ভেলা ভেবেছিলাম।'

'নিশ্চয়,' টিটকারির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'তা আপনার নামই তো জানা হলো না এখনও।'

হাসল লোকটা। 'নাম? নাম জেনে আর কি হবে? বন্ধু বলে ডাকতে পারো।' দাঁত বের করে হাসল আবার লোকটা। সরু চোখা দাঁত, ওপরের পাটিতে দুদিকের দুটো দাঁতের মাথা এত চোখা ও লম্বা, শ্বদন্ত বলেই ভুল হয়।

'হুঁ,' মাথা দোলাল আবার কিশোর। 'নাম একটা আমিই দিই আপনার। ভ্যাম্পায়ার। সংক্ষেপে ভ্যাম্প। তা কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'দেখো,' কণ্ঠস্বর বদলে গেল লোকটার, হাসি হাসি ভাবটা আর নেই,

'গোলমাল করতে চাই না। একটা চুক্তিতে আসা যাক।'

'কার তরফ থেকে? মার্শ গ্যাম্বল?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর। ওই লোকটাই লস অ্যাঞ্জেলেসে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ার ব্যবসায়ী।

চমকে উঠল ভ্যাম্প, চোখে বিস্ময়। 'কার কথা বলছ?'

'ভালমতই জানেন, কার কথা বলছি। আপনার মত আরেকটা ভ্যাম্প। নিজের মুরোদ নেই, জানোয়ার ধরার জন্যে লোক রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ঠকায় ওদেরকে, ফলে পছন্দসই জানোয়ার পায় না। এখন আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, অন্যের জিনিস ছিনিয়েও নেয়। ডাকাত পোষে সে জন্যে।'

জ্বলে উঠল ভ্যাম্পের চোখ। 'দেখো,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার, 'ছিনিয়ে নেব বলিনি আমি···'

'না, চুরি করতে এসেছিলেন আরকি দুপুরবেলা।'

'বেশি ফ্যাঁচফ্যাঁচ কোরো না, ছেলে। যা বলছি, শোনো। জানোয়ারগুলো বিক্রি করে দাও আমার কাছে।'

'কত দেবেন?'

'এক হাজার ডলার।'

মুচকি হাসল কিশোর। জবাব দিল না।

'দু-হাজার?'

'দশ হাজারেও না। বিশ হাজার দিতে যে কেউ রাজি হবে।'

'আর একটা আধলাও দেবো না। দুই, ব্যস।'

'পথ দেখতে পারেন তাহলে।'

'পস্তাবে, খোকা, এই বলে দিলাম। ভাল চাও তো দিয়ে দাও।'

শার্টের হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এল মুসা। আরেক পাশ থেকে রবিনও এগোল, হাতে শটগান।

'ব্যাটাকে পানিতে ফেলে দেব?' কিশোরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

ভ্যাম্পের লাল চোখ টকটকে হয়ে গেল। 'ইঁদুরের বাচ্চারা, দেখাব···' রাগে কথা ফুটছে না। 'দাঁড়া, দেখাব তোদের মজা! সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠল না, বাঁকাই···'

থাবা দিয়ে রবিনের হাত থেকে শটগানটা ছিনিয়ে নিল মুসা। 'নামো। নইলে খোঁড়া হয়ে যাবে জন্মের মত।'

দুপদাপ করে নেমে গেল ভ্যাম্প। জনতার ভিড় ঠেলে হারিয়ে গেল ওপাশে।

নিচুস্বরে রবিন বলল, 'আবার আসবে। সকালের আগেই।'

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর বলল। 'রাতেই আসবে। কিংবা আমাদের পিছু নেবে সকালে।'

'কি করব তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'উপায় একটাই?'

'কী?'

'এগিয়ে থাকো। ভিড় সরে গেলেই নৌকা ছাড়ব। রাতের মধ্যেই এগিয়ে থাকব অনেকখানি। ভ্যাম্প রওনা হতে হতে অর্ধেক দিনের পথ এগিয়ে যাব আমরা।'

'কিন্তু আমরা যখন জানোয়ার ধরব, ওই সময় আবার এগিয়ে আসবে,' রবিন বলল।

'হারিয়ে যাব আমরা। খুঁজে পাবে না,' বলল কিশোর।

'মানে?'

'নদীটা কয়েক মাইল চওড়া, মাঝে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ আছে। অসংখ্য খাল আছে ওগুলোর ভেতরে ভেতরে। কোন্‌টা দিয়ে আমরা ঢুকেছি, কোন দিকে গেছি, কি করে জানবে?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মেনে নিল রবিন।

জিবাকে ডেকে বলল কিশোর, এক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা দেবে। লোকজন যেন তৈরি রাখে।

'না না, সিনর,' প্রবল আপত্তি জানাল জিবা। 'সকালের আগে যাওয়া যাবে না।'

'আজ রাতে ঠিক দশটায় বজরা ছাড়ব,' সিদ্ধান্তে অটল রইল কিশোর।

'বিপদে পড়বে, সিনর। রাতে যাওয়া যাবে না।'

কিশোর বুঝল, অহমে লাগছে লোকটার। বয়স্ক, এদিককার নদী-বন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাকে কিনা আদেশ দিচ্ছে এক পুঁচকে ছেলে। মানবে কেন?

কিন্তু জিবাকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার, কে মনিব। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে টাকা গুণলো কিশোর। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও।'

'কি?'

'বিকেলে যে কাজ করেছ, তার টাকা। নিয়ে বিদেয় হও।'

হাঁ হয়ে গেল জিবা। বলে কি ছেলেটা? 'আমাকে ছাড়া যেতে পারবে না। এই নদীর কিচ্ছু চেনো না তুমি।'

'পারব পারব,' হাসল কিশোর। 'তোমাকে ছাড়া এতখানি যখন আসতে পেরেছি, যেতেও পারব।'

টাকা নিল না জিবা। গোমড়ামুখে বলল, 'রাত দশটায়ই রওনা দেব, সিনর।'

'ভেরি গুড।' টাকাটা আবার মানিব্যাগে রেখে দিল কিশোর।

জানোয়ার তোলা শেষ। দেখার আর কিছু নেই, একে একে চলে গেল সবাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল ঘাট।

নিঃশব্দে নোঙর তুলল তিনটে নৌকা। ভেসে পড়ল আমাজনের স্রোতে। পেছনে পড়ে থাকল ভেলাটা, শূন্য, রিক্ত।

'ভ্যাম্প মিয়া ভেলা চেয়েছিল,' হেসে বলল মুসা। 'নিয়ে যাক এখন।'

মঞ্চে হাল ধরে দাঁড়িয়েছে জিবা। দাঁড় বাইছে চারজন ইনডিয়ান। একজনকে

সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিল কিশোর। অধীনস্থদের বোঝানো দরকার, মনিবেরা কাজের লোক।

ছোট বজরায় গিয়ে দু-জন মাল্লার সঙ্গে দাঁড় টানায় যোগ দিল মুসা। রবিন গেল কফি বানাতে।

বড় বজরাটায় টলডোর ভেতরে রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে। খাঁচার ছাত থেকে চুপচাপ ঝুলে রয়েছে রক্তচাটা। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ময়দা, নৌকা জোরে দুললেই মৃদু কিচকিচ করে উঠছে। খানিক পর পরই এসে দরজার বাইরে নাক বের করছে নাকু, নৌকার দুলুনী ভাল লাগছে না তার। ভীতু ঘোড়ার বাচ্চার মত চিঁ চিঁ করে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার নিজের ঘাসপাতার বিছানায়। কুঁড়ের বাদশাহ ডাইনোসর একেবারে চুপ, পাটাতনে শুয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এক পায়ে ভর রেখে ঘরের কোণে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে লম্বু দার্শনিক, দুনিয়ার আর কোন খেয়ালই যেন নেই তার।

মাস্তুলে ঝুলছে চুলে বাঁধা কিকামু। তারার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে যেন আপনমনে।

আবছা অন্ধকার আকাশ থেকে যেন ঝুলে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের একটুকরো ক্ষয়া চাঁদ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ। ভূতুড়ে হলদে আলো ছড়াচ্ছে, আঁধার তো কাটছেই না, কেমন যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চাঁদের দিকে তাকাতে সাহস করছে না মুসা, গা ছমছম করে। কিশোর দাঁড় টানায় এত ব্যস্ত, তাকানোর সময়ই নেই।

পাশের বন থেকে ভেসে এল রক্ত-জমাট-করা ভয়ানক গর্জন। না, টিগ্রে নয়। শুনে মনে হয় মরণযুদ্ধে মেতেছে একপাল ভয়াল নেকড়ে, কিংবা ভীষণ সিংহ। কিন্তু কিশোর জানে, নেকড়েও নয়, সিংহও নয়, ওটা এক জাতের বানরের ডাক। নিশার ফুরফুরে বাতাসে মাতোয়ারা হয়ে দরাজ গলায় গান ধরেছে গুটি কয়েক হাওলার মাংকি। সাধারণ কুকুরের চেয়ে বড় নয়, অথচ গলায় এত জোর, তিন মাইল দূর থেকেও শোনা যায় চিৎকার।

মানুষের স্নায়ুর ওপর খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া করে ওই শব্দ। একজন নেচারালিস্ট-এর কথা মনে পড়ল কিশোরের। তিনি লিখেছেন ঃ

ডাকটা প্রথম যেদিন শুনলাম, মনে হলো, বনের ভেতরে মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে মেতেছে আমাজনের সমস্ত জাগুয়ার।

তাঁর বিশ্বাস, হিংস্রতার দিক দিয়ে বেবুনের পরেই হাওলার মাংকি। এমনিতে মানুষকে ভয় করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে ভয়ানক হয়ে ওঠে ওরা। চোয়ালে অসাধারণ জোর। একবার নাকি এক ভ্রমণকারীর শটগানের নল কামড় দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিয়েছিল একটা হাওলার।

হাওলারের গর্জন থামলে কানে আসে হাজারো, লাখো ব্যাঙের কোলাহল। এরই মাঝে খুব আবছা শোনা যায় নিঃসঙ্গ কুমিরের কান্নার মত ডাক, শিংওলা পেঁচার তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার, তাপিরের হ্রেষারব, পেকারির ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। আরও নানা

রকম অজানা জীবের বিচিত্র সব ডাকও শোনা যাচ্ছে।

সব কিছুকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কেশে উঠছে, কিংবা ধমক দিচ্ছে জাগুয়ার। ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে যাচ্ছে সবাই। খানিক পরে আবার শুরু করছে হট্টগোল।

বাতাসের বেগ বাড়ল। পাল তোলার নির্দেশ দিল কিশোর।

প্রতিবাদ জানাল জিবা। অন্ধকার নদীর বাঁকে বাঁকে ঘাপটি মেরে আছে বিপদ, কালো পাথরের চোখা চাঙর, বালির ডুবো-চরা, ভেসে যাওয়া কাঠের গুঁড়ি।

ওসব জানা আছে কিশোরের। ওগুলোতে লাগলে কি সর্বনাশ হবে, তা-ও বুঝতে পারছে। কিন্তু ভ্যাম্পের কাছ থেকে সরে যেতে হলে ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

ফুলে উঠল পাল। সেই সঙ্গে দাঁড় বাওয়া চলছে। তারওপর ভাটিয়াল স্রোত। তরতর করে ছুটে চলল নৌ-বহর।

দু-বার ঘষা লাগল বালির চরায়। আটকে যেতে যেতে কোনমতে পার হয়ে এল নৌকা। একবার ধাক্কা লাগল বিরাট এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। কিন্তু চোখের পলকে জীবন্ত হয়ে উঠল গুঁড়িটা, কান্নার মত ডাক দিয়ে পানিতে আলোড়ন তুলে ডুবে গেল।

ঘোলাটে জ্যোৎস্নার চেয়ে তারার আলোই যেন বেশি।

সাদার্ন ক্রসের গায়ে বুঝি শিশির জমেছে। ভেজা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা।

মাঝরাতের দিকে কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল বনের চিৎকার, ভোর রাতে শুরু হলো আবার। ঘড়ির দরকার হয় না। ওই শব্দ শুনলেই বুঝতে হবে, ভোরের আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি।

উঠতি সূর্যের সোনা-রোদে যেন জ্বলে উঠল বুনো ফুলের স্তবক। সবুজ বন সোনালি, নদীর ঘোলা পানিও সোনালি. তরল সোনা গুলে দেয়া হয়েছে যেন সব কিছুতে। পাখির কলরবে বনভূমি মুখর। ঝলমলে রঙিন ডানা মেলে উত্তরে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক স্পুনবিল।

রোদ চড়ল। গাছের মাথা থেকে নামতে নামতে গোড়ায় পৌছল। দুটো দ্বীপের মাঝের খাল দিয়ে চলল নৌবহর। দু-দিকেই ঘন বন। পাল নামিয়ে ফেলা হলো। দাঁড় বাওয়াও বন্ধ। স্রোতের টানে আপন গতিতে ভেসে চলল তিনটে নৌকা।

নাস্তা করতে বসল যাত্রীরা। মানুষের জন্যে কফি, ম্যানডিওকার তৈরি মোটা রুটি আর শুকনো গরুর মাংস। জানোয়ারগুলোরও খিদে পেয়েছে, একেকটার জন্যে একেক রকম খাবারের ব্যবস্থা হলো।

সারা রাত চলেছে, বিশ্রাম দরকার। থামার নির্দেশ দিল কিশোর।

মোড় নিয়ে একটা দ্বীপের ভেতর ঢুকে গেছে সরু একটা উপখাল। তার মধ্যেও ঢুকল নৌবহর। বড় বড় কতগুলো বাদাম গাছের নিচে নোঙর ফেলল।

তীরের কাছে ঘুমাচ্ছে বিশাল এক কুমির। এতই গভীর ঘুম, গেল না ওটা, কয়েক হাত সরে জায়গা করে দিল শুধু নৌকাগুলোকে। চোখ আর নাকের দু-দিক

ইলেকট্রিক বালবের মত ফোলা, ভেসে রয়েছে পানির ওপরে, বাকি শরীর পানির নিচে। লম্বা থুতনি বালিতে ঠেকানো।

পরিশ্রমে মাল্লারা সবাই ক্লান্ত, তিন গোয়েন্দারও শরীর ভেঙে আসছে। চোখে ঘুম।

পিঁপড়ে, জোঁক আর পোকামাকড়ের ভয়ে তীরে নামল না জিবা ও তিনজন ইনডিয়ান, ক্যানূর তলায় শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল।

অন্যেরা শু'লো খালপাড়ের নরম বালিতে। শোয়া মাত্রই ঘুম, কিন্তু মুসা জেগে রইল। কুমিরটাকে দেখে দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়েছে তার।

—o—
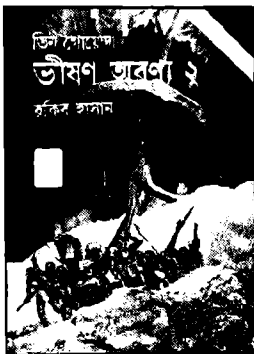
ভীষণ অরণ্য ২

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮

এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা।

লম্বা নাকে ফাঁস লাগিয়েই ধরা যায় কুমিরটাকে। এত বড় দানব সচরাচর চোখে পড়ে না।

কুমিরের চাহিদা কেমন, জানা নেই তার। আশা করল, অনেক দামে বিক্রি হবে। ধরতে পারলে নেবে কিভাবে, ভাবল না একবারও।

কুমিরের নাক অনেক লম্বা, অ্যালিগেটরের মত ভোঁতা নয়।

নিঃশব্দে ক্যানূর দড়ির এক মাথা গাছ থেকে খুলে নিয়ে ফাঁস বানাল মুসা। পা টিপে টিপে এগোল ঘুমন্ত সরীসৃপের দিকে।

আস্তে করে ফাঁস গলিয়ে দিল চোখা নাকটায়, তারপর হ্যাঁচকা টান। লাফিয়ে সরে গেল।

রাগে হিসিয়ে উঠল কুমির। মুসাকে ধরার জন্যে লাফ দিতেই দড়িতে লাগল টান। দ্বিধায় পড়ে গেল। লেজের ঝাপটায় পানি তোলপাড় করে ঘুরে গিয়ে পড়ল খালের মাঝখানে। টানটান হয়ে গেল ক্যানূতে বাঁধা দড়ি।

ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল আরোহীদের। চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

দড়ি ছাড়ানোর জন্যে একবার এদিকে ঘুরে টান মারছে কুমির, একবার ওদিক। ঝটকা দিয়ে বার বার ঘুরে যাচ্ছে ক্যানূর নাক। টালমাটাল অবস্থা।

কিছুতেই দড়ি ছাড়াতে না পেরে খালের মাঝখান দিয়ে সোজা ছুটতে শুরু করল কুমির। টেনে নিয়ে চলল ক্যানূটাকে।

খানিক দূর গিয়ে বোধহয় মনে করল, ক্যানূটাই তাকে তাড়া করছে, যত শয়তানী ওটারই। ঘুরে এসে তাই আক্রমণ করে বসল ওটাকে। বিশাল হাঁ করে কামড় লাগাল একপাশে। মড়মড় করে উঠল কাঠ। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে না নিলে আরেকটু হলে জিবার হাতটাই গিয়েছিল।

শক্ত কাঠে কামড় দিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আক্রমণের ধারা পাল্টাল কুমির। লেজের বাড়ি মারতে শুরু করল। থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যানূ।

দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা।

চেঁচামেচিতে অন্যদেরও ঘুম ভেঙেছে। লাফিয়ে গিয়ে মনট্যারিয়াতে উঠেছে সবাই। মুসাও উঠল। ক্যানূর দিকে ছুটল নৌকা।

কিছুতেই দড়ি খসাতে না পেরে আবার সোজা ছুটেছে কুমির। ধরা যাবে না

ওই দানবকে। দড়িটা কাটতে পারলে এখন বাঁচা যায়। ছুরি বের করল জিবা।

কিন্তু দড়ি কাটার আগেই ডুব দিল কুমির। পানি ওখানে গভীর। টানের চোটে ক্যানূর গলুই গেল ডুবে। খাড়া হয়ে গেল আরেক গলুই। ঝুপঝাপ করে পানিতে পড়ল মানুষেরা, হাত-পা ছুঁড়ছে অসহায় ভঙ্গিতে। আতঙ্কে চিৎকার করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পাশের বনের বানর আর পাখির দল।

সর্বনাশ! পানিতে খেপা কুমিরের সঙ্গে চারজন মানুষ। রাইফেল তুলল মুসা।

'না না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কার গায়ে লাগে ঠিক নেই।'

'কি করব তাহলে?'

'দড়ি কাটতে হবে। ছাড়া পেলে হয়তো পালাবে। আর কোন উপায় নেই।'

দ্রুত মনস্থির করে নিল মুসা। অঘটন সে ঘটিয়েছে, তাকেই করতে হবে যা করার। রাইফেল রেখে একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

পানিতে রক্ত। জিবা আর তার দুই সঙ্গীর মাথা দেখা যাচ্ছে পানির ওপরে, আরেকজন নেই। কুমিরে টেনে নিল?

দড়িতে ঢিল পড়েছে। কাত হয়ে ভেসে উঠল ক্যানূ। দড়িতে পোঁচ মারল মুসা।

হঠাৎ ক্যানূর খানিক দূরে পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল কুমির, ভারি কাঠের মত এক গড়ান দিয়ে আবার ডুবে গেল। তার কাছেই ভাসল তৃতীয় ইনডিয়ান লোকটার মাথা। হাতে শিকারের বিশাল ছুরি, তাতে পানি মেশানো হালকা রক্তের ধারা। তাকে কুমিরে ধরেনি, মরিয়া হয়ে সে-ই কুমিরকে ছুরি মারছে।

তাড়াহুড়ো করে ক্যানূ সোজা করে তাতে চড়ে বসল চারজনে। মুসাকে টেনে তোলা হলো মনট্যারিয়ায়। পানিতে নতুন বিপদ। রক্তের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।

ডুবে গিয়েছিল, আবার ভেসে উঠল কুমির। দাপাদাপি করছে, অস্থির, পাগল হয়ে গেছে যেন।

পিরানহা! আমাজন নদীর আতঙ্ক।

রক্তের গন্ধে হাঙর যেমন পাগল হয়ে ছুটে আসে, পিরানহাও তেমনি আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। বড় জোর ফুটখানেক লম্বা এই মাছ। মুখ বন্ধ রাখলে নিরীহ দেখায়। কিন্তু হাঁ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই সারি ক্ষুরধার দাঁত।

নদীর পানিতে এমন কোন প্রাণী নেই, যে পিরানহাকে ভয় পায় না, এমনকি কুমিরও এড়িয়ে চলে। ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে ওরা, শ-য়ে শ-য়ে, হাজারে হাজারে। মোটাতাজা একটা তাপিরকে শেষ করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না, পড়ে থাকে শুধু জানোয়ারটার ঝকঝকে সাদা কঙ্কাল।

কুমিরটার চারপাশে পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। রক্তে লাল।

ইনডিয়ানরা উত্তেজিত। নৌকা থেকে মাছ ধরার বল্লম নিয়ে ক্যানূ চালিয়ে চলে

গেল কাছাকাছি। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল গোটা বিশেক মাছ। ক্যানূর তলায় স্তূপ করে রাখল। ডাঙায়ও নিরাপদ নয়, ওগুলোর কাছ থেকে দূরে রইল ওরা।

খালের মাঝখানে ছোট এক চিলতে বালির চরা, শুকনো। গাছপালা নেই। তাতে মাছগুলো ছড়িয়ে ফেলল ইনডিয়ানরা, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মাথা আলাদা করল।

ভালমত দেখার জন্যে একটা হাঁ হয়ে থাকা মাথা তুলল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল চোয়াল, যেন স্প্রিং লাগানো রয়েছে। চমকে ওটা হাত থেকে ফেলে দিল সে।

রবিনের দিকে চেয়ে হাসল এক ইনডিয়ান যুবক। চমৎকার স্বাস্থ্য। সে-ই কুমিরটাকে ছুরি মেরেছিল। নাম মিরাটো। হাতের ছুরির আগা আরেকটা কাটা মাথার হাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়া দিল। এত জোরে বন্ধ হলো চোয়াল, ছুরিতে লেগে কয়েকটা দাঁতের মাথা গেল ভেঙে।

ছুরিটা দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে ছাড়াল মিরাটো। ফলার দুই পিঠেই গভীর দাগ বসে গেছে।

'নিউ ইয়র্ক অ্যাকোয়ারিয়ামে,' রবিনের মনে পড়ল, খবরের কাগজে পড়েছিল, 'একটা পিরানহা কামড় দিয়ে স্টেনলেস স্টীলের কাঁচিতে দাগ ফেলে দিয়েছিল। হাঙরের মতই স্বভাব, একে অন্যকে ধরে খেয়ে ফেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে এক চৌবাচ্চায় দুটো পিরানহা একসঙ্গে রাখে না। রাখলে সবলটা দুর্বলটাকে খেয়ে ফেলে।'

ইনডিয়ানরা যে মাছগুলোকে ধরেছে, কয়েকটার পিঠের মাংস নেই, খুবলে খেয়ে ফেলা হয়েছে। মিরোটো জানাল, বল্লমে গাঁথার পর ওগুলোকে তুলতে সামান্য দেরি হয়েছিল, ওইটুকু সময়েই কামড় বসিয়ে দিয়েছে অন্য পিরানহা। আরেকটু দেরি করলে বল্লমের মাথায় শুধু কঙ্কালটা উঠে আসত।

'ওই দেখো,' কঙ্কালের কথায় হাত তুলে দেখাল কিশোর।

ফুটন্ত পানি ঠাণ্ডা হয়েছে। চলে গেছে পিরানহার ঝাঁক। অল্প পানিতে পড়ে রয়েছে সাদা একটা কঙ্কাল, মিউজিয়মে দেখা প্রাগৈতিহাসিক দানবের কঙ্কাল বলে ভুল হয়।

'আমাদের গরু-ছাগলেরও ওই দশা করে,' মিরোটো বলল। 'রাতে রক্তচোষা বাদুড়ে রক্ত খেয়ে যায়, ক্ষতের চারপাশে রক্ত লেগে থাকে। সকালে যখন গোসল করতে নামে, ব্যস, হারামী মাছের ঝাঁক এসে হাজির।'

এরপর আর ঘুম হলো না কারও।

মুসা আর কিশোর গেল রক্তচাটার জন্যে একটা ক্যাপিবারা শিকার করার জন্য। গাছতলায় আরাম করে বসে রেফারেন্স বই পড়ায় মন দিল রবিন। ইনডিয়ানরা কেউ শুয়ে-বসে গল্প-গুজব চালাল, কেউ রান্নায় ব্যস্ত।

স্বভাব যত খারাপই হোক পিরানহার, মাংস খুব ভাল। রবিন, যে ইনডিয়ানদের খাবার পছন্দ করে না, সে-ও তারিফ করল।

'কুমির ধরতে পারলে না বটে,' হেসে বলল কিশোর, 'কিন্তু ভাল লাঞ্চ জোগাড় হলো।'

'তা হলো,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'কিন্তু আরেকটু হলে আমরাই লাঞ্চ হয়ে যাচ্ছিলাম।

দুই

খানিক পর পরই গিয়ে নদীর উজানের দিকে তাকায় কিশোর। ভ্যাম্পের দলবল আসছে কিনা দেখে।

ক্বচিৎ একআধটা ইনডিয়ান নৌকা দূর দিয়ে যেতে দেখল শুধু।

হয়তো এখনও আসেইনি ভ্যাম্প। কিংবা এলেও দ্বীপ আর গাছপালার ওধার দিয়ে চলে গেছে, অভিযাত্রীদের দেখেনি। চলে গেলেও যে আবার ফিরে আসবে না ভালমত দেখার জন্যে, সেটা বলা যায় না। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

রাইফেল-বন্দুক আছে অভিযাত্রীদের কাছে, তবে তারা তিনজনেই ছেলেমানুষ। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে শুধু তীর-ধনুক আর বল্লম, গোটা দুই ব্লোগানও আছে। কিন্তু লড়াই লাগলে ভ্যাম্পের গলাকাটা ডাকাতদের সঙ্গে পারবে না ওই অস্ত্র নিয়ে।

তারমানে, লুকিয়ে থাকতে হবে। এই খালপাড়েই কাটাতে হবে দিনটা, রাতের আগে বেরোনো উচিত হবে না। রাত্রে চলতে অসুবিধে হয়তো হবে, কিন্তু উপায় কি?

ভরপেট খেয়ে খালের পাড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে ইনডিয়ানরা। ক্যানূতে শোয়ার সাহস নেই কারও। কুমিরের পেটে যাওয়ার চেয়ে পোকামাকড়ের কামড় সওয়া বরং অনেক ভাল।

তিন গোয়েন্দাও শুয়ে পড়ল।

সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। মহিলার আগমন তাই কেউ টের পেল না। এত সুন্দরী, কিন্তু তাকে দেখার জন্যে কেউ জেগে নেই।

মসৃণ কোমল হালকা বাদামী চামড়ার ওপর ঘন বাদামী গোল গোল ছাপ দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে, গোল ছাপের মাঝখানটা আবার ফ্যাকাসে। মাথাটা দেখতে কুকুরের মাথার মত। এই মাথায় ভর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে সে। প্রায় দুই মানুষ সমান লম্বা। লাল-কালো আর হলুদ আলপনা কাটা সুন্দর লেজটা পেঁচিয়ে রয়েছে গাছের ডালে।

মাটিতে থুতনি ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে লেজ খুলতে শুরু করল সে। এক মুহূর্ত খাড়া হয়ে রইল চুপচাপ, লেজের ডগা মাটি থেকে বারো ফুট উঁচুতে। আস্তে করে শরীরটা নেমে এল মাটিতে।

মাথা তুলে ঘুমন্ত শরীরগুলো দেখল সে। খাবার হিসেবে কেমন হবে যাচাই

করছে।

নিজের শরীরের তিন গুণ বড় জিনিস গিলে খাবার ক্ষমতা আছে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সাপ বোয়া কনসট্রিকটরের।

সারির প্রথম ইনডিয়ান লোকটার ওপর দিয়ে 'বয়ে' গেল বোয়া, এতই হালকাভাবে, টেরই পেল না লোকটা। পরের জন, তার পরের জন করতে করতে এসে থামল রবিনের ওপর। দেখল। গেলা হয়তো যায়, কিন্তু হজম করতে লাগবে কম পক্ষে ছয় হপ্তা। নাহ্, এত ভারি খাবার খেয়ে আরাম নেই। ছোট কিছু দরকার।

বড় বজরা থেকে মৃদু একটা শব্দ আসছে। ফিরে তাকাল বোয়া। মাস্তুলের ওপরে কিকামুর চুল নিয়ে খেলা করছে ময়দা।

রবিনকে ডিঙিয়ে এল বোয়া। কিশোর আর মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না। খোলা জায়গাটুকু নিঃশব্দে পেরিয়ে এসে উঠল বজরায়।

থেমে দার্শনিককে দেখল। মাংস-টাংস ভালই, পেটও ভরবে, কিন্তু লম্বুর লম্বা লম্বা শুঁটকো ঠ্যাঙ আর হাড্ডি সর্বস্ব বিশাল ঠোঁটটা নিয়েই ঝামেলা। পালকসহ শরীরটা গিলতে পারলেও পা দুটো বেরিয়ে থাকবে মুখের বাইরে। আর ঠোঁটের মধ্যে না আছে মাংস, না রক্ত, না কোন প্রোটিন। বরং ভেতরে গিয়ে পাকস্থলী ফুটো করে দেয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ধরতে গেলেই ঠোকর খেয়ে শরীর কয়েক জায়গায় ফুটো করে নিতে হবে আগে। থাকগে, কে যায় ঝামেলা করতে।

মাস্তুলের ওপরে রসালো নাস্তার দিকে আবার তাকাল বোয়া।

সাপটাকে ময়দাও দেখেছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়।

মাস্তুলের গা মসৃণ, পিচ্ছিল। কিন্তু বোয়ার নাম খামোকা কনসট্রিকটর রাখা হয়নি, কোন জিনিসকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখায় তার জুড়ি মেলা ভার। মাস্তুল বেয়ে স্বচ্ছন্দে উঠতে শুরু করল সে।

চোখ বড় বড় করে নীরবে চেয়ে রইল ময়দা। যেন বোয়ার ঠাণ্ডা শীতল চোখ সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে।

কিকামুর দিকে তাকালও না বোয়া, আলগোছে পেরিয়ে এল। বিরাট হাঁ করে গিলতে এল ময়দাকে।

শেষ মুহূর্তে যেন সংবিত ফিরে পেল ময়দা। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে গিয়ে নামল টলডোর ছাতে।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে আবার নামতে শুরু করল বোয়া। এমন কিছু ঘটতে পারে, জানা ছিল বোধহয়। বাতাসে জোরে জোরে দুলছে এখন কিকামু। নামার পথে তাই অবহেলা করতে পারল না বোয়া, ক্ষণিক থেমে পরীক্ষা করে দেখল খাওয়া চলবে কিনা। চলে, কিন্তু লাভ নেই। শুকনো চামড়া আর চুল খাওয়ার কোন মানে হয় না।

মাস্তুলের গোড়ায় চলে এসেছে বোয়া, এই সময় দরজায় উঁকি দিল নাকু।

সঙ্গে সঙ্গে যেন জমে গেল বোয়া। কাঠে জড়ানো ব্রোঞ্জের একটা মূর্তি যেন।

'অভিজ্ঞতা নেই, বিপদ টের পেল না তাপিরশিশু। খিদে পেয়েছে তার, খাবার খুঁজতে এসেছে। গোঁইগুঁই করে মুসাকে ডাকছে। বেরিয়ে এল বাইরে।

দুই ফুটের মধ্যে চলে এল নাকু।

আঘাত হানল বোয়া। তার সিল্কের মত কোমল নরম ঘাড়টা কঠিন লোহার পাইপ হয়ে গেছে নিমেষে। বাঁকা, চোখা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নাকুর নাক।

ভয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল নাকু। জাগিয়ে দিল পাড়ের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।

বন্দুক হাতে দৌড়ে এল কিশোর। কিন্তু সাপটাকে দেখে থেমে গেল, গুলি করা চলবে না। জ্যান্ত ধরতে পারলে দারুণ হবে। দ্বিধায় পড়ে গেল। নাকুকে হারাতেও রাজি নয়।

বোয়ায় প্রথম কাজ, ভাইসের মত কঠোর ভাবে শিকারকে কামড়ে ধরা। সেটা ধরেছে। এরপর দ্রুত মাস্তুল থেকে শরীর খুলে এনে পেঁচিয়ে ধরবে। ইতিমধ্যেই খুলতে শুরু করেছে প্যাঁচ। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে শুরু করবে। হাড়মাংস ভর্তা করে পিণ্ড বানিয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে গেলা। অনেক, অনেক সময় লাগিয়ে গিলবে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে।

শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলার আগেই কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে? আর কোন উপায় না দেখে বোয়াকে ভয় দেখানোর জন্যে তার মাথার কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল কিশোর।

'আরে,' না বুঝে বলল মুসা, 'এত কাছে থেকে মিস!'

ইয়া বড় ছুরি হাতে ছুটে এল জিবা।

'না, না,' বাধা দিল কিশোর। 'জ্যান্ত ধরব।' লাফিয়ে নৌকায় উঠে দড়ি আনতে ছুটল।

কিন্তু দড়ি নিয়ে ফিরে এসে দেখল অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে।

সাপের লেজ গিয়ে বাড়ি লেগেছিল ঘুমন্ত ইগুয়ানার মাথায়। ব্যস, আর যাবে কোথায়। রাগের মাথায় লেজটাই কামড়ে ধরেছে ডাইনোসর। ছাড়ানোর সাধ্য নেই বোয়ার। খালি গড়াগড়ি করছে। তার পাকের মধ্যে পড়ে বেচারা নাকুর অবস্থা শোচনীয়। বেরোতেও পারছে না, গলা ব্যথা করে ফেলছে চেঁচিয়ে।

কিছু একটা করা দরকার। থামাতে হবে ওগুলোকে। কিভাবে থামাবে, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না কিশোর।

লেজ ছাড়াতে না পেরে বোয়াও গেল খেপে। ডাইনোসরকে আক্রমণ করে বসল।

এ-যেন বিউটি আর বীস্টের লড়াই। মাঝখান থেকে নাকুর হয়েছে মহাবিপদ।

কিশোর বুঝতে পারছে, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে অন্তত দুটো জীবকে খোয়াতে হবে। নাকু, এবং দুই দানবের যে কোন একটাকে। দড়ি হাতেই রয়েছে, কিন্তু ফাঁস পরানোর উপায় নেই।

সমস্যার সমাধান করে দিল মুসা। লাফিয়ে গিয়ে পড়ল লড়াইয়ের মাঝে।

টেলিভিশনে দেখেছে, কি করে খালি হাতে বড় অজগর ধরা হয়। সব সাপেরই ঘাড়ের কাছে বিশেষ নার্ভ সেন্টার থাকে, সাপের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

দুই হাতে বোয়ার ঘাড় চেপে ধরল সে। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে খুঁজতে লাগল নার্ভ সেন্টার।

ঝাড়া মেরে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল সাপটা। গিয়েওছিল আরেকটু হলেই। কিন্তু হঠাৎ বোধহয় চাপ লাগল নার্ভ সেন্টারে। পলকের জন্যে অবশ হয়ে গেল ওটা। স্থির। এই সুযোগে আরও ভালমত ঘাড় চেপে ধরল মুসা। টেনে সরিয়ে নিয়ে এল ডাইনোসরের কাছ থেকে।

ইনডিয়ানরাও যোগ দিল মুসার সঙ্গে। সাপের বিভিন্ন জায়গা চেপে ধরল ওরা।

ঢিল পেয়ে আরও ভালমত ধরার জন্যে কামড় খুলল ডাইনোসর। কিন্তু আর সুযোগ পেল না। ঝটকা দিয়ে লেজ সরিয়ে নিয়েছে বোয়া।

প্যাঁচ খুলে যাওয়ায় ইতিমধ্যে নাকুও বেরিয়ে সরে গেছে নিরাপদ জায়গায়। কুঁই কুঁই করছে আর শুঁড় বোলাচ্ছে শরীরের এখানে ওখানে।

এক ইনডিয়ানের গায়ে লেজ দিয়ে সপাসপ বাড়ি মারতে লাগল বোয়া। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

ছুটে গিয়ে লেজ চেপে ধরল রবিন। রাখতে পারল না। টানের চোটে গড়িয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

মাথাটা ধরে রাখতে পারছে না আর মুসা। ঘাড় ঘুরিয়ে বিশাল হাঁ করে তাকে কামড়াতে চাইছে বোয়া। ঘামে পিচ্ছিল হাত। শত চেষ্টা করেও নার্ভ সেন্টার খুঁজে পাচ্ছে না আর।

শুয়ে থেকেই আবার লেজ চেপে ধরল রবিন। তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর। হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল লেজের ওপর।

ছেড়ে দেয়ার আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করল মুসা।

অবশ হয়ে গেল আবার বোয়া।

গেছে, পাওয়া গেছে! আনন্দে আরও জোরে টিপে ধরল মুসা।

পাটাতনে ফেলে সাপটাকে চেপে ধরল সবাই। ঠিক কোন জায়গায় চাপ দিতে হয়, জেনে গেছে মুসা। আঙুলের চাপ সরাচ্ছে না।

'ধরলাম তো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'রাখি কই?'

আঙুল তুলে মনট্যারিয়ার টলডো দেখাল জিবা।

তা-ই করা হলো। সাপটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে টলডোতে ভরে দরজা আটকে দেয়া হলো।

'হ্যাঁ, বেশ ভাল জায়গা পেয়েছে,' বলল কিশোর।

বড় বজরার পাটাতনে, টলডোর ছাতে জিরাতে বসল সবাই। একটিমাত্র সাপ ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে এতগুলো লোকের।

'আরিব্বাপরে, এত শক্তি!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা।

টলডোর বেড়া ভেঙে না পালায়।'

'না, তা বোধহয় করবে না,' রবিন বলল। 'পানিকে ভয় পায়। তবে বলাও যায় না। শান্ত করে ফেলা দরকার।'

'শান্ত?' মুখ তুলল মুসা। 'কিভাবে?'

'পেটে খিদে ওটার,' জবাব দিল কিশোর। 'পেট ভরাতে হবে। তাহলেই দিন কয়েকের জন্যে চুপ।'

বোয়ার খাবারের সমস্যা নেই। বুনো জানোয়ার চলাচলের পথে মাটিতে গর্ত করে ফাঁদ পেতে সহজেই একটা অল্প বয়েসী পেকারি ধরে নিয়ে এল ইনডিয়ানরা। টলডোর দরজা খুলে জানোয়ারটাকে ভেতরে ঠেলে দিয়েই আবার বন্ধ করে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পেকারির আতঙ্কিত আর্তনাদ। দ্রুত কমে এল চিৎকার, তারপর চাপা গোঙানি, অবশেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল।

টলডোর দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল মিরাটো। এক নজর দেখে ইশারায় ডাকল কিশোরকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

বোয়ার বিশাল হাঁয়ের ভেতরে অর্ধেক ঢুকে গেছে পেকারি।

'খাইছে!' মুসা অবাক। 'এত বড়টা ঢোকাল কিভাবে?'

'চোয়ালের গোড়া আলাদা ওদের,' বোঝাল কিশোর। 'আমাদের চোয়ালের মত নয়। ওপরের আর নিচের চোয়ালের মাঝে ইলাসটিকের মত জিনিস রয়েছে, ইচ্ছে করলেই অনেক বেশি ছড়াতে পারে চোয়াল।'

দেখতে দেখতে পেকারিটাকে গিলে ফেলল বোয়া।

'মারছে!' মাথা নাড়ল মুসা। 'ওই রাক্ষসের জন্যে রোজ খাবার জোগাড় করবে কে?'

'ভয় নেই, রোজ লাগে না,' রবিন বলল। 'ওই এক পেকারিতেই ওর এক হপ্তা চলে যাবে। দুই হপ্তাও যেতে পারে। ওর রাগ-টাগ সব শেষ। চুপচাপ গিয়ে এখন অন্ধকার কোণে শুয়ে পড়বে। সাত চড়েও আর রা করবে না। পড়ে পড়ে ঘুমাবে। খিদে পেলে তারপর জাগবে।'

ঠিকই বলেছে রবিন।

খাওয়া শেষ হতেই টলডোর কোণের দিকে রওনা হলো বোয়া। সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল। মাথাটা কুণ্ডলীর ওপরে রেখে চুপ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, বেমক্কাভাবে ঢোল হয়ে ফুলে থাকা পেটটা, ওখানেই রয়েছে পেকারি।

পরের সারাটা দিন বোয়ার আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

এই সময়ে আরেক কাণ্ড হয়েছে। বনের ভেতরে শিকারের খোঁজে গিয়েছিল মিরাটো আর দুজন ইনডিয়ান। ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসেছে আরও ডজনখানেক সাপের বাচ্চা। একটা বোয়ার বাসা পেয়ে গিয়েছিল, তাতেই ছিল বাচ্চাগুলো।

খুশি হলো কিশোর। বোয়ার বাচ্চারও নেহায়েত কম চাহিদা নয়। বারোটা

বাচ্চার অনেক দাম।

অন্ধকার ঘনালে রওনা হলো বজরা-বহর।

মাঝরাতের দিকে অনুকূল হাওয়া পেয়ে পাল তোলা হলো। আশপাশের জঙ্গল নীরব। সরু একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে চলেছে এখন তিনটে নৌকা। এক পাশে মূল ভূখণ্ড, আরেক পাশে ছোট একটা দ্বীপ।

হঠাৎ সামনের আবছা অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে বেরোল যেন নৌকাটা, একটা ক্যানূ। পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার শোনা গেল, মনে হলো সাহায্যের আবেদন। সন্দেহ হলো কিশোরের—ফাঁদ নয়তো? কিন্তু সত্যি যদি বিপদে পড়ে থাকে লোকটা? পাল নামানোর নির্দেশ দিল সে।

ক্যানূর পাশাপাশি হলো বড় বজরা।

'কিশোর প্যাশাআ (পাশা)?' ক্যানূ থেকে বলল একটা কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' সন্দেহ বাড়ল কিশোরের। নাম জানল কিভাবে? ক্যানূতে মাত্র দু-জন লোক

'ওরাই!' অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল ক্যানূর একজন।

তীরের কাছে অন্ধকার থেকে সাড়া এল। পানিতে একসাথে অনেক দাঁড় ফেলার ছপছপ শব্দ।

'পাল!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি!'

কিন্তু পালের দড়িতে হাত দেয়ার আগেই ক্যানূর একজন ঝুঁকে বড় বজরার কিনারা আঁকড়ে ধরল। হাতের রিভলভার নেড়ে বলল, 'খবরদার! নড়লেই মরবে!'

পাথর হয়ে গেল যেন ইনডিয়ানরা।

সাপের ঝুড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। জায়গাটা অন্ধকার। তাকে দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে আসছে দাঁড়ের শব্দ। যা করার এখুনি করতে হবে। আস্তে ঝুঁকে সাপের বাচ্চা ভরা ঝুড়িটা তুলে নিল সে।

নৌকাটা আবছা দেখা যাচ্ছে এখন। বেশ বড়। তাতে অনেক লোক। নিশ্চয় ভ্যাম্প আর তার দলবল।

আর দেরি করল না মুসা। দু-হাতে ধরে ঝুড়িটা মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে মারল ক্যানূর দু-জনকে লক্ষ্য করে।

তিন

ঝুড়ির মুখ খুলে গিয়ে মাথার ওপর যেন সর্পবৃষ্টি হলো।

কি সাপ, বিষাক্ত কিনা, কি করে জানবে ওরা? মাথা ঢাকার জন্যে হাত উঠে গেল ওদের। ট্রিগারে আঙুলের চাপ লেগে গুলি ফুটল। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি করল না বুলেট, আকাশমুখো উড়ে গেল। আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে ক্যানূতে বসা

লোকটা, থাবা দিয়ে গা থেকে সরাচ্ছে কিলবিলে জীবগুলোকে।

বড় বজরার কিনার থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে অন্যজন। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল পানিতে, কাত করে ফেলল ক্যানূ। অন্য লোকটাও পানিতে পড়ল।

'বাঁ-ব্বাচাও!' হাত ছুঁড়ছে একজন। 'আ-আমি···সাঁতার জানি না···প্লুপ!'

কেউ বাঁচাতে গেল না তাকে। পালের দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে বজরা-বহরের। ঝপাত করে পানিতে পড়ল দাঁড়। উল্টানো ক্যানূটার পাশ দিয়ে ধেয়ে বেরোল নৌকা।

পেছনে বড় নৌকাটায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শব্দ কম, বেশির ভাগই অশুদ্ধ ইংরেজি। ডাকাতগুলোকে বোধহয় ইকিটোজ থেকেই জোগাড় করেছে ভ্যাম্প। তাদের মাঝে একজন কি দু-জন রয়েছে ইনডিয়ান কিংবা ক্যাবোকো, যে নদীপথ চেনে। বাকিগুলো সব আনাড়ি। দক্ষ জাহাজী হতে পারে। কিন্তু নদীপথে দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানো এক কথা, আর সাগরে এঞ্জিনের জাহাজ চালানো আরেক।

বোঝা যাচ্ছে দাঁড় বাওয়া দেখেই। মনট্যারিয়া নিয়ে ধাওয়া করেছে। দুই ধারে চারজন করে দাঁড়ি। বেশি ভিড় বলা যাবে না। কিন্তু এতেই গোলমাল করছে ওরা, দাঁড়ে দাঁড়ে লাগিয়ে দিচ্ছে, ফলে ব্যাহত হচ্ছে নৌকা বাওয়া। একে অন্যকে দোষ দিচ্ছে, গালাগাল করছে মুখ খারাপ করে।

পানিতে পড়া দু-জনকে তোলার জন্যে থামতে হলো ভ্যাম্পকে। ক্যানূটা সোজা করে বাঁধল মনট্যারিয়ার সঙ্গে। সময় নষ্ট হলো তাতে।

'থ্যাংকিউ, মুসা,' এতক্ষণে বলল কিশোর।

মুসা বুদ্ধি করে সাপের ঝুড়ি ছুঁড়ে মারাতেই বেঁচেছে ওরা। কিন্তু স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে এল মনট্যারিয়া থেকে। প্রচণ্ড রাগে যেন এলোপাতাড়ি ছুটতে লাগল। শক্তিশালী রাইফেল, শব্দ শুনেই বোঝা যায়। পাঁচশো ফুট দূরত্ব কিছুই না ওগুলোর জন্যে।

বড় বজরার গলুইয়ের কাছে কাঠের চলটা ওঠাল একটা বুলেট, টলডোর ছাত ফুঁড়ে গেল একটা, আরেকটা এসে ভেঙে দিল মঞ্চের এক পা। বেকায়দা ভঙ্গিতে সামান্য কাত হয়ে গেল মঞ্চটা। হাল ছেড়ে লাফ দিয়ে নেমে এল জিবা।

শাঁই করে নাক ঘুরে গেল বড় বজরার।

ধমক দিয়েও জিবাকে আর পাঠানো গেল না মঞ্চে।

তোতলাচ্ছে জিবা, কি বলল বোঝা গেল না। নাকমুখ গুঁজে গিয়ে টলডোর ভেতরে পড়ল।

দাঁড় ফেলে লাফিয়ে গিয়ে টলডোতে উঠল মুসা। ছুটে গিয়ে চড়ল মঞ্চে। হাল ধরে নৌকার মুখ সোজা করল আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে মহামূল্যবান খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

তার চারপাশে বুলেট ছুটছে। আকাশ আর তারার পটভূমিকায় বেশ স্পষ্ট নিশানা এখন সে। যে কোন মুহূর্তে এসে পিঠে বিঁধতে পারে গুলি। কিন্তু পরোয়া করল না। হাল ধরে না রাখলে বজরা-বহরের সবাইকে মরতে হবে। এখন তাকে দেখলে কে বলবে এই সেই ভূতের ভয়ে-কাবু 'স্বভাবভীতু' মুসা আমান?

'কিশোর!' চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'ক্যানূর দড়ি কাটতে বলো।'

'কেন...' বলেই থেমে গেল কিশোর। বুঝতে পেরেছে।

মিরোটাও পেরেছে। ছুরি হাতে ছুটে গেল সে।

সরু খালে পঁচিশ ফুট লম্বা ক্যানূ আড়াআড়ি পড়ে থাকলে ওটা না সরিয়ে কোন নৌকা এগোতে পারবে না।

দড়ি ধরে টেনে ক্যানূটাকে কাছে নিয়ে এল মিরাটো। কয়েক পোঁচেই দড়ি কেটে ফেলল। ক্যানূর গলুই ধরে ধাক্কা লাগাল জোরে। আধ চক্কর ঘুরে আড়াআড়ি হয়ে গেল ক্যানূ। ভাসতে লাগল খাল জুড়ে।

'মিনিটখানেক দেরি করাবে,' বিড়বিড় করল মুসা।

তার কথার জবাবেই যেন ছুটে এল বুলেট। প্যান্টের হাঁটুর ওপরে কাপড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল উরু। মনে মনে বলল, 'আল্লা, ক্যানূটা যেন না দেখে।'

সময়মত চোখে না পড়লে জোরে এসে তাতে ধাক্কা খাবে মনট্যারিয়ার গলুই, ভেঙে যাওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা।

সময়মতই দেখল ড্যাম্প, কিন্তু বেশি মাতব্বরী করতে গিয়ে পড়ল বিপাকে। সময় নষ্ট হবে, তাই ক্যানূ না সরিয়ে ওটার এক গলুই ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। আসতে পারত, যদি মাল্লারা আনাড়ি না হত।

বুনো চিৎকার করে উঠল নৌকা বোঝাই ডাকাতেরা। তাদের চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, পর্তুগীজ ভাষায় হুঁশিয়ার করছে। বোধহয় ইনডিয়ান, যে এই এলাকা চেনে। পানিতে দাঁড়ের খোঁচা মেরে মনট্যারিয়াকে সরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল ওরা। পারল না। বালির চরায় নৌকার তলা ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ খচখচ শব্দ দূর থেকেও শোনা গেল। কাত হয়ে গেল নৌকা। পালের জন্যে আরও বেশি কাত হয়ে পানিতে ডুবে গেল একটা পাশ। মাল্লাদের কিছু চরায় ছিটকে পড়ল, কিছু পানিতে।

'জোরে!' মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'জোরে টানো দাঁড়। পালানোর এই সুযোগ।'

গুলি বন্ধ হয়েছে দেখে আবার গিয়ে হাল ধরল জিবা।

অন্ধকারে আঁকাবাঁকা খাল ধরে তীব্র গতিতে ধেয়ে চলল বজরা-বহর। ধীরে ধীরে পেছনে পড়ল ডাকাতদের উত্তেজিত চেঁচামেচি, একটা সময় আর শোনা গেল না।

হাঁপ ছাড়ল নৌকার সবাই।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না, জানে কিশোর। নৌকা সোজা করে নিয়ে খানিক পরেই আবার ছুটে আসবে ভ্যাম্পের দল। যত খারাপ মাল্লাই হোক, ওরা সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া মনট্যারিয়া হালকা নৌকা। ভারি ব্যাটালাওয়ের চেয়ে দ্রুতগতি। তার ওপর ব্যাটালাও একা চলছে না, টেনে নিতে হচ্ছে আরেকটা নৌকাকে। বোঝা তো আছেই।

কাজেই, ভ্যাম্পের নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজরা-বহরের পারার কথা নয়।

পালের ওপর বিশেষ ভরসা নেই। অনুকূল হাওয়া না থাকলে পাল অকেজো। আর খালি যদি সামনে ছোটার ব্যাপার হত, এক কথা ছিল। পথে পথে থামতে হবে তাদেরকে, জানোয়ার ধরার জন্যে। ধরতেই যদি না পারল, এই অভিযানই বৃথা।

যা উঁচু মাস্তুল, লুকাবে কোথায় নৌকাদুটোকে?

খাল দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার চওড়া নদীতে পড়ল বজরা-বহর। প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া এখানে নদী। সামনে আরও চওড়া হয়েছে। যেন অকূল পাথার। মাঝে একটা দ্বীপও আর চোখে পড়ছে না। দিনের বেলা এই খোলা নদীতে রাইফেলের সহজ নিশানায় পরিণত হবে ওরা।

উষার আগমন ঘোষণা শুরু করল পাশের জঙ্গলের পশু পাখি। পুব আকাশে মলিন হয়ে এল তারার আলো। ধূসর, ঠাণ্ডা আলো ফুটতে শুরু করেছে দিগন্তরেখা বরাবর। তার খানিক ওপরে মেঘের গায়ে রঙের ছোঁয়া লাগল, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো লাল, তারপর হঠাৎ করে যেন ঝাঁপি খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টকটকে লাল সূর্য।

বজরা-বহরের পেছনে দূরে কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় ভ্যাম্পের মনট্যারিয়া। ওটা যখন এরা দেখতে পাচ্ছে, ওদের জন্যে বজরা-বহর দেখতে পাওয়াটা আরও সহজ।

চওড়া হওয়া যেন শেষ হবে না নদীর। এখনই এক তীর থেকে আরেক তীর দশ মাইল হয়ে গেছে।

ম্যাপ দেখল কিশোর। সামনে এক গুচ্ছ দ্বীপ থাকার কথা, তার পরে আবার খোলা নদী। এক জায়গায় নীল মোটা একটা রেখা মূল ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। নদী একখান থেকে ঢুকেছে ডাঙার ভেতরে, আরেকখান দিয়ে বেরিয়ে আবার পড়েছে নদীতে।

ওখানে কি আছে জিবাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিচ্ছু নেই,' মাথা নাড়ল জিবা। 'তোমার ম্যাপ ভুল। থাকলে, জানতাম।'

'কিন্তু এই ম্যাপ ভুল হতে পারে না,' তর্ক করল কিশোর। 'আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল...'

বুঝতে চাইল না জিবা। তার এক কথা, ম্যাপ ভুল।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, জিবাই ভুল করেছে। চওড়া খালটা পাওয়া গেল। কিশোরের নির্দেশে তাতে ঢুকে পড়ল বজরা-বহর। দুই ধারে জঙ্গল এত ঘন,

ভ্যাম্পের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে, যদি না তার কাছেও এ-রকম একটা ম্যাপ থেকে থাকে।

পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। খাড়া উঠে গেছে দু-শো ফুট। তারপর দু-দিক থেকে এসে মিশেছে দু-দিকের ডালপালা, মাথার ওপরে ছাত তৈরি করে দিয়েছে। সেই ছাতকে জীবন্ত করে রেখেছে বানরের দল আর রাশি রাশি পাখি—চোখ ধাঁধানো রঙ।

বাতাস নেই এখানে। পাল তুলে রাখার আর কোন মানে হয় না। নামিয়ে ফেলা হলো। পানিতে ঢেউও নেই, কাচের মত স্বচ্ছ। দাঁড় বাওয়া সহজ।

এগিয়ে চলেছে বজরা বহর, ভেসে থাকা কুমিরের নাকে ঢেউ লাগছে, বিচিত্র শব্দ করে তলিয়ে যাচ্ছে ওগুলো। এক জায়গায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিল দুটো জ্যাবিরু সারস, নৌকা দেখে ধ্যান ভাঙল। এক পায়ের জায়গায় দুই পা দেখা দিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে কথা বিনিময় হলো লম্বুর।

'আরি! দেখো দেখো!' আঙুল তুলে দেখাল মুসা। 'পানির ওপর দৌড়াচ্ছে গিরগিটি।'

দাঁড় বাওয়া থামিয়ে অদ্ভুত জীবটাকে দেখল সবাই। লেজসহ ফুট তিনেক লম্বা। পেছনের দুই পা আর লেজের ওপর ভর, সামনের দুই পা তুলে রেখেছে অনেকটা মোনাজাতের ভঙ্গিতে।

'ব্যাসিলিস্ক,' বলল কিশোর।

'অনেক দাম,' রবিন বলল। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

কিন্তু ধরা কঠিন। পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একপাড় থেকে আরেক পাড়ে, আবার আসছে এ-পাড়ে, খাবার খুঁজছে। আসছে-যাচ্ছে নৌকার সামনে দিয়েই। কারও দিকে খেয়াল নেই, নিজের কাজে ব্যস্ত।

আরেকবার নৌকার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঝাঁপ দিল মিরাটো। পড়ল গিরগিটিটার ওপর। তলিয়ে গেল। খানিক পরে আবার যখন ভেসে উঠল, দেখা গেল তার হাতে ছটফট করছে ব্যাসিলিস্ক।

গলায় দড়ি লাগিয়ে বড় বজরার টলডোর ভেতরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হলো জীবটাকে। বাঁধা না থাকলে ঝামেলা করে, তাই মোট চারটে জীবকে বেঁধে রাখা হয়েছে এখন। লম্বুর ঠ্যাঙ-এ শুরু থেকেই দড়ি ছিল, বোয়ার সঙ্গে গোলমাল করার পর নাকু আর ডাইনোসরের গলায়ও দড়ি পড়েছে।

খালটা আট মাইল লম্বা। শেষ হলো একটা মোহনায়—ন্যাপো আর আমাজনের মিলনস্থল।

ভ্যাম্প পিছে পিছে খাল ধরে আসছে কিনা, জানে না কিশোর। সরাসরি আমাজন ধরে আর যেতে চাইল না। তার চেয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে যাবে ন্যাপো নদীতে। খোলা আমাজন ধরে গেলে ডাকাতদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

নদীটার বড় একটা বাঁক ঘুরতেই গাছপালা আড়াল করে ফেলল বজরা-বহরকে। আমাজন থেকে আর দেখা যাবে না।

আরও খানিক দূর এগিয়ে শান্ত একটা বাঁকের কাছে নৌকা বাঁধার নির্দেশ দিল কিশোর। দিনটা ওখানেই কাটাবে।

তীর ঘেঁষে নৌকা রাখলে বোয়া নেমে যেতে পারে, তাই রাখা হলো বিশ ফুট দূরে। কিন্তু এত দূরেও গভীরতা বড়ই কম, মাত্র হাঁটু পানি ওখানে। নিচে নরম বালি। কাদা নেই। পানি ভেঙে সহজেই হেঁটে গিয়ে ওঠা যাবে ডাঙায়।

আগে নামল মুসা। ডাঙায় উঠল। এবং উঠেই জড়াল গোলমালে।

চার

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। চোখ ডলল। বিশ্বাস করতে পারছে না, এ-রকম জীব আছে দুনিয়ায়, ওই চেহারার!

ভালুকের মত পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীরটাও গলা পর্যন্ত ভালুকের মত। কিন্তু গলার ওপরে···কিসের সঙ্গে তুলনা করবে? শুঁড়? না। নাক? তা-ও না। মাথা নেই, মুখ নেই, চোয়াল নেই। মোটা একটা নল যেন ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, আগাটা সরু, তাতে গোল ছিদ্র। সেটা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বেরোচ্ছে লকলকে···হ্যাঁ, বোধহয় জিভই।

পেশীবহুল বিশাল দুই শক্তিশালী বাহু, থাবা কিংবা আঙুল নেই, তার জায়গায় রয়েছে ইঞ্চি চারেক লম্বা বাঁকা নখ। ওই নখ দিয়ে মানুষের সমান উঁচু, কঠিন উঁইয়ের ঢিবি এত সহজে চিরছে, যেন ছুরি দিয়ে মাখন কাটছে। পিলপিল করে বেরোচ্ছে উঁই। দুই ফুট লম্বা, লাল, সাপের জিভের মত জিভে আটকে পোকাগুলোকে নলের ভেতরে চালান করছে জীবটা। নাক-মুখ দুয়েরই কাজ করে তার নল।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'জায়ান্ট অ্যান্টইটার!' ফিসফিসিয়ে বলল। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

'পিঁপড়েখেকো এত বড় হয়!'

'হয়,' পেছন থেকে বলল রবিন। 'অনেক জাতের পিঁপড়েখেকো আছে। এটা সবচেয়ে বড় জাতের। অ্যান্টবিয়ারও বলে একে।'

'সেটাই ঠিক নাম। ভালুকের মতই। তো, ধরতে বলছ? বেশ, ধরে দিচ্ছি।' এমন ভঙ্গি করল মুসা, যেন খোঁয়াড় থেকে মুরগী ধরে আনতে যাচ্ছে।

'সাবধান!' কিশোর বলল। 'ডেনজারাস।'

'ডেনজারাস? কিভাবে? দাঁতই নেই···'

'নখ আছে।'

'পেছন থেকে ধরব,' সাপটাকে ধরে সাহস বেড়ে গেছে মুসার। নিজেকে টারজান ভাবতে আরম্ভ করেছে।

পিঁপড়েখেকোর দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, গন্ধেই আঁচ করে নিল ব্যাপার সুবিধের নয়। সামনের দুই পা নামিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। পেছনে দুলছে অদ্ভুত লেজটা। এমন লেজ থাকতে পারে কোন জানোয়ারের, কল্পনাও করেনি কোন দিন মুসা। কয়েক ফুট লম্বা একটা ঝাশ যেন, ব্রাশের রোঁয়াগুলো প্রায় দুই ফুট লম্বা। নাকের মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত জীবটা লম্বায় ফুট সাতেক।

পা টিপে টিপে পিঁপড়েখেকোর পেছনে চলে এল মুসা। পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে পেট জড়িয়ে ধরল। দমে গেল শুরুতেই। অসাধারণ জোর জানোয়ারটার গায়ে। ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল তাকে। নখের সামান্য ছোঁয়া লাগল শুধু গোয়েন্দা-সহকারীর বাহুতে, তাতেই গভীর আঁচড় পড়ল চামড়ায়, রক্ত দেখা দিল।

আবার দু-পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল পিঁপড়েখেকো। লম্বা জিভটা নলের ভেতর ঢুকছে-বেরোচ্ছে।

পিছু হটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডালে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেল মুসা। চোখের পলকে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রোমশ দানবটা। দুই বাহু বাড়িয়ে দিল জড়িয়ে ধরার জন্যে।

প্রমাদ গুণল কিশোর। শুনেছে, ওভাবে ধরে চাপ দিয়ে পুমার পাঁজরও গুড়িয়ে দেয় পিঁপড়েখেকো।

ধরা পড়ার আগেই গড়িয়ে সরে এল মুসা, উঠে দাঁড়াল। একপাশ থেকে চেপে ধরল লম্বা নলটা।

হ্যাঁচকা টানে নল ছুটিয়ে নিল পিঁপড়েখেকো। বাইসাইকেলের প্যাডাল ঘোরানোর মত করে দুই বাহু চালাল। ভয়াবহ নখ দিয়ে চিরে দিতে চায় আক্রমণকারীকে।

জানোয়ারটার দুর্বল জায়গা কোথায়, বুঝে ফেলেছে মুসা। পাশ থেকে লাফিয়ে এসে আবার চেপে ধরল লম্বা নল। মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে কোরবানীর গরুর মত, তারপর পিঠে চেপে বসে কাবু করবে।

হঠাৎ পাশের ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা পিঁপড়েখেকো। প্রথমটার চেয়ে বড়, বোধহয় মদ্দা।

হতভম্ব হয়ে গেল মুসা, কিন্তু নল ছাড়ল না।

রবিন বোবা।

ঝট করে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর, নৌকা থেকে বন্দুক আনার জন্যে।

বিচিত্র আওয়াজ করে সঙ্গিনীকে সাহায্য করতে ছুটে এল পুরুষ জানোয়ারটা।

বিদ্যুত খেলে গেল যেন মিরাটোর শরীরে। লাফিয়ে এসে পড়ল পিঁপড়েখেকোর সামনে। শাঁই করে হাতের ছুরি চালাল। ছুরি না বলে তলোয়ার বলাই ভাল ওটাকে, তিরিশ ইঞ্চি লম্বা ফলা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল পিঁপড়েখেকো—পুরো ছয় ফুট, মিরাটোর চেয়ে পাঁচ ইঞ্চি

উঁচু। থাবা চালাতে শুরু করল। মিরাটোর হাতে একটা ছুরি, কিন্তু ওটার দুই হাতে তিন-দু-গুণে ছয়টা। চার ইঞ্চি করে লম্বা, বাঁকা, ক্ষুরের মত ধার। ইস্পাতের চেয়ে শক্ত।

খুব সর্তক মিরাটো, ক্ষিপ্র। লাফ দিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে, একই সাথে ছুরি চালাচ্ছে শাঁই শাঁই করে। কিন্তু লাগাতে পারছে না। আরও কাছে থেকে কোপাতে হবে।

কাছে এসেই নখের আওতায় পড়ে গেল মিরাটো। তার নগ্ন বুক চিরে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

লাফিয়ে ডানে সরে গেল সে। সামান্য সামনে ঝুঁকেছে পিঁপড়েখেকো। সোজা হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ছুরি চালাল মিরাটো। এক কোপে ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেলল লম্বা নল। কাটা গলা দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল ধড়টা।

বোতল আনতে নৌকায় ছুটল একজন ইনডিয়ান। রক্তচাটাকে খাওয়ানোর জন্যে রক্ত জমিয়ে রাখবে।

ওদিকে তুঙ্গে উঠেছে মুসা আর মাদী-পিঁপড়েখেকোর লড়াই। অন্য কোনদিকে নজর দিতে পারছে না। নল চেপে ধরে মোচড় দিয়ে বার বার ফেলে দিচ্ছে মুসা, কিন্তু রাখতে পারছে না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারটা।

না, এভাবে হবে না। মুসার ধারণা, জীবটা সাঁতার জানে না। নল চেপে ধরে তাই ঠেলে নিয়ে চলল পানির দিকে। ইচ্ছে, চুবিয়ে কাবু করবে।

সাহায্য করতে এগোল মিরাটো। কিন্তু সে কিছু করার আগেই পিঁপড়েখেকোকে নিয়ে পানিতে পড়ল মুসা। ভুল যে করেছে, বুঝতে পারল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দক্ষ সাঁতারু পিঁপড়েখেকো। জোর কমল না, দাপাদাপি বাড়িয়ে দিল আরও।

একটাই উপায় আছে এখন। নলের মুখ পানিতে ডুবিয়ে ধরা। শ্বাস নিতে না পারলে কাহিল হবেই জানোয়ারটা।

সেই চেষ্টাই করল মুসা। কিন্তু কপাল খারাপ তার। পা পিছলে ঝপাং করে পড়ল।

সুযোগ ছাড়ল না পিঁপড়েখেকো। জড়িয়ে ধরল শত্রুকে। একটু আগে তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা করা হচ্ছিল সেটা ফিরিয়ে দিতে চাইল। দু-পেয়ের কাছে শেখা পদ্ধতিতেই তাকে পানির তলায় চেপে ধরে কাহিল করতে চাইল।

হাত থেকে নল ছুটে গিয়েছিল, থাবা দিয়ে আবার চেপে ধরল মুসা। প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে নামাল পানির তলায়। শ্বাসরুদ্ধ করে দিল।

দুজনেরই নাক এখন পানির তলায়। যে বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে, সে-ই জিতবে।

সাঁতারু, বিশেষ করে ডুবসাঁতারে মুসার চেয়ে দুর্বল পিঁপড়েখেকো, সুতরাং আগেই দম ফুরাল। মরিয়া হয়ে নাক তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। ঢিল হয়ে

গেল বাহুর বাঁধন, বাঁচার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এখন জানোয়ারটা। নল ধরে রেখেই তার নিচ থেকে সরে এল মুসা, মাথা তুলল পানির ওপর।

দাপাদাপি কমে গেল পিঁপড়েখেকোর, ছটফট করছে শুধু এখন।

ইনডিয়ানরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

ধরে ফেলা হলো পিঁপড়েখেকোকে। বেঁধে এনে তোলা হলো বড় বজরায়।

বালির চরায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে মুসা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে মলম আর আয়োডিন নিয়ে এল রবিন। মুসার ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে বসল।

'দারুণ দেখিয়েছ হে, সেকেণ্ড,' হেসে বলল কিশোর। 'স্কুলে গিয়ে বললে বিশ্বাসই করবে না কেউ।'

প্রশংসায় খুশি হলো মুসা। 'ধরতে বলেছ, ধরে দিয়েছি, আমি আর কিছু জানি না। খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমাদের। ওর জন্যে রোজ চার-পাঁচ কেজি পিঁপড়ে জোগাড় করবে কে?'

'পিঁপড়ে লাগবে না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'চিড়িয়াখানায় মাংসের কিমার সঙ্গে কাঁচা ডিম মেখে খাওয়ায়। তা-ই খাওয়াব।'

'রাখবে কোথায়?'

'বজরাতেই। শান্ত স্বভাবের জানোয়ার। দুর্ব্যবহার না করলে রাগে না। দু-দিনেই পোষ মেনে যাবে।'

মরা জানোয়ারটাকে কেটে রান্না করল ইনডিয়ানরা।

কিশোর এক টুকরো মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল।

মুখে দিয়ে মুখ বাঁকা করে ফেলল মুসা। 'এহ্হে, এক্কেবারে সিরকা। এর চেয়ে কাঁচা পিঁপড়ে খাওয়া সহজ।'

রবিন মুখেই দিল না।

ইনডিয়ানরা খেলো। পিঁপড়েখেকোর মাংস নাকি রোগ সারায়।

পাঁচ

'আগুন! আগুন!' বনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

আমাজনের কিনার দিয়ে চলেছে আবার বজরা-বহর।

'ইনডিয়ানদের গাঁ জ্বলছে,' অনুমানে বলল রবিন।

'না,' মাথা নাড়ল জিবা। 'বিদেশীর ঘর, রিও থেকে এসেছে। ফার্ম করেছে ওখানে। বোধহয় ইনডিয়ানরা জ্বালিয়েছে।'

'এই, নৌকার মুখ ঘোরাও,' নির্দেশ দিল কিশোর।

হাল ঘোরাল না জিবা। 'ইনডিয়ানরা যদি থাকে? ধরে কেটে ফেলবে।'

'জলদি ঘোরাও,' জিবার কথা কানেই তুলল না কিশোর। 'আগুন নেভাতে হবে। জলদি।'

কথা শুনল না জিবা। আগের মতই হাল ধরে রইল।

মঞ্চে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে হাল ধরল মুসা। ঘুরিয়ে দিল নৌকার গলুই।

বিড়বিড় করতে করতে মঞ্চ থেকে নেমে এল জিবা।

তীর থেকে কয়েক ফুট দূরে নোঙর ফেলা হলো। মাটিতে গলুই ঠেকিয়ে রাখলে বন্দিরা পালাতে পারে, সে-জন্যে এই সতর্কতা।

তীরে নামল সবাই। কিশোর আর রবিনের হাতে বন্দুক, মুসার হাতে রাইফেল। ইনডিয়ানদের হাতে তীর-ধনুক, ব্লো-গান আর বল্লম। জিবার হাতে বিশাল এক ছুরি।

চলার সময় খালি পেছনে পড়ছে সে। নৌকার দড়ি কেটে নৌকা নিয়ে পালানোর মতলব আঁটছে বোধহয়। সতর্ক রয়েছে কিশোর। লোকটাকে চোখের আড়াল করল না।

কিন্তু দেরি করিয়ে দিচ্ছে জিবা। শেষে বিরক্ত হয়ে তাকে সবার সামনে ঠেলে দিল কিশোর। 'তুমি আগে থাকো। জোরে হাঁটো।'

গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল জিবা। কিন্তু কান দিল না কিশোর।

খানিক দূর এগোতেই আগুন আরও ভালমত দেখা গেল। বালতি নিয়ে ছোটাছুটি করছে একজন লোক, কুয়া থেকে পানি এনে আগুনে ছিটাচ্ছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

জিবার পিঠে বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল কিশোর, 'দৌড় দাও।'

দৌড়ে এগোল সবাই।

একদল সশস্ত্র লোক দেখে চমকে কোমরের কাছে হাত দিল তরুণ লোকটা, হতাশ হলো। রিভলভার থাকার কথা, কিন্তু নেই।

'বালতি-টালতি আর আছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভয় চলে গেল লোকটার চেহারা থেকে। ইংরেজিতেই জবাব দিল, 'ওই যে, ওখানে আছে।' একটা চালাঘর দেখাল।

যে যা পারল—বালতি, ড্রাম, মগ তুলে নিয়ে কুয়ায় ছুটল সবাই।

গোটা দুই চালা জ্বলে শেষ। বড় ঘরটায় আগুন ধরেছে। পানি নিয়ে ওটা বাঁচাতে ছুটল। টিনের চাল, গাছের বেড়া, তাই ঘরের আগুন দ্রুত ছড়াতে পারল না। নিভিয়ে ফেলা গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। এক দিকের বেড়া পুড়েছে, ঘর কালিতে মাখামাখি। ছাইয়ে ভরা মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। হারিকেন জ্বালল। প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল লোকটা, চোখ বন্ধ। জখম-টখম

আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। না, তেমন কোন জখম নেই। বেশি পরিশ্রমে কাহিল হয়ে গেছে।

দৌড়ে গিয়ে কুয়া থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে আনল মিরাটো।

ভেজা তোয়ালে ভাঁজ করে লোকটার কপালে বিছিয়ে দিল কিশোর।

আস্তে করে চোখ মেলল লোকটা। চোখা চেহারা। চোখে বুদ্ধির ছাপ। ফ্যাকাসে মুখে হাসি ফুটল। নড়ে উঠল ঠোঁট, 'থ্যাংকস।'

এক গেলাস খাবার পানি নিয়ে এল রবিন।

লোকটার মাথার নিচে হাত দিয়ে ধরে তুলে আধশোয়া করল মুসা।

রবিনের হাতে গেলাস রেখেই পানি খেলো লোকটা। সোজা হয়ে বসে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। সব কিছু এলোমেলো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বাক্সগুলো মেঝেতে পড়ে আছে, খালি। আলমারির দরজা খোলা, তাক খালি। ভেতরের কিছু কিছু জিনিস ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। বোঝা গেল, ডাকাতি হয়েছে। লুট করে নিয়ে গেছে জিনিসপত্র। মূল্যবান কিছুই রেখে যায়নি ডাকাতরা। মেঝেতে আর কিছু কাগজে রক্তে লেগে আছে।

একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ে খুলল কিশোর। খালি। একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, পায়ায় রক্ত। 'মারামারিও হয়েছিল মনে হচ্ছে?'

মাথা নোয়াল লোকটা। 'হ্যাঁ,' গলায় জোর নেই।

'একাই থাকেন?'

আবার মাথা নোয়াল।

'খুব বিপজ্জনক জায়গা। ইনডিয়ানদের এলাকা, না?'

'ডাকাতরা ইনডিয়ান নয়।'

'ইনডিয়ান নয়? তাহলে...' থেমে গেল কিশোর। ভ্যাম্প না-তো? 'কি ভাষায় কথা বলেছে?'

'ইংরেজি, অশুদ্ধ। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, দুটো বড় নৌকা দেখেছি কিনা, জানোয়ার বোঝাই। বললাম, না। খাবার চাইল। আট-দশজন লোকের কম লাগে? তা-ও যা পারলাম, দিলাম। আরও চাইল। শেষে আমার সমস্ত সাপ্লাই কেড়ে নিল। বাধা দেয়ায় আমাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিল দৈত্যটা।'

'ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত চেহারা?'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমাদের পিছু নিয়েছে ওরা।' মেঝের রক্ত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ভ্যাম্পের?'

'না, আরেকটার। আমার বন্দুক-টন্দুক আগেই কেড়ে নিয়েছে। দৈত্যটাকে ছুরি মারতে গেলাম। সরে গেল সে, ছুরি গাঁথল তার পেছনের লোকের গায়ে। রাগে ওই ব্যাটাই আগুন লাগিয়েছে ঘরে। আমার সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। আমাকে ফেলে গেছে কষ্ট পেয়ে মরার জন্যে।'

'দেখে তো ইংরেজ মনে হয় না আপনাকে। কিন্তু ইংরেজি তো ভালই বলছেন?'

'আমি ব্রাজিলিয়ান। নাম বুয়েনো ল্যানসো। রিওতে স্কুলে ইংরেজি শিখেছি।'

বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে পড়ল আবার লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'রিওতে এখন স্লোগান, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার ঃ *গো ওয়েস্ট, ইয়াং ম্যান।* আমাদের সরকার চায়, এই পতিত অঞ্চলটাও আবাদ হোক। তাই আমি চলে এসেছি এখানে। হয়তো বোকামিই করেছি,' চোখ বুজল ল্যানসো।

খানিক পরেই মেলল আবার। ম্লান আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা। নিজেকে যেন সান্ত্বনা দিল, 'না, বোকামি করিনি। নতুন দুনিয়া খুঁজতে বেরিয়ে কলম্বাস কি বোকামি করেছিলেন? আমেরিকানরা যদি মনে করত, পশ্চিমে যাওয়া বোকামি, তাহলে কি গড়ে উঠত আজকের ইউনাইটেড স্টেটস?' কনুয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'জানো, কি বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে এখানে? পৃথিবীর বৃহত্তম পতিত জায়গা এটা। এর বেশিরভাগ জায়গাতেই মানুষ যায়নি এখনও। খনিজ আর বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। শুধু এই এক আমাজনই পৃথিবীর সব মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে। এখানে এখন প্রতি বর্গমাইলে একজনেরও কম মানুষ। লোক দরকার, বুঝেছ, অনেক লোক দরকার এখানে। আমাজনকে আবাদ করতে পারলে দুনিয়ার মানুষ আর না খেয়ে মরবে না। যারা এখানে আগে এসে বসত করবে, কাজের লোক হলে তাদের কপাল খুলে যাবে, আমি লিখে দিতে পারি।'

ল্যানসোর কথাতেই বোঝা যায়, উচ্চশিক্ষিত।

'ঠিক আছে, কথা পরে হবে,' বলল কিশোর। 'আপনি এখন বিশ্রাম নিন।'

শুয়ে পড়ল আবার ল্যানসো, কিন্তু কথা বন্ধ করল না, 'দুনিয়ায় কেন এত হাহাকার জানো? কেন শান্তি নেই? মূল সমস্যাটা হলো, ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মিটাতে পারবে আমাজন। আর সেটা মিটলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে।'

'আপনি দুর্বল। ঘুমোন?'

হাসি ফুটল ল্যানসোর ঠোঁটে। 'পাগলের প্রলাপ ভাবছ তো? সকালেই বুঝবে, মিছে কথা বলছি না আমি। এখনকার মাটিতে কি জাদু আছে বুঝবে।'

পোড়া বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। ভেঙে ফেলা আসবাবের ওপর চোখ বোলাল। গান-র‍্যাক খালি, একটা বন্দুকও নেই, সব নিয়ে গেছে। ড্রয়ারগুলো শূন্য। বাক্স খালি। মানিব্যাগ ফাঁকা। 'ফতুর করে দিয়ে গেছে আপনাকে,' বলল সে। 'এখানে থাকবেন কি করে আর?'

চুপ করে রইল ল্যানসো।

'আপনি শিক্ষিত লোক, কথা শুনেই বুঝেছি। কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, এখানে আসার আগে কি কাজ করতেন?'

'রিওতে কলেজের লেকচারার ছিলাম।'

'তাহলে আবার রিওতেই ফিরে যেতে পারেন। এখানে থেকে কি করবেন। নানা উটকো ঝামেলা, ডাকাত, ইনডিয়ান···এই ভীষণ জঙ্গলে একা কারও পক্ষে কিছু করা সম্ভব না···আমি আর কি বোঝাব? আপনিই আমাকে পড়াতে পারেন। এক কাজ করুন, কাল চলুন আমাদের সঙ্গে।'

ল্যানসোর শুয়োরের খোঁয়াড় খালি, যা ছিল নিয়ে গেছে ভ্যাম্প। গোয়ালে একটা গরু নেই, জ্যান্ত নিতে পারেনি, জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে।

কিন্তু বাগান নিয়ে যেতে পারেনি। ধান আর গমের খেত আছে, আছে সীম, লেটুস, শশা, গাজর, বাঁধাকপির বাগান।

পরদিন সকালে সে-সব দেখে তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর। 'আমি তো ভেবেছিলাম, এত বৃষ্টি, মাটির রসকস কিচ্ছু নেই!'

'কিন্তু আছে যে, এখন তো বুঝতে পারছ?' হাসল ল্যানসো। 'বরং অনেক বেশি আছে। দুনিয়ার চাষীদের সর্বক্ষণের চিন্তা—কি করে বেশি ফলাবে, বড় ফলাবে। এখানে এলে হয়তো ভাবতে শুরু করত, কি করে কম ফলিয়ে ফলন স্বাভাবিক রাখা যায়। এত বেশি ফলে, ঠেকিয়ে রাখা যায় না। রাতারাতি বেড়ে যায় ঘাসের জঙ্গল। রোজ নিড়ানি লাগে। বিশ্বাস করবে? এক রাতে এক ফুট বেড়ে যায় বাঁশের কোঁড়। ইউনাইটেড স্টেটসে শস্যের যে চারা বড় হতে দুই-তিন হপ্তা লাগে, এখানে লাগে বড় জোর তিন দিন। আর দেখো, কমলার সাইজ দেখো।'

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। পাকেনি এখনও। এখনই ফুটবলের সমান একেকটা, এত ধরেছে, পাতা দেখা যায় না। 'এগুলো কমলা!'

'কমলা। এখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চাষের চেষ্টা হচ্ছে। ফলছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই এত বড় করতে পারছে না। এর তিন ভাগের এক ভাগ বড় হয় ওগুলো।'

ফল গাছেরও অভাব নেই। আম, অ্যাভোকাডো, কোকা, রুটিফল গাছে ধরে আছে রাশি রাশি ফল। কলার ঝাড়ের প্রায় প্রতিটি গাছেই কলা। খানিকটা খোলা জায়গায় ঘন সবুজ হাতিঘাস, তারপরে শুরু হয়েছে মূল্যবান গাছের জঙ্গল। লোহাকাঠ, মেহগনি, সিডার ও রবার গাছের সীমা-সংখ্যা নেই। আট-দশতলা বাড়ির সমান উঁচু ব্রাজিল-বাদাম আর মাখন-বাদাম গাছে যে কত বাদাম ধরেছে, আন্দাজ করা মুশকিল। আর আছে ছড়ানো বিশাল ডুমুর গাছ। আরও কিছু গাছ আছে, যেগুলো থেকে তেল বের করা যায়, সেই তেল কারখানার কাজে লাগে।

'ইদানীং ইউনাইটেড স্টেটস আগ্রহ দেখাচ্ছে আমাজনের দিকে,' বলল ল্যানসো। 'আমাজন ইনস্টিটিউট গড়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ডজন ডজন বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছে আমাজন বেসিনে গবেষণা চালানোর জন্যে। কয়েকজন আমার ফার্ম দেখে গেছে। উৎসাহ দিয়ে গেছে ওরা।'

ল্যানসোর হাত ধরল কিশোর। 'আমাকে মাপ করবেন, স্যার, আপনাকে চলে যেতে বলেছি বলে। এখন আমারই থাকতে ইচ্ছে করছে। চলি, গুড বাই।'

বজরা-বহরে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। নৌকা ভাসাল।

বুয়েনো ল্যানসোর অজান্তে তার গান-র‍্যাকে একটা রিভলভার, আর ·২৭০-উইনচেস্টার রাইফেলটা রেখে দিয়ে এসেছে কিশোর। কয়েক বাক্স গুলি আর কিছু কাপড়-চোপড়ও রেখে এসেছে। বিছানার ওপর মানিব্যাগটা পাবে ল্যানসো, তবে এখন আর সেটা খালি নয়, তাতে কিছু ডলার রয়েছে।

দিয়েছে যতটা, এনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি—অসাধারণ ওই শিক্ষকের দুর্জয় সাহস আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের খানিকটা, যা ছাড়া টিকতে পারবে না এই ভয়াবহ আমাজনে।

ছয়

দিন যায়, ভ্যাম্পের আর কোন সাড়া নেই। কিন্তু কিশোর জানে, তাদের আগে আগে চলেছে ডাকাতের দল। এখনও হয়তো বুঝতে পারেনি, যাদেরকে খুঁজছে, তারা রয়েছে পেছনে। যেই বুঝবে, পথে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে। বজরা-বহর কাছাকাছি হলেই দখলের চেষ্টা চালাবে।

রোজই কিছু না কিছু নতুন যাত্রী যোগ হচ্ছে বজরা-বহরে। একটা টকটকে লাল আইবিস পাখি, একটা গোলাপী স্পুনবিল, একটা সোনালি কনিউর, একটা কিউরেসো আর একটা কক অভ দা রক ধরল। সব কটাই পোষ মানল।

জানোয়ার ধরার নেশায় পেয়েছে কিশোরকে। এত ধরেও কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

'আসল দুটোকেই ধরতে পারলাম না এখনও,' একদিন বলল সে। 'অ্যানাকোণ্ডা আর টিগ্রে। মিরাটো, কিভাবে ধরি, বলো তো?'

তরুণ ইনডিয়ানের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে তিন গোয়েন্দার। পছন্দ করেছে তাকে। সে-ও পছন্দ করেছে ওদেরকে। অবসর সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টলডোর ছাতে বসে গোয়েন্দাদের লিঙগুয়া জেরাল (জেনারেল ল্যাংগোয়েজ) শেখায় সে। আমাজনে প্রতিটি ইনডিয়ান গোত্রেরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এছাড়া একটা সাধারণ ভাষা চালু আছে, যেটা আমাজন বেসিনের [illegible]াই জানে, এখানকার 'ইনটারন্যাশ-নাল' ভাষা বলা চলে। বাইরের যারা ওখানে বেড়াতে কিংবা থাকতে যায়, ওই ভাষা শেখা তাদের জন্যে অতি জরুরী। কারণ বেশিরভাগ ইনডিয়ানই পর্তুগীজ জানে না, আর ইংরেজি প্রায় কেউই জানে না।

'শিগ্রি *এল-টিগ্রের* দেখা পাবে,' বলল মিরাটো। 'বাঘের রাজ্যে চলে এসেছি।'

'এল-টিগ্রে কিংবা জাগুয়ারের চেয়ে বাঘ বলাটাই সহজ। তাই না?' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বাঘই তো ওটা।'

'বাঘের সঙ্গে আবার কুস্তি করতে যেয়ো না,' হেসে মুসাকে বলল রবিন। 'সাপ

আর পিঁপড়েখেকো মনে কোরো না টিগ্রেকে। এক থাবায় টারজানগিরি খতম করে দেবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'ভীষণ একরোখা। হার্টে গুলি খেয়েও নাকি থামে না, শিকারীর দিকে তেড়ে আসে। সহজে দম বেরোতে চায় না।'

ঠিকই বলেছে মিরাটো, বাঘের রাজ্যে ঢুকেছে ওরা। রাতে প্রায়ই শোনা যায় গর্জন। কাছ থেকে ভয়ঙ্কর শোনায়। বাতাসে কাঁপন তোলে সে-শব্দ, সেই সঙ্গে বুকের ভেতরেও।

একদিন রাতে দেখা দিল টিগ্রে।

হ্যামকে শুয়ে আছে কিশোর, মুখ ফিরাতেই দেখে বাঘ। বিশ ফুট দূরে। তাকে দেখতে পায়নি বাঘটা, আগুনের কুণ্ডের দিকে চেয়ে আছে কৌতূহলী চোখে। বড় বড় হলুদ চোখ দুটো আগুনের মতই জ্বলছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেড়ালের মত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, বেড়ালের মতই হাঁ করে জিভ বের করে হাই তুলল।

বাঘের এই হঠাৎ আগমন আশা করেনি কিশোর। খাঁচা রেডি হয়নি, জাল তৈরি নেই, লোকজন সব ঘুমাচ্ছে; কেউ নৌকায়, কেউ তার কাছাকাছি—হ্যামকে কিংবা মাটিতে।

ওদের ডাকতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে বাঘটা।

কিশোরের পাশে রাখা আছে বন্দুক, কিন্তু এত সুন্দর জীবটাকে গুলি করতে চায় না সে। বিশ ফুট দূরে বাঘ শুয়ে আছে, ঘুমাতেও পারবে না। খুব তাড়াতাড়ি বাঘটারও নড়ার ইচ্ছে নেই, বোঝা যায়।

আগুনে কাঠ ফেলতে উঠল একজন ইনডিয়ান।

ঝট করে উঠে বসল বাঘ।

বন্দুকে হাত চলে গেল কিশোরের। কিন্তু তেমন বিপদে না পড়লে গুলি করবে না। একে তো এই হ্যামকে থেকে নিশানা ঠিক রাখতে পারবে না, তার ওপর এক গুলি খেয়ে হয়তো কিছুই হবে না বাঘের, মাঝখান থেকে শান্ত বেড়ালটা উন্মত্ত শয়তান হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এখন তো দেখে শান্ত বেড়ালই মনে হচ্ছে ওটাকে। কিশোর জানে, সব জানোয়ারই মানুষকে এড়িয়ে চলে। নিতান্ত বাধ্য কিংবা কোণঠাসা না হলে সহজে আক্রমণ করে না। জাগুয়ারও করে না। কিন্তু মানুষখেকো হলে আলাদা কথা।

ঘুমের ঘোরে কাঠ ফেলছে লোকটা। কাছে বসে আছে ভয়ঙ্কর এক জীব, তাকে লক্ষ্য করছে, খেয়ালই নেই তার।

ঘামছে কিশোর। বন্দুকে হাত। এমন করে তাকিয়ে আছে কেন বাঘটা? মানুষখেকো?

কাজ শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল লোকটা।

বাঘটা শুয়ে পড়ল না। না, মানুষখেকো বোধহয় না। লোকটা নড়াচড়া করাতে সতর্ক হয়েছিল।

হাঁপ ছাড়ল কিশোর।

হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে তাপিরের তীক্ষ্ণ নাকি ডাক শোনা গেল। চকিতে সেদিকে ঘুরে গেল হলুদ-কালো বিশাল মাথাটা। নিঃশব্দে উঠে ঝোপের ভেতরে হারিয়ে গেল বাঘ।

অপেক্ষা করছে কিশোর।

এক সঙ্গে হুইসেল বাজল এবং বাজ পড়ল যেন বনের ভেতরে। তাপিরের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, আর বাঘের ভীষণ গর্জন। কয়েক সেকেণ্ড হুটোপুটির পর থেমে গেল সব শব্দ।

ক্যাম্পের সবাই জেগে গেছে।

'বাঘে ধরল না!' হ্যামক থেকে ভেসে এল মুসার কম্পিত কণ্ঠ।

'ভাগ্যিস আগুন জ্বলছে!' বলল রবিন।

হ্যামকে থেকেই জানাল কিশোর, কি হয়েছে।

এরপর আবার ঘুমাতে দেরি হলো সকলেরই।

সকালে নাস্তা সেরে বেরোল অভিযাত্রীরা। বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগোল।

স্যুপ-প্লেটের সমান বড় একেকটা ছাপ, গোল। পিরিচের কিনারে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু নখের দাগ নেই। হাঁটার সময় নখ ভেতরে লুকিয়ে রাখে জাগুয়ার, বেড়ালের মত।

'দেখে মনে হয়,' মুসা বলল, 'পায়ে মখমলের প্যাড লাগানো।'

'ওই প্যাড লাগানো থাবারই থাপ্পড় খেয়ে বড় বড় ষাঁড়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়,' মিরাটো বলল।

আগে আগে হাঁটছে সে। সে না থাকলে এই ছাপ অনুসরণ করে এগোতে পারত না তিন গোয়েন্দা, বুঝতই না কিছু।

তাপিরকে যেখানে আক্রমণ করেছে বাঘটা, সে-জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ওরা। ঝড় বয়ে গেছে যেন। ঝোপের ডাল ভাঙা, লতা ছেঁড়া, পাতা ছেঁড়া, খানিকটা জায়গার ঘাস দলে-মুচড়ে রয়েছে। রক্ত লেগে আছে।

কিশোর আশা করেছিল, তাপিরের মড়ির অবশিষ্টটা দেখতে পাবে। হতাশ হলো। কিছুই নেই। তারমানে জাগুয়ার আর ফিরে আসবে না এখানে। শিকার কাহিনীতে পড়েছে, মড়ির কিছু হাড়গোড় বাকি থাকলেও খাওয়ার জন্যে ফিরে আসে বাঘ। কাছাকাছি ওত পেতে থাকে তখন শিকারী। ফাঁদ পেতে জানোয়ারটাকে ধরে, কিংবা গুলি করে মারে। ধরার আশায়ই দলবল নিয়ে এসেছে কিশোর, লাভ হলো না।

'দেখো,' হাত তুলল রবিন। 'নিশ্চয় ইনডিয়ানরা গেছে।'

'ইনডিয়ান না,' মিরাটো মাথা নাড়ল। 'বাঘ।'

'এত চওড়া! কটা বাঘ গেছে?'

'একটাই,' মুচকি হাসল মিরাটো। 'তাপির টেনে নিয়ে গেছে।'

অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ঝোপের মাঝে তিন-চার ফুট চওড়া একটা পথ করে রেখেছে, রোলার চালানো হয়েছে যেন ওখান দিয়ে।

'এত ভারিটাকে টেনে নিল?' চোখের সামনে দেখছে আলামত, তবু মুসার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওই পথ ধরে এগোল ওরা। সাবধানে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছে। যে কোন মুহূর্তে মড়ির সামনে পড়তে পারে, হয়তো বা বাঘেরও।

কিন্তু শেষ আর হতে চায় না পথ। মাইলখানেক পেরিয়ে নদীর পাড়ে এসে পড়ল ওরা। চিহ্ন শেষ।

ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। নদীটা কয়েক মাইল চওড়া।

'ওই নদী পেরিয়েছে!' গালে আঙুল রাখল রবিন।

'পেরোলে অবাক হব না,' মিরাটো বলল। 'এর চেয়ে বেশি ভার নিয়ে সাঁতরে নদী পেরোতে দেখেছি টিগ্রেকে। তবে মনে হয়, এই বাঘটা তা করেনি। পানিতে নেমে শিকারকে খানিকদূর টেনে নিয়ে গিয়ে এপাড়েই আবার কোথাও উঠেছে। এদিকেও হতে পারে, ওদিকেও। হয়তো তার বৌ-বাচ্চা আছে, তাদেরকে নিয়ে খাবে।'

এ-রকম ঘটনার কথা কিশোর পড়েছে। ঘোড়া মেরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে জাগুয়ারকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন একজন বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান শিকারী জেনারেল রনডন। শিকারীর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে নদীতে নেমে কিনারের পানি দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খানিক দূর, যাতে চিহ্ন না থাকে। তারপর আবার উঠে পানির ধারে একটা ঘন ঝোপে লুকিয়েছে ঘোড়াটাকে।

তাপির নিয়ে যেখানে নদীতে নেমেছে জাগুয়ার তার আশেপাশে কিছুদূর খোঁজাখুঁজি করল মিরাটো। কিন্তু আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিড়বিড় করল, 'নদীর ওপারেই চলে গেল নাকি?'

ক্যাম্পে ফেরার পথে জাগুয়ারের ক্ষমতার আরও নজির দেখা গেল। মাটি থেকে ছয়-সাত ফুট উঁচুতে বিশাল এক গাছের বাকল ফালাফালা। মিরাটো জানাল, ওখানে নখ ধার করেছে টিগ্রে। নখের আঁচড়ের কয়েক ফুট নিচে খসখসে বাকল মসৃণ হয়ে গেছে। জানোয়ারটার পেটের ঘষায় হয়েছে ওরকম।

সাত

নৌকা চলেছে।

বড় বজরার গলুইয়ের কাছে বসে আছে রবিন। হঠাৎ হাত তুলল সে। কি ব্যাপার? দেখতে এল অন্য দুই গোয়েন্দা।

ইশারায় দেখাল রবিন।

নদীর পাড়ে এক জায়গার ঝোপঝাড় সামান্য ফাঁকা। একটা মরা গাছ পানিতে

পড়ে আছে। তার ওপর বসে আছে একটা জাগুয়ার। মুখ আরেক দিকে ফেরানো, মাছ ধরায় ব্যস্ত সে।

লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারছে, পানিতে ফল কিংবা বড় পোকা পড়লে যেমন হয়, তেমনি আওয়াজ করছে।

হঠাৎ থাবা মারল জাগুয়ার। পানির ওপরে তুলতেই দেখা গেল নখে গেঁথে ছটফট করছে একটা মাছ।

আরাম করে চিবিয়ে মাছটাকে খেলো সে। আবার লেজ নামাতে গিয়ে কি মনে করে মুখ ফেরাল। অলস ভঙ্গিতে দেখল নৌকা আর যাত্রীদের। মনে মনে বোধহয় বলল, নাহ্, আর হবে না। গেল আমার মাছ ধরা। আস্তে করে উঠে গাছ থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। আরেকবার নৌকার দিকে চেয়ে, রাজকীয় চালে হেলেদুলে হেঁটে ঢুকে গেল বনে।

দাঁত বের করে হাসছে মিরাটো। 'খুব চালাক,' এমনভাবে বলল, যেন ওটা তার পোষা বাঘ।

'কাণ্ডটা করল কি!' রবিনের দিকে ফিরল মুসা। 'নথি তোমার বই কি বলে? সত্যি লেজের বাড়ি দিয়ে মাছ ডেকে আনল?'

'নিজের চোখেই তো দেখলাম,' রবিন বলল। 'অবিশ্বাস করি কি করে? দাঁড়াও, আসছি।' টলডোর ভেতরে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল। 'নেচারালিস্ট ওয়ালেসের লেখা।' বইয়ের পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামল। 'এই যে, লিখেছেন ঃ ব্রাজিলের জঙ্গলের সব চেয়ে ধূর্ত জীব জাগুয়ার। যে কোন পাখি কিংবা জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। ডেকে কাছে নিয়ে আসে। তারপর ধরে ধরে খায়। মাছ ধরে অদ্ভুত কৌশলে। লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারে। ফল কিংবা পোকা পড়েছে ভেবে ওপরে উঠে আসে মাছ, ধরে ফেলে তখন জাগুয়ার। কাছিমও ধরতে পারে। শুধু তাই না, পানিতে কাউফিশকেও আক্রমণ করে বসে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছে, একটা কাউফিশকে মেরে ফেলতেও নাকি দেখেছে সে। গরুর ওজনের প্রাণীটাকে সহজেই টেনে তুলেছে ডাঙায়।'

'খাইছে!' কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'ওই জীবকে ধরতে চাও? পাগল!'

আগ্রহ দেখাল জিবা, 'সিনর কি টিগ্রে ধরতে চাও?'

'হ্যাঁ,' কিশোর আশা করল, জিবা তাকে সাহায্য করতে চায়।

'কিন্তু টিগ্রে তো ধরতে পারবে না।'

'কেন?'

'বিশ-তিরিশজন দরকার। আমরা আছি নয়জন, তা-ও তিনজন…' মুসার ওপর চোখ পড়তে শুধরে নিল, 'দু-জন ছেলেমানুষ।'

ভুল বলেনি জিবা, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর। কিন্তু যে যা-ই বলুক, টিগ্রে না ধরে ছাড়বে না সে। গায়ের জোরে না পারলে বুদ্ধির জোরে ধরবে।

দুপুরে নৌকা তীরে ভেড়ানোর নির্দেশ দিল সে। খাওয়া সেরে নিয়ে কাজে

লাগিয়ে দিল লোকজনকে। জিবা প্রতিবাদ জানালে বলল, 'দেখো, বাঘ না ধরে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে। যত দিন লাগে লাগুক।'

সোজা, শক্ত দেখে বাঁশ কাটা হলো। সেগুলোকে কাঁচা লিয়ানা লতা দিয়ে বেঁধে মজবুত খাঁচা তৈরি হলো। একটামাত্র দরজা রাখা হলো খাঁচার।

ইচ্ছে করেই ছোট রেখেছে খাঁচাটা কিশোর। যাতে ভেতরে ঢুকে নড়াচড়ার বিশেষ জায়গা না পায় বাঘ, তাহলে ভাঙতে পারবে না। চার ফুট উঁচু আর চার ফুট পাশে, লম্বা দশ ফুট।

নদীতে কোন্ পথে পানি খেতে যায় বাঘ, খুঁজে বের করল মিরাটো।

পথের ওপর একটা গর্ত খুঁজতে বলল কিশোর, সবার সঙ্গে সে-ও হাত লাগাল। জিবাকে দিয়ে কোন কাজই করানো যাচ্ছে না। একটা গাছের তলে বসে বকবক করছে আপনমনে।

গর্ত খোঁড়া শেষ হলো। ছয় ফুট গভীর, ব্যাসও প্রায় ছয় ফুট। কয়েকটা বাঁশ কেটে টুকরো করে বিছানো হলো গর্তের ওপরে। লতাপাতা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হলো, যাতে গর্ত আছে বোঝা না যায়। মোটা দড়ির ফাঁস বানিয়ে তার ওপর রাখল কিশোর, সেটাকেও ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা হলো। গর্তের প্রায় ওপরে এসে ঝুঁকেছে বিশাল এক ডুমুর গাছের ডাল। দড়ির আরেক মাথা ওই ডালে বেঁধে দিল সে। বাঘ এসে গর্তে পড়লে ওই ফাঁসের মধ্যখান দিয়ে পড়বে, আটকে যাবে।

খাঁচাটা এনে রাখা হলো গর্তের কাছে, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে। বাঘ ধরা পড়লেই যাতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ঢোকানো যায় খাঁচায়।

'কোন কাজ হবে না,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জিবা।

কান দিল না কেউ।

ক্যাম্পে ফিরে অপেক্ষায় রইল সবাই।

দিন শেষ। রাতের শুরুতেই গর্তের কাছে চেঁচামেচি শোনা গেল। গিয়ে দেখা গেল, বাঘ নয়, ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ তাপির। হতাশ হলো কিশোর। একটা আছে, আরেকটা নিয়ে কি করবে? নৌকায় জায়গাও নেই। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

ভারি জানোয়ারটাকে টেনে তুলে ফাঁসমুক্ত করে গর্তের মুখে আবার লতাপাতা বিছাতে, ফাঁস পাততে, দুই ঘণ্টা লেগে গেল। অযথা সময় নষ্ট আর পরিশ্রম।

আবার ফিরে এল ওরা ক্যাম্পে। আবার অপেক্ষার পালা। সময় যাচ্ছে। বাঘের সাড়াশব্দ নেই।

'মিরাটো,' কিশোর বলল। 'বাঘ তো নেই মনে হচ্ছে। অন্য জানোয়ার এসে খামোকা ঝামেলা করবে। কি করি?'

'বাঘকে ডেকে আনতে হবে,' শান্তকণ্ঠে বলল মিরাটো।

কিশোর, রবিন এমনকি মুসাও জানে কাজটা অসম্ভব নয়। ভারতের জঙ্গলে আসল বাঘকেও ডেকে এনে গুলি করে মেরেছেন জিম করবেট আর কেনেথ

অ্যাণ্ডারসনের মত শিকারীরা। করবেট চিতাবাঘকেও ডেকে এনেছেন। কিশোর জানে, উত্তর আমেরিকার মুজ হরিণকেও ডেকে আনা যায়। আনে শিকারীরা।

পোঁটলা থেকে একটা শিঙ্গা বের করল মিরাটো। রওনা হলো গর্তের দিকে। সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা।

গর্তের কাছ থেকে খানিক দূরে নদীর দিকে পেছন করে পথের পাশে ঝোপে ঢুকল মিরাটো। তার পাশে বসল তিন কিশোর।

শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো। নিখুঁত জাগুয়ারের ডাক, কাশি দিয়ে শুরু হলো, ভারি গর্জন শেষ হলো কয়েকবার খোঁত খোঁত করে।

স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বন, নিমেষে চুপ হয়ে গেল সমস্ত ডাকাডাকি। ভয়ে অবশ হয়ে গেছে যেন সব। কিন্তু বাঘ সাড়া দিল না।

'ধারেকাছে নেই,' নিচুকণ্ঠে বলল কিশোর।

খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে সারা রাতই ডাকল মিরাটো।

ভোরের একটু আগে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে ওরা, এই সময় শোনা গেল কাশি। নদীর অন্য পাড়ে।

জায়গা বদলাল চারজনে। গর্তের উল্টো ধারে আরেকটা ঝোপের ভেতরে ঢুকল, মুখ এখন নদীর দিকে। আলো ফুটছে। কালো নদীর পানি ধূসর হয়েছে, কিন্তু বনের তলায় আগের মতই অন্ধকার।

ডাকল আবার মিরাটো। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। আবার ডাক। আবার জবাব। এগিয়ে আসছে বাঘ। আর মাইলখানেক দূরেও হবে না।

খানিকক্ষণ আর সাড়া নেই। হঠাৎ যেন একেবারে কানের কাছে বাজ পড়ল। নদী পেরিয়ে এসেছে জাগুয়ার। আর ডাকার সাহস হলো না মিরাটোর। চুপ করে রইল।

আরও কাছে বাজ পড়ল আরেকবার।

উত্তেজনায়, ভয়ে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে যেন ওরা। ঝোপের দিকে চেয়ে আছে। তাই জানোয়ারটাকে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড গর্জনে চমকে উঠল। ঝড় উঠল যেন গর্তের মধ্যে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'পড়েছে! পড়েছে!'

গর্তের কাছে দৌড়ে এল ওরা। চেঁচামেচি শুনে ক্যাম্প থেকে ইনডিয়ানরাও ছুটে এল।

ঘূর্ণিঝড় বইছে যেন গর্তের ভেতরে। পাতা, লতা আর ধুলো উড়ছে। মাঝে মাঝে কালো-হলুদ রঙের ঝিলিক।

গর্তের বেশি কাছে যাওয়ার সাহস নেই কারও।

সবাই খুশি, জিবা ছাড়া। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে ডুমুর গাছটার গোড়ায়।

টানটান হয়ে গেছে দড়ি, ডালটা যেন তুফানে দুলছে। নুয়ে যাচ্ছে বার বার,

ঝটকা দিয়ে সোজা হচ্ছে। বোঝা গেল, ফাঁসে আটকেছে বাঘ।

ফাঁদে তো পড়ল, এখন আসল কাজটা বাকি। বাঘকে খাঁচায় পোরা। কি করে ঢোকাবে? গর্জনের দাপটেই বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে সবার।

খাঁচাটা গর্তের একেবারে কিনারে নিয়ে যেতে বলল কিশোর। গাছে চড়ে ডাল থেকে দড়িটা খুলে আনল। তারপর খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে দড়ির মাথা ঢুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বের করল। এখন সবাই মিলে টানলে উঠে আসবে বাঘ, দরজা দিয়ে ঢুকতে বাধ্য হবে। শুনতে খুব সহজ, কিন্তু যারা করছে, তারা বুঝতে পারছে কাজটা কতখানি কঠিন।

খাঁচার পেছনে ঝোপে লুকিয়ে দড়ি ধরে টান দিল সবাই, জিবা বাদে। সে এসবে নেই, সাফ মানা করে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে ছিল, এখন বসে পড়েছে ডুমুর গাছের গোড়ায়। কাজ তো করছেই না, টিটকারি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে ইনডিয়ানদের। ধমক দিয়েও চুপ করানো যাচ্ছে না তাকে।

চমৎকার ফন্দি করেছে কিশোর। উঠে এল জাগুয়ার। খাঁচার দরজায় মাথা ঢোকাল, আরেকটু হলেই ঢুকে যাবে শরীরটা। যারা টানছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মুখ ঘোরাতেই চোখ পড়ল জিবার ওপর।

আর যায় কোথায়? ধরেই নিল, সমস্ত শয়তানীর মূলে ওই দু-পেয়ে জীবটা। জ্বলে উঠল হলুদ চোখ। ভয়ঙ্কর গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল দড়িতে।

এতগুলো লোক মিলেও আর ধরে রাখতে পারল না, সরসর করে বেরিয়ে গেল দড়ি, ঘষা লেগে তাদের হাতের চামড়া ছিলল।

আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গাছে উঠতে শুরু করল জিবা।

মাথা ঠাণ্ডা থাকলে হয়তো এই ভুল করত না। কারণ, তার জানা আছে জাগুয়ার গাছেও চড়তে পারে।

'গুলি করো! গুলি করো!' চেঁচাচ্ছে জিবা।

মুসার রাইফেল আর কিশোরের বন্দুক সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু গুলি করল না কেউ। এত কষ্ট করে ডেকে এনে ধরার পর মারতে চায় না বাঘটাকে।

ওপরে উঠে চলেছে জিবা। ভাবছে উঁচুতে সরু ডাল, ভেঙে পড়ার ভয়ে ওখানে উঠবে না বাঘ। তা-ই হয়তো করত, কিন্তু জিবার কপাল খারাপ, সে নিজেই যেতে পারল না ওখানে। ঘন পাতার আড়ালে রয়েছে বোলতার বাসা, না দেখে হাত দিয়ে বসল তাতে।

আর যায় কোথায়। কার এত্তবড় সাহস! বোলতার বাসায় হাত দেয়! রাগে বনবন করে উঠল ওগুলো। চোখের পলকে এসে ছেঁকে ধরল জিবাকে। বিচার-আচার-শুনানীর বালাই নেই, শরীরের যেখানে খোলা পেল সেখানেই হুল ফুটিয়ে দিল।

'বাবাগো! মাগো!' বলে চেঁচিয়েও রেহাই পেল না মিরাটো।

ওদিকে উঠে আসছে জাগুয়ার। বেয়াড়াপনা আজ ঘুচিয়েই ছাড়বে তার।

নিচ থেকে দেখছে দর্শকরা। গাছের বাকলে নখ বিঁধিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে যাচ্ছে বাঘটা। শরীর লম্বা করে মিশিয়ে ফেলেছে ডালের সঙ্গে, অপূর্ব সুন্দর একটা কালো-হলুদ মোটা সাপ যেন।

কিন্তু জাগুয়ারের হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে কোন সৌন্দর্য দেখতে পেল না জিবা। তার মনে হলো, নরকের ইবলিসের দুটো চোখ, হাঁ করা চোয়ালে ধারাল দাঁতগুলো শয়তানের দাঁত। মুহূর্ত পরেই তাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। চেঁচিয়ে বন কাঁপাচ্ছে না আর বাঘ, গম্ভীর গোঁ গোঁ করছে কেবল। জিবার মনে হলো, ব্যাটা হাসছে! বাগে পেয়ে বেড়াল যেমন ইঁদুরকে খেলায়, টিগ্রে বদমাশটাও তা-ই করছে!

হা-হা করে হাসতে ইচ্ছে করছে মুসার। জাগুয়ারের ভয়ে পারছে না। যদি শব্দ শুনে তাদের দিকে নজর দেয় আবার? জিবার শাস্তিতে খুব খুশি সে। উচিত শিক্ষা হয়েছে বেয়াদবটার। গুলি সে অবশ্যই করবে জাগুয়ারকে, তবে শেষ মুহূর্তে। যখন দেখবে জিবার ঘাড় ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। ততক্ষণ চালিয়ে যাক বোলতারা।

কিন্তু কিশোর আর চুপ থাকল না। জাগুয়ারের গলায় আটকে আছে এখনও ফাঁস, দড়ির আরেক মাথা ঝুলছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মাথাটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল সে।

পাগলের মত দুই হাতে বোলতা তাড়াচ্ছে জিবা।

আরও কয়েক ইঞ্চি উঠে দড়িতে টান পড়ল। হঠাৎ বাধা পেয়ে রেগে গেল আবার জাগুয়ার, প্রচণ্ড গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল। টানাটানি আর ঘষাঘষিতে দড়ির একটা জায়গা নরম হয়ে গেছে, পট করে গেল ছিঁড়ে।

এবার ভয় পেল কিশোর।

হাসি উধাও হয়ে গেল মুসার মুখ থেকে।

রবিন হতবাক।

ইনডিয়ানরা বোবা।

আর বুঝি বাঁচানো গেল না জিবাকে!

বিপদটা জিবাও বুঝতে পেরেছে। কেঁদে ফেলল সে। বোলতার পরোয়া আর করল না, উঠে যেতে লাগল ওপরে। হুলের যন্ত্রণা এক সময় কমবে, কিন্তু জাগুয়ারে ধরলে নির্ঘাত মৃত্যু।

জাগুয়ারটা নাছোড়বান্দা। উঠে যাচ্ছে।

হাতের টিপ ভাল না কিশোরের, বন্দুকের গুলি বাঘের গায়ে না লেগে যদি জিবার গায়ে লাগে?—এই ভয়ে ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না।

কিন্তু মুসা আর দেরি করল না। রাইফেল তুলে গুলি করেই সরে গেল।

এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিবা, মনে হলো গুলিটা সে-ই খেয়েছে।

গর্জে উঠল জাগুয়ার। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। নতুন শত্রুদের দেখে আরেকবার গর্জন করে লাফ দিল পনেরো ফুট ওপর থেকে। চোখের পলকে এসে পড়ল মুহূর্ত

আগে মুসা যেখানে ছিল সেখানে।

জাগুয়ারের একেবারে গায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করল কিশোর।

কাত হয়ে পড়ে গেল জীবটা। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। যেন কিছুই হয়নি।

আবার গুলি করল মুসা। তাড়াহুড়োয় মিস করল।

গুলি করল কিশোর। পড়ে গিয়ে আবার উঠল জাগুয়ার। মুখে রক্ত। গর্জাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে নাক দিয়ে রক্তের ছিটে বেরোচ্ছে, মুখের কষেও রক্ত। কিন্তু থামল না। শাঁই শাঁই দুই থাবা চালাতে চালাতে ছুটে এল। মস্ত হাঁ, রক্তে মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় বিকট দেখাচ্ছে।

বন্দুকের দুটো নলই খালি। বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর।

গুলির পর গুলি করে চলেছে মুসা। কিন্তু বাঘের গায়ে লাগছে বলে মনে হলো না।

আর কিছু না পেয়ে একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে ধাঁ করে বাঘের পিঠে বসিয়ে দিল রবিন। ঘুরে তাকে ধরতে গেল জানোয়ারটা।

ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল ইনডিয়ানরা। কিন্তু মিরাটো গেল না। বল্লম নিয়ে সাহায্য করতে এগোল তিন গোয়েন্দাকে। ইনডিয়ানদের বাঘ মারার বিশেষ বল্লম, দুই দিকেই ফলা।

ভয়ানক গর্জন করে, মুখ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছিটিয়ে নতুন শত্রুকে সই করে লাফ দিল বাঘ। শাঁ করে পাশে সরে বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুক ছেঁদা করে ঢুকে গেল চোখা ফলা।

তাতেও থামল না দানব। ঝাড়া দিয়ে বুক থেকে বল্লম খুলে ফেলে আবার লাফ দিল।

আবার বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুকে আবার গাঁথল বল্লম। বল্লমের আরেক ফলা মাটিতে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল সে, লাফিয়ে সরে এল।

চাপে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল বল্লম। কিন্তু খুলল না। সোজা হলো, বাঘের পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। এবার কাবু হয়ে এল জাগুয়ার, কিন্তু থামল না। মিরাটোর গলা সই করে লাফ দিল, ধরতে পারলে এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে কণ্ঠনালী।

সরে গেল মিরাটো।

বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে বল্লম, নড়াচড়া আর বেশি করতে পারছে না জাগুয়ার। থাবা আটকে যাচ্ছে, বল্লমের জন্যে নড়াতে পারছে না।

বন্দুকে গুলি ভরে ফেলেছে আবার কিশোর। বাঘের হৃৎপিণ্ড সই করে গুলি করল।

পড়ে গেল জাগুয়ার। তবু থামল না। এগোনোর চেষ্টা করল।

মাথায় গুলি করল মুসা।

এইবার শেষ হলো। লুটিয়ে পড়ল বাঘ।

কিন্তু জয়ের আনন্দে হাসতে পারল না কিশোর। তার মনে হলো, পরাজয়ই হয়েছে তাদের। জাগুয়ারকে জ্যান্ত ধরতে পারেনি।

আট

ইনডিয়ানরা জাগুয়ারের মাংসও খেলো। মুসা এক টুকরো মুখে দিয়েই ফেলে দিল। কেমন শক্ত শক্ত রবারের মত, দাঁত দিয়ে কাটতে কষ্ট হয়, বাজে স্বাদ। ইনডিয়ানরাও ভাল বলছে না, তবু খাচ্ছে। ওদের বিশ্বাস, এই মাংস খেলে জাগুয়ারের মতই সাহসী আর শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সেদিন রাতে গর্তের ওপর আবার ফাঁস পেতে রাখা হলো।

কিন্তু জাগুয়ার এল না।

'ঠিক আছে,' পরদিন সকালে বলল কিশোর, 'বাঘ না এলে আমরাই বাঘের কাছে যাব।'

বেরিয়ে পড়ল সবাই।

বনের ভেতরে জাগুয়ারের পায়ের তাজা দাগ খুঁজে বের করল মিরাটো।

অনুসরণ করে চলে এল একটা পাহাড়ের গোড়ায়। একটা গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে ছাপ।

বন্দুক হাতে টিপে টিপে গুহামুখের কাছে পৌছল কিশোর। সাবধানে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই, সাড়া নেই, এমনকি নিঃশ্বাসের শব্দও নেই। মাংশাসী জীবের গায়ের বোঁটকা তীব্র গন্ধ রয়েছে বাতাসে, তারমানে আছে জাগুয়ার। সুড়ঙ্গের অনেক ভেতরে।

সঙ্গে করে শক্ত জাল আনা হয়েছে, ম্যানিলা দড়ি দিয়ে তৈরি। গর্তের মুখে বিছিয়ে দেয়া হলো জাল।

চারপাশে খুঁটি গেঁথে তাতে আটকানো হলো এমনভাবে, উল্টোদিক থেকে যাতে সামান্য গুঁতো লাগলেই খুলে যায়।

জালের চার কোণায় চারটে লূপ রয়েছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো লম্বা মোটা একটা দড়ি। দড়ির দুটো প্রান্তই ঘুরিয়ে আনা হলো একটা গাছের ডালের ওপর দিয়ে।

জাল ঠেলে বেরোনোর চেষ্টা করবে জাগুয়ার। তাতে তার শরীরটা ঢুকে যাবে জালের মধ্যে। দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই তখন জালের চারকোণা এক হয়ে যাবে, আটকা পড়বে জীবটা। শূন্যে টেনে তোলা হবে তখন ওটাকে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না তেজ কমে। তারপর খাঁচা এনে দরজা ওপরের দিকে করে জালসহ তার ভেতর নামিয়ে দেয়া হবে জাগুয়ারটাকে। দরজা বন্ধ করে জাল ছাড়ানোর ব্যবস্থা হবে, সেটা যেভাবেই হোক করা যাবে, পরের কথা পরে। আগে

তো ধরা পড়ুক।

সারাক্ষণই চারজন করে পাহারা রইল দড়ির মাথার কাছে। চার ঘন্টা পর পর পাহারা বদল হলো।

সারাটা দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। জাগুয়ারের দেখা নেই। বেলা ডোবার সময় উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। এই বুঝি নড়ে ওঠে জাল, মাথা দেখা যায়।

দিবাচরদের বাসায় ফেরার সময় হলো, জেগে উঠল নিশাচরেরা। ধীরে ধীরে শুরু হলো তাদের জারিগান, কিন্তু তার সঙ্গে সুর মেলাল না জাগুয়ার।

এতক্ষণ তো ভেতরে থাকার কথা নয়! হতাশ হলো কিশোর। নেই নাকি? না অন্য কোন মুখ আছে সুড়ঙ্গের, সেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গায়ে লাগছে সাঁঝের ফুরফুরে হাওয়া। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। পাখি আর বানরের কিচির-মিচির কমতে কমতে থেমে গেল।

তবু মহারাজের দেখা নেই।

'এভাবে হবে না,' বলল মিরাটো।

'আর তো কোন উপায়ও দেখছি না,' হতাশা ঢাকতে পারল না কিশোর।

'আছে। উপায় আছে। চলো, নৌকায় চলো।'

বসে থাকতে থাকতে কিশোরেরও ভাল লাগছে না, উঠতে পেরে খুশিই হলো। সঙ্গে একজন ইনডিয়ানকে নিল মিরাটো। অন্যেরা বসে রইল দড়ির কাছে, মুসা আর রবিন সেখানেই থাকল। জালও পাহারা দেবে, ইনডিয়ানদেরও। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই, সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়।

ছোট বজরার দড়ি খুলল মিরাটো। দাঁড় বেয়ে চলল দুই ইনডিয়ান। চুপচাপ পাটাতনে বসে রইল কিশোর।

মাঝ নদীতে এসে নৌকা থামাল। দাঁড় রেখে শিঙ্গা মুখে লাগাল মিরাটো।

না হেসে পারল না কিশোর। বাঘের ডাক এত নিখুঁতভাবে বাঘও ডাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

'নদীর পানি কি শান্ত দেখছ,' এক সময় বলল মিরাটো। 'এমন রাতে সাঁতার কাটতে ভালবাসে টিগ্রে। মাছ ধরে। তখনই তাকে ধরতে সুবিধে। পানিতে জোর পায় না।'

বিরতি দিয়ে দিয়ে ডেকে চলল সে।

ঘন্টার পর ঘন্টা পেরোল। নদীর খোলা বাতাসে শীত করছে কিশোরের। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। আগে ভাবত, বাঘ শিকারে সাংঘাতিক উত্তেজনা আর আনন্দ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, বিরক্তকরও বটে। আহ্, হ্যামকে শুয়ে এখন গায়ের ওপর ভারি কম্বল টেনে দিতে পারলে…

'আসছে,' অনেক দূর থেকে যেন কানে এল মিরাটোর কণ্ঠ।

চোখ মেলল কিশোর। তীরের কাছে পানিতে মৃদু ছপছপ শোনা যাচ্ছে, আর কুমিরের কান্নার মত একটা শব্দ।

আবার ডাকল মিরাটো।

জবাব এল। কান্নার সঙ্গে কাশি মেশানো, মুখে পানি ঢোকায় অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজটা।

বাঘ!

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। ঘুম পালিয়েছে। ভাল করে তাকাল। তারার আলোয় আবছামত দেখা যাচ্ছে মাথাটা।

থামল ওটা, বাঘই, কোন সন্দেহ নেই। ছোট। এদিক ওদিক নড়ল, দ্বিধা করছে এগোতে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে, কোনদিকে আছে তার সাথী।

আস্তে আবার শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো।

এগোতে শুরু করল আবার বাঘ।

উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোর। কি করতে চাইছে তরুণ ইনডিয়ান?

নৌকার কিনারে চলে এল বাঘ। মাথাটা, আর লেজের খানিকটা পানির ওপরে, শরীর নিচে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে লেজ চেপে ধরা যায়, এত কাছে।

তা-ই করল মিরাটো। শিঙ্গা রেখে হঠাৎ বাঘের লেজ চেপে ধরল। টেনে তুলে ফেলল ওপর দিকে। ইনডিয়ান লোকটার নাম ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি ছোটো, জলদি।'

পাগলের মত দাঁড় বাইতে লাগল লোকটা।

নৌকা ছুটল। লেজ টেনে বাঘের পেছনের অনেকখানি পানির ওপরে তুলে ফেলেছে মিরাটো। মাথা ডুবে গেছে, তুলতেই পারছে না জানোয়ারটা। শ্বাসও নিতে পারছে না। অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করছে শুধু। লড়াই তো দূরের কথা, বেশিক্ষণ এই অবস্থা চললে দম বন্ধ হয়েই মরবে।

আস্তে আস্তে থেমে গেল বাঘের নড়াচড়া। ভেজা তুলোর বস্তা টেনে নিচ্ছে যেন এখন মিরাটো। দাঁড় বাওয়া থামাতে বলল।

নৌকায় তুলে নেয়া হলো বাঘটাকে। ছোট, বেশি ভারি না। যেটাকে সেদিন মারা হয়েছে, তার তুলনায় বাচ্চা।

জাল এনে তার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো বাঘটাকে। নড়ছেও না। মরে গেল নাকি? সাবধানে বুকে হাত রাখল কিশোর। না, ধুকপুক করছে।

নড়ে উঠল বাঘ।

লাফিয়ে সরে এল কিশোর। 'মিরাটো, জলদি! জাল!'

দ্রুত জালের চার কোণ এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হুঁশ ফিরেছে বাঘের। গোঁ গোঁ করছে আর জালের খোপ দিয়ে পা বের করে থাবা মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, আটকা পড়েছে ভালমত। শূন্যে তুলে জালশুদ্ধ তাকে বাঁধা হলো মাস্তুলের সঙ্গে। ঝুলে থেকে বৃথাই অসহায় তর্জন-গর্জন চালাল টিগ্রে।

'সকালে আরেকটা খাঁচা বানাতে হবে,' বলল কিশোর।

'কেন? খাঁচা তো আছেই?' মিরাটো বলল।

'তা আছে। কিন্তু গুহার মুখে জালও পাতা আছে।' একটা ধরেছে, আরেকটা বাঘ ধরার লোভ ছাড়তে পারছে না কিশোর। বড় একটা।

ভোরের আলো ফুটল। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বাঘ বেরোল না।

ঢুকে দেখবে নাকি?—ভাবল কিশোর। নাহ্, বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। কিন্তু একবার যখন মাথায় ঢুকেছে, কথাটা খোঁচাতে থাকল তাকে। শেষে উঠেই পড়ল। ঢুকবে, তারপর যা হয় হবে। গন্ধ আছে, বাঘ নেই, তাহলে গেল কোথায়? কোন রহস্যের সমাধান না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

সবাই বাধা দিল, ঠেকাতে পারল না। যাবেই সে। একটা বাঁশের টুকরোর মাথায় টর্চ বেঁধে হাতে নিল, আরেক হাতে মুসার বাবার পিস্তল। আশা, বাঘের প্রথম আঘাত আলো আর বাঁশের ওপর দিয়ে যাবে।

জালের এক কোণা তুলে সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কয়েক পা এগিয়েই বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। বাতাসে বাঘের গায়ের গন্ধ তীব্র। মোড় নিতেই চাপা গর্জন কানে এল। হঠাৎ শীত করতে লাগল কিশোরের। বোকামিই করে ফেলেছে!

বাঁশটা নেড়ে এখানে ওখানে আলো ফেলল। কিছুই নেই, শুধু দুটো আলোর গোলক।

আরেকবার গোঁ গোঁ শব্দ।

কিন্তু বাঘ কই? আলো দুটো যদি চোখ হয়, পেছনে তো শরীরটা থাকবে। হলদে-কালো রঙ কই?

টর্চের আলো নড়তেই আবার হলো গর্জন।

কিশোর জানে, কোন জানোয়ারই আক্রান্ত না হলে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে না। এক পা-ও আর এগোল না সে, তাহলে নিজেকে কোণঠাসা ভেবে বসতে পারে জানোয়ারটা। তাড়াহুড়ো করে পিছিয়েও আসা যাবে না। তাহলেও লাফিয়ে এসে পড়তে পারে বাঘ। মোটকথা, এখন কোন ভাবেই চমকে দেয়া যাবে না ওটাকে।

ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। কিশোরের ভয় হলো, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ চমকে দেবে বাঘটাকে।

আলো দুটো দেখা যাচ্ছে।

টর্চ নড়তেই আবার গর্জন। সামান্য আগে বাড়ল আলোদুটো।

এবার দেখল কিশোর। কুচকুচে কালো মুখ। কালো শরীর। বুকের খাঁচায় ধড়াস করে যেন আছাড় খেলো তার হৃৎপিণ্ডটা।

আমাজনের জঙ্গলের মহামূল্যবান সম্পদ, দুর্লভ কালো জাগুয়ার! যে কোন চিড়িয়াখানা লুফে নেবে, অনেক দামে।

পিস্তল উদ্যত রেখেছে কিশোর, কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না, জানে। করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। পিস্তলের গুলি ঠেকাতে পারবে না ওটাকে,

মাঝখান থেকে জানোয়ারটাকেও হারাবে, তার নিজেরও প্রাণ যেতে পারে।

খুব সাবধানে পিছাতে শুরু করল কিশোর। একটা পাথরের সঙ্গে হোঁচট লাগল, উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিল কোনমতে। ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভড়কে গেছে জাগুয়ার। লাফিয়ে এসে পড়ল। থাবার প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল বাঁশটা, টর্চ ভেঙে নিভে গেল।

বাঁশ ফেলে দিয়ে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর। উন্মাদের মত ছুটে এসে পড়ল গুহামুখের জালে। ঠেলার চোটে কোণগুলো ছুটল ঠিকই, সে জড়িয়ে গেল জালে। পেছনে কালো জাগুয়ারের ভীমগর্জন। রাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে লোকজন। তাদের হাতের দড়িতে টান পড়ল। ধরেই নিল তারা, জালে বাঘ পড়েছে। হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল কয়েক ফুট। ভারি লাগছে। শিকার যে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেনে আরও ওপরে তুলে ফেলল জাল।

আড়ালে বসেছে, গুহামুখটা দেখা যায় না। কিন্তু জালটা ওপরে উঠতেই দেখা গেল। সবার আগে দেখতে পেল মুসা। চোখ বড় বড়, হাঁ হয়ে গেল মুখ, কথা ফুটছে না। এ-কি! হেসে উঠল হো হো করে। রবিন হাসল। হেসে ফেলল ইনডিয়ানরাও। হাসির হুল্লোড় উঠল।

শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে বার দুই ধমক দিল জাগুয়ার। আবার ঘরে ঢুকলে দেখাবে মজা, বোধহয় এটাই শাসিয়ে ফিরে গেল সুড়ঙ্গে।

জালে ঝুলছে গোয়েন্দাপ্রধান। মাথা নিচে, ঠ্যাঙ ওপরে, জালের খোপ দিয়ে বেরিয়ে ঝুলছে দুই হাত। এর চেয়ে মজার দৃশ্য আর আছে। হাসতে হাসতে মাটিতে শুয়ে পড়ল মুসা, পেট চেপে ধরে পা ছুঁড়ছে।

রবিনেরও মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়, চোখে পানি এসে গেছে। কিন্তু হাসি থামাতে পারছে না। তাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুসার হাসি, আরও বেশি হাসি আসছে।

'হাসির কি হলো?' ধমক দিল কিশোর, গলায় জোর নেই। 'নামাও। জলদি নামাও…রাখো রাখো, আগে দেখো গুহার মুখে বাঘটা আছে কিনা।'

বাঘ নেই দেখে জাল নামানো হলো। বেরিয়ে এল কিশোর।

'হোওহ্-হোহ্ হা-হা!' হাসি থামছে না মুসার। 'দা গ্রেট টাইগার ম্যান! বাঘ ধরতে গুহায় ঢুকেছে! হা-হা-হা!'

হাসছে রবিন।

'রবিন, ইস্‌সি, কি একখান মওকা গেল!' হাসতে হাসতে বলল মুসা, 'তোমার ক্যামেরাটা থাকলে…ওই ছবি ইস্কুলে ভাড়া দিতে পারতাম…হো হো-হো!'

নয়

আলোচনা-সভা বসল কি করে ধরা যায় কালো জাগুয়ার?

একেকজন একেক কথা বলল।

'ধরতেই হবে ওটাকে,' ঘোষণা করল কিশোর। 'সুন্দরবনের বাঘও এত দামী নয়।'

'কিন্তু কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'গতকাল থেকেই তো চেষ্টা হচ্ছে,' রবিন বলল, 'ফাঁদে তো পা দিল না। ব্যাটা খুব চালাক।'

একটা কথাও বলছে না মিরাটো। একমনে কাজ করে যাচ্ছে চুপচাপ। রুটিফল গাছের রস দিয়ে আঠা তৈরি করছে, খুব ঘন।

ইনডিয়ানরা পাখি ধরতে ব্যবহার করে এই আঠা। যেখানে সব সময় পাখি বসে গাছের সে-ডালে আঠা মাখিয়ে রাখে। বসলে আর উঠতে পারে না পাখি, পা আটকে যায়। ছোটার জন্যে ছটফট করে, পাখায় লাগে আঠা, ডানা জড়িয়ে যায়। উড়তেও পারে না। ধরা পড়ে শিকারীর হাতে।

পাখি ধরার জন্যেই আঠা বানাচ্ছে মিরাটো। দুপুরে পাখির মাংসের রোস্ট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

বানাতে বানাতেই থমকে গেল সে, মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। আঠা দেখিয়ে বলল, 'এ-জিনিস দিয়েই বাঘ ধরব।'

হেসে উঠল কিশোর। 'পাখি আর বানর ধরতে পারবে, তা ঠিক। বাঘ ধরতে পারবে না, অন্তত এই আঠা দিয়ে নয়।'

'বাঘই ধরব,' চ্যালেঞ্জ করে বসল মিরাটো। 'আমার দাদা নাকি একবার ধরেছিল।' সঙ্গী ইনডিয়ানদের সাক্ষি মানল, 'কি মিয়া, ধরেনি? শুনেছ না?'

মাথা নাড়ল ইনডিয়ানরা, শুনেছে।

বিশ্বাস হলো না কিশোরের। তবু মিরাটো যখন বলছে···

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল সে। 'পারলে ধরো। আমার কথা হলো, ধরা চাই। পালিয়ে যেতে দেয়া চলবে না।'

পাখি ধরা চুলোয় গেল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরাটো। উত্তেজিত কথার ফুলঝুরি ছোটাল সঙ্গীদের দিকে চেয়ে। ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল। জোগাড় করে আনল আরও আঠা।

গুহা থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যায়, বাঘ চলাচলের সে-পথটা খুঁজে বের করল। ভালমত দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল, তারপর গুহার কয়েকশো ফুট দূরে ফাঁদ পাতল।

গুহামুখে যে জালটা পাতা হয়েছিল, সেটা খুলে এনে বিছাল বাঘ চলাচলের পথে। পাতা দিয়ে ঢেকে দিল, যাতে দেখা না যায়। তার ওপর পুরু করে ফেলল

আঠা। সেই আঠার ওপর আবার পাতা ছড়িয়ে দিল।

'ব্যস,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মিরাটো। 'এবার শুধু চুপ করে বসে থাকা।'

অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কত আর বসে থাকা যায়? ক্যাম্প থেকে হ্যামকগুলো সরিয়ে আনা হলো ফাঁদের কাছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাছে ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল তাতে তিন গোয়েন্দা। বাকি দিনটা পড়ে পড়ে ঘুমাল।

বাঘ এল না।

রাতে সবাই ঘুমাল, পালা করে পাহারা দিল।

বাঘের পথ, গন্ধে ও-পথে এল না কোন জানোয়ার। বাঘও এল না। ভোরের দিকে ভুল করেই যেন এসে পড়ল ছোট একটা জীব। ইঁদুর গোষ্ঠীর দুই ফুট লম্বা প্রাণী, অ্যাগুটি। আঠার ফাঁদে আটকা পড়ল।

'ধ্যাত্তোর!' বিরক্ত হয়ে হ্যামক থেকে নামতে গেল কিশোর, প্রাণীটাকে ছাড়ানোর জন্যে।

'রাখো, রাখো,' বাধা দিল মিরাটো। 'ভালই হয়েছে। থাক ওটা। ওটার গন্ধেই টিগ্রে আসবে।'

বলতে না বলতেই বাঘের চাপা গর্জন শোনা গেল। ঝট করে ঘুরে তাকাল দু-জনে।

গুহামুখে বাঘের মাথা।

নিকষ কালো। উজ্জ্বল হলুদ চোখ। অল্প ফাঁক হয়ে আছে মুখ, ঝকঝকে ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ইনডিয়ানরা যে বলে : *কালো জাগুয়ার বাঘের মধ্যে সব চেয়ে হিংস্র,* বোধহয় ঠিকই বলে, দেখে তা-ই মনে হচ্ছে কিশোরের।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে বসল বাঘ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেছে গুহার ভেতরে, নিশ্চয় তৃষ্ণা পেয়েছে, নদীতে পানি খেতে যাবে। তার আগে ভালমত দেখে নিচ্ছে আশপাশটা। চলার পথে এখন যে জানোয়ার পড়বে তার কপালে খারাপী আছে।

ঘন বনে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল কিশোর।

হাত চেপে ধরল মিরাটো। 'না, আমাদের পিছু নিতে পারে। ফাঁদ থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে।'

মুসা আর রবিনের ঘুম ভাঙেনি, অন্য ইনডিয়ানরাও ঘুমিয়ে আছে।

কিশোরকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল মিরাটো। বাঘ চলার পথ ধরে ছুটল নদীর দিকে। এখন ফাঁদটা রয়েছে বাঘ আর তাদের মধ্যে। অ্যাগুটির মতই ওরাও বাঘের টোপ হয়ে গেছে।

পেছনে ফিরে তাকাল একবার কিশোর, রওনা হয়েছে বাঘ। সাপের মত নিঃশব্দ মসৃণ গতি। চকচকে ওই কালো চামড়ার তলায় অন্তত দু-শো কেজি হাড়-মাংস-রক্ত রয়েছে, অনুমান করল সে। এত ভারি শরীর নিয়ে ওভাবে চলে কি করে!

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ভয় লাগছে। যদি মিরাটোর কৌশল বিফল হয়? সাধারণ ওই আঠা আটকাতে পারবে এত শক্তিশালী একটা জানোয়ারকে!

গতি বাড়ছে জাগুয়ারের। দৌড়ে রূপ নিচ্ছে হাঁটা। পা ফেলার তালে তালে এমনভাবে নড়ছে আর কাঁপছে কাঁধের পেশী, মনে হয় যেন পিস্টন চলছে তলায়। তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।

তা-ই গেছে কিশোর আর মিরাটোর। দাঁড়িয়ে দেখছে।

অ্যাগুটির দিকে তাকাচ্ছে না কেন?—ভাবছে কিশোর। খালি আমাদের দিকে চোখ। বোকা হয়ে গেল যেন সে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে, গায়ে এসে লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন।

চাপা গোঁ গোঁ করল জাগুয়ার। হঠাৎ বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। জালের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অ্যাগুটির ওপর চোখ পড়তেই যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে, মাটির সঙ্গে পেট মিশিয়ে ফেলল। চামড়ার তলায় থিরথির করে কাঁপছে মাংসপেশী, দেখা যাচ্ছে। নড়ছে লেজটা, বাড়ি মারছে মাটিতে।

অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত গতিতে লাফ দিল।

একলাফে বারো ফুট পেরিয়ে এসে পড়ল অ্যাগুটির ওপর। ঘাড় কামড়ে ধরল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল আবার। পায়ের তলার আঠা নজর কেড়েছে।

এইবার দেখা যাবে—ভাবল কিশোর—মিরাটোর আঠা কতখানি কাজের? কত শক্ত? সামনের এক পা তুলছে বাঘ। তুলে ফেলল, আঠায় আটকে রইল না। থাবা সাদা আঠায় মাখামাখি। আরেক পা তুলে অবাক হয়ে দেখল, একই জিনিস লেগে রয়েছে।

আর দেখার ইচ্ছে নেই কিশোরের। চেঁচিয়ে বলল, 'চলো, ভাগি! আঠায় আটকাবে না।'

কিশোরের বাহু খামচে ধরল মিরাটো। 'দাঁড়াও! দেখো।'

চেটে আঠা ছাড়ানোর চেষ্টা করল বাঘ। পারল না। রাগে কামড় মারল থাবায়। ফল হলো আরও খারাপ, মুখেও লেগে গেল আঠা। ডলে মুখ থেকে ছাড়াতে গিয়ে লাগল চোখের আশেপাশে। আঠা ছাড়ানোর চেষ্টায় শুয়ে পড়ল সে, লাগল পেটে। পাগল হয়ে গেল যেন। যতই ছাড়ানোর চেষ্টা করে, আরও বেশি করে লাগে।

এতক্ষণে বুঝল কিশোর ঘটনাটা। তার এক নানী—মেরি-চাচীর মা—বলেন, বেড়ালকে ব্যস্ত রাখতে চাইলে তার পায়ে ভালমত মাখন মাখিয়ে দাও। ওই মাখন ছাড়াতেই হিমশিম খেয়ে যাবে সে, তোমাকে বিরক্ত করবে কখন?

জাগুয়ারও বেড়ালের জাত, পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করে, আঠা ছাড়ানোর ব্যস্ততায় তাই মানুষ আর অ্যাগুটির কথা ভুলে গেল বেমালুম।

মুসা, রবিন আর ইনডিয়ানরা জেগে গেছে। কি হচ্ছে দেখতে এল। জাগুয়ারের এক চোখ পাতায় ঢেকে গেছে, আরেক চোখে আঠা, ফাঁক দিয়ে আবছামত দেখতে পেল মানুষগুলোকে। চাপা গর্জন করে ধমক লাগাল, এগোতে মানা করছে। তারপর আবার আঠা পরিষ্কারে মন দিল। বেড়ালের মতই পেছনের পায়ের ওপর

বসে লম্বা জিভ বের করে চাটছে শরীরের এখানে ওখানে।
'এবার ধরা যায়,' বলল মিরাটো।
ইনডিয়ানদেরকে খাঁচাটা আনতে বলল সে।
খাঁচা এলে, জালের দড়ি দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে টেনে বের করল। দড়ি ধরে আস্তে টানতেই টান পড়ল জালের কোণের চারটে লুপে। অন্যেরাও এসে হাত লাগাল তার সঙ্গে।
'আস্তে,' হুঁশিয়ার করল মিরাটো। 'আরও আস্তে।'
জালের আলতো টান লাগল বাঘের পেছন দিকটায়। সামান্য এগিয়ে বসল ওটা, আঠা চাটার বিরাম নেই। আবার টান লাগলে আরেকটু এগিয়ে বসল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এভাবে নিজের অজান্তেই এগিয়ে আসতে লাগল খাঁচার দিকে।
দরজার ভেতরে বাঘের শরীর অর্ধেক ঢুকে যেতেই জোরে টানল মিরাটো। জালের পেছনের দুটো কোণ উঠে এল জাগুয়ারের কাঁধের ওপর, আরেকবার টানতেই খাঁচায় ঢুকে পড়ল ওটা। ফিরে না চেয়ে জোরে ধমক দিল একবার। যেন বলল, 'উঁহুঁ, জ্বালাল দেখছি। আমি মরি আঠার যন্ত্রণায়। এই চুপ থাকো, নইলে দেখাব মজা।' আবার আঠা পরিষ্কার করতে লাগল।
বন্ধ করে দেয়া হলো খাঁচার দরজা। ফিরে তাকাল জাগুয়ার, দরজার বাঁশে বার দুই আলতো থাবা মেরে আবার আগের কাজে লাগল।
'হপ্তাখানেক ধরে চলবে এখন,' হাসছে মিরাটো। 'এক বিন্দু আঠা গায়ে থাকলেও থামবে না। চাটতেই থাকবে, চাটতেই থাকবে।'
তাজ্জব হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। এত সহজে ধরে ফেলল বাঘটাকে? বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের।
এরপর খাঁচাটা নদীর পারে নেয়ার পালা। বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কয়েকটা বাঁশের টুকরোর ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসা হলো ওটা,বাঁশের টুকরো চাকার মত গড়ায়, তার ওপর দিয়ে খাঁচা চলে। জনবল মন্দ নয়, বজরায় তোলাও খুব একটা কঠিন হলো না। কাজটা আরও সহজ হয়েছে জাগুয়ারটা কোন রকম বাধা না দেয়ায়। সে আছে তার কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শুধু ঘড়ঘড় করে হুঁশিয়ায় করেছে, ব্যস।
ছোট হলুদ জাগুয়ারটার নাম রাখা হলো মিস ইয়েলো, আর কালোটার নাম মিস্টার ব্ল্যাক, ডাক নাম 'বিগ ব্ল্যাক'।
'তোমার দোস্ত,' মুচকি হেসে মুসাকে বলল কিশোর। 'চেহারা-সুরতে অনেক মিল।'
'যত যা-ই বলো,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, 'তোমার ওই জালে আটকানোর তুলনা হয় না।' কথাটা মনে পড়ায় আবার হাসতে শুরু করল সে।
রবিন হাসল।
কিশোরও হাসল এবার। তার আনন্দ বাগ মানছে না। একই দিনে দু-দুটো জাগুয়ার, তার একটা আবার দুর্লভ কালো চিতা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাল সে,

এমনকি জিবাকেও, যে জাগুয়ার ধরায় কোন সাহায্যই করেনি।

আর একটিমাত্র প্রাণী ধরতে পারলেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় কিশোর, অ্যানাকোণ্ডা। তবে তার পরেও অনেক কাজ বাকি থাকে—ভ্যাম্পের চোখ এড়িয়ে নদীর ভাটিতে গিয়ে কোন শহরে থেমে স্টীমার ধরা, তারপর বাড়ি ফেরা। কঠিন এবং ঝক্কির কাজ।

দশ

এগিয়ে চলেছে বজরা-বহর।

পেরিয়ে এল আরও দু-শো মাইল। ইতিমধ্যে আরও কিছু প্রাণী ধরেছে ওরা—একটা শ্লথ, একটা আরমাডিলো, আর এক জাতের খুদে, খুব সুন্দর একটা আমাজন হরিণ। কিন্তু যার জন্যে বেশি আগ্রহ, সেই অ্যানাকোণ্ডারই দেখা পাওয়া গেল না।

একদিন, রাত কাটানোর জন্যে একটা বড় খালে ঢুকল বজরা। এতদিন যেসব খাল দেখেছে, এটা সেরকম নয়। ঝকঝকে বালির চরা নেই। দুই পাড়েই ঘন ঘাস আর কাশবন। খালের পানিতেও নানারকম জলজ তৃণলতা জন্মে আছে।

মিরাটো বলল, এখানে অ্যানাকোণ্ডা না থেকে যায় না।

রাতটা কাটল।

সকালে জন্তু-জানোয়ারের তদারকিতে লাগল মুসা আর কিশোর।

আইবিস পাখিটা গায়েব। যেখানে ছিল, সেখানে এখন পড়ে রয়েছে কয়েকটা পালক। খাঁচাটা চুরমার। ওই কাজ আইবিসের নয়, সে পারবে না। করেছে ভারি, শক্তিশালী কেউ। মাংসাশী জানোয়ারগুলোর দিকে একে একে তাকাল কিশোর, কার চোখে চোরা চাহনি আছে, খুঁজল। চোখ মুদে আরামে রোদ পোহাচ্ছে ডাইনোসর। তার ক্ষমতা আছে খাঁচা ভেঙে আইবিস বের করে খাওয়ার, কিন্তু গলার দড়ি এত খাটো, খাঁচার কাছেই যেতে পারে না। না, সে নয়। একটিমাত্র চোখ খোলা রেখে চেয়ে আছে লম্বু-বগা, নিষ্পাপ চাহনী। না, তার কাজও নয়। ইঁদুর, ব্যাঙ আর মাছ খেয়েই কূল করতে পারে না, রাতে চুরি করে খাঁচা ভেঙে স্বজাতী খাওয়ার কষ্ট করতে যাবে কোন দুঃখে।

বোয়ার গায়ে খাঁচা ভাঙার মত জোর আছে, পাখির মাংসেও অরুচি নেই। কিন্তু সে রয়েছে অন্য নৌকায়। পেটের শুয়োর এখনও পুরোপুরি হজম হয়নি, তাছাড়া পানিকে তার অপছন্দ। নাহ্, সে-ও নয়।

তাহলে?

বেশি ভাবার সময় পেল না কিশোর। খাঁচার ভেতরে চেঁচামেচি জুড়েছে রক্তচাটা, খাবার চায়।

বোতলে ভরা আছে ক্যাপিবারার রক্ত। ঠাণ্ডা। সেটা আবার রুচবে না বাদুড়টার, গরম চাই, উষ্ণ রক্ত। তাজা না হলেও চলে, কিন্তু গরম হতেই হবে,

ধমনীতে প্রবাহিত হওয়ার সময় যতখানি গরম থাকে ততখানি।

একটা পাত্রে এক কাপ রক্ত ঢেলে চুলায় বসাল কিশোর। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরাতে গিয়ে চোখে পড়ল ব্যাপারটা। টলডোর নলখাগড়ায় তৈরি বেড়ায় মস্ত এক গোল ফোকর। কৌতূহল হলো তার। ভালমত দেখার জন্যে এগোল।

কিসে করল এই ছিদ্র, আগের দিনও ছিল না ওটা। রাতে করা হয়েছে। আইবিসের খাঁচা ভাঙা, পাখি গায়েব, পড়ে থাকা কিছু পালক, তারপর এই ফোকর·•চকিতে মনে হলো তার—অ্যানাকোণ্ডা নয়তো?

রাতে হয়তো নৌকায় উঠেছিল, পাখিটাকে খেয়ে ওদিক দিয়ে পথ করে বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ দুলে উঠল নৌকা। আরে, কি ব্যাপার? আমাজনে এত বড় ঢেউ উঠল, যে খাল বেয়ে এসে নৌকা দুলিয়ে দিয়েছে? নাকি ভূমিকম্প? দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি টলডো থেকে বেরোল সে।

কই? ঢেউ-টেউ তো দেখা যাচ্ছে না। তীরের দিকে চেয়ে ভূমিকম্পের কোন লক্ষণও দেখল না।

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি লাগল নৌকার তলায়, কিসে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে কাত করে ফেলছে একপাশে। তাল সামলাতে না পেরে ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর।

আবার সোজা হয়ে গেল নৌকা।

উঠে কিনারা দিয়ে তাকাল। পানিতে ভয়ানক তোলপাড়।

'অ্যানাকোণ্ডা!' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মিরাটো, কণ্ঠ কাঁপছে। 'নৌকার তলায় বাসা।'

চেঁচাতে শুরু করেছে জিবা, লোকজনদের তৈরি হতে বলছে। 'এখুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে। অ্যানাকোণ্ডা খুব খারাপ। দুষ্ট প্রেত।'

এমনিতেই ইনডিয়ানরা সাংঘাতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের মনে আরও বেশি ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে জিবা।

'যাচ্ছেটা কে?' জিবার কথার প্রতিবাদ করল কিশোর। 'সবাই শুনে রাখো, অ্যানাকোণ্ডা ধরার আগে নড়ছি না এখান থেকে। যার থাকতে ইচ্ছে করবে না, চলে যেতে পারো, বাধা নেই।'

কিন্তু সে-আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে।

মিরাটোর সঙ্গে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। কি ভাবে সাপ ধরবে, ধরে কোথায় রাখবে, এসব আলোচনা।

'খাঁচা তো লাগবেই,' মিরাটো বলল। 'পানি রাখার বড় পাত্রও লাগবে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পানি ছাড়া থাকতে পারে না অ্যানাকোণ্ডা।'

সেটা জানে কিশোর। বিশাল ওই সাপগুলোকে অনেকে এজন্যে জলজ-সাপ বলে। 'কিন্তু এত বড় পাত্র কোথায়? বাথটাব দরকার।'

'বানিয়ে নেব। গাছের ছাল দিয়ে।'

মিরাটোর ওপর এখন অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস কিশোরের। কি করে বানাবে, জানতে চাইল না। বলল, 'তাহলে চলো বানিয়ে ফেলি।'

তীরে নামল সবাই।

বড় সোজা একটা গাছ বেছে বের করল মিরাটো। পার্পলহার্ট জাতের বিশাল গাছ, ছাল বেশ মোটা কিন্তু নরম, কাঠ থেকে সহজেই ছাড়িয়ে আনা যায়। গোড়ার কাছে গোল করে কাটল মিরাটো, বিশ ফুট ওপরে আবার চারদিকে ঘিরে গোল করে কাটল। ওপরের কাটা থেকে নিচের কাটা পর্যন্ত সোজা চিরে ফেলল। তারপর নিচের কাটা জায়গা ধরে টেনে ছাড়িয়ে নিল আস্ত ছালটা। বিশ ফুট লম্বা আর দশ ফুট চওড়া একটা ছালের চাদর বেরোল। কলাগাছের আস্ত খোল কেটে দুই ভাঁজ করে মিশিয়ে, বেঁধে, পাত্র তৈরি করে তাতে শিং মাগুর জিয়ল এসব মাছ রাখে জেলেরা। ছালটা দিয়ে নিচের দিকে চ্যাপ্টা, ওপরের দিকে গোল ওরকমই একটা বিশাল পাত্র বানানো হলো। বাঁধা হলো লিয়ানা লতা দিয়ে। দুই ধারেই লম্বা লম্বা দুটো ফাঁক, পানি চোয়াবে সেখান দিয়ে। তাই রবার গাছের আঠা পুরু করে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো ফাঁক। ব্যস, চমৎকার বাথটাব তৈরি হয়ে গেল, পানি রাখলে পড়বে না।

এরপর একটা খাঁচা তৈরির কাজে লাগল সবাই।

গাধার মত খেটেও খাঁচা বানিয়ে তাতে বাথটাব বসিয়ে বাঁধতে বাঁধতে পরদিন দুপুর হয়ে গেল। রাতে পাহারা রাখা হলো, যাতে অ্যানাকোণ্ডা এসে আর কোন জানোয়ার চুরি করে নিতে না পারে।

খাঁচা তৈরি শেষ। এবার ফাঁদ পাততে হবে।

বড় বজরার মাস্তুলে একটা দড়ি বেঁধে আরেক মাথা নিয়ে যাওয়া হলো তীরে। চল্লিশ ফুট দূরের একটা গাছের দো-ডালার জোড়ার ওপর দিয়ে দড়িটা পেঁচিয়ে এনে অন্য মাথায় বাঁধা হলো আমাজন হরিণটাকে। ফাঁস তৈরি করা হলো তিনটা, একটা অ্যানাকোণ্ডার গলায় আটকানোর জন্যে, আর দুটো লেজে।

সব তৈরি। এবার সাপ এলেই হয়।

ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে বসল শিকারীরা। আবার সেই অপেক্ষার পালা। অনড় বসে থাকা আর থাকা।

গড়িয়ে গেল দিন।

পানির কিনারে সারাক্ষণ চরল হরিণটা, তাজা ঘাস ছিঁড়ে খেল। পিপাসা পেলে পানি তো আছেই। খুব সুন্দর একটা জীব। চকচকে চামড়া যেন ট্যান করা, বড় বড় বাদামী চোখ, ডালপাতাওয়ালা দেখার মত শিং। ওটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে মন খুঁতখুঁত করছে কিশোরের, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। হরিণ খুবই পছন্দ অ্যানাকোণ্ডার, 'ডিয়ার সোয়ালোয়ার' বা হরিণখেকো ডাকনামই হয়ে গেছে এ-কারণে। আরেকটা হরিণ ধরে আনা, সময়ের ব্যাপার।

তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না কিশোরের।

সত্যি আছে তো এখানে সাপ? বজরার তলায় আসলেই অ্যানাকোণ্ডার বাসা আছে, নাকি ভুল করেছে মিরাটো? অ্যানাকোণ্ডার বাসা দেখতে কেমন? কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রহস্যভেদীর মনে। বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এল, আর থাকতে পারল না কিশোর। মুসাকে বলল, 'চলো।'

'কোথায়?'

'অ্যানাকোণ্ডার বাসা দেখব।'

'ওই পানির তলায় ডুব দিয়ে?' দুই হাত নাড়ল মুসা। 'আমি পারব না, বাবা। আমার সাহসে কুলাবে না।'

মুচকি হাসল মিরাটো। 'চলো, আমি যাচ্ছি।'

পানিতে নামল দু-জনে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাড়। গলা পানিতে নেমে ডুব দিল কিশোর, পাশে মিরাটো। পানি স্বচ্ছ নয়, আবার ঘোলাও না। কয়েক হাতের বেশি দৃষ্টি চলে না। আচ্ছা, পিরানহা নেই তো? আশা করল সে, নেই। জলজ আগাছার মধ্যে ওই মাছের ঝাঁক না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

পানির তলায় তাকিয়ে অ্যানাকোণ্ডার বাসা খুঁজল কিশোর।

আজব এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে মনে হলো। লম্বা লম্বা লতা, দুলছে। নলখাগড়ার মত এক জাতের ঘাস জন্মে রয়েছে গুচ্ছে গুচ্ছে। পিচ্ছিল, কেমন যেন গা শিরশির করা ওগুলোর ছোঁয়া। কোথাও সোজা কোথাও আড়াআড়ি, একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে মোটা ডাল ও ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের কাণ্ড, কালো কালো। দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। ওগুলোর মাঝে ফাঁক এত কম, অ্যানাকোণ্ডার মত বড় প্রাণী থাকতে পারবে না।

দম নেয়ার জন্যে ভাসল কিশোর। তার পাশে মিরাটো। বুক ভরে বাতাস টেনে আবার ডুব দিল। আরও কয়েক হাত এগিয়ে কালো একটা গুহামুখ চোখে পড়ল। মুখটা পানির তলায়, সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে তীরের কোন শুকনো গুহায়, আন্দাজ করল কিশোর।

ওটা যে সাপের বাসা, তার প্রমাণ মিলল। ফুট পাঁচেক লম্বা দুটো সাপ বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকে গেল নলখাগড়ার জঙ্গলে।

তারপরই দেখা গেল বিশাল আরেকটা মাথা, গুহা থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোল কিশোরের দিকে। ধ্বক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড।

হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মিরাটো, ওপরে ওঠার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ওঠার জন্যে ঘুরতে শুরু করেছে কিশোর। জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়ছে। ভয়, এই বুঝি এসে পা কামড়ে ধরল অ্যানাকোণ্ডা। টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহায়। চিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে রসিয়ে রসিয়ে গিলবে।

তার মনে হলো, পানির ওপরে বুঝি আর ওঠা হবে কোন দিনই।

ওপরে মাথা তুলে, সাঁতরে কিভাবে যে তীরে এসে উঠল, বলতে পারবে না সে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ধপ করে বসল ঝোপের কিনারে।

'কী!' একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

'অ্যানাকোণ্ডা···মনে হয় তার বাড়ির ওপরই বসে আছি আমরা···পানির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ চলে এসেছে ডাঙায়।'

আবার অপেক্ষা।

অনেক সময় পেরোল। ঝোপের ভেতরই শুয়ে ঘুমাচ্ছে মুসা। রবিন ঢুলছে।

কিশোরের চোখেও ঘুম। একবার পাতা মেলছে, একবার বন্ধ। দেখার কিছু নেই। হরিণটা ঘাস খাচ্ছে, তার পায়ের কাছ থেকে খানিক দূরে ছোট ছোট ঢেউ ছপছপ করছে পাড়ে বাড়ি খেয়ে।

ছপছপ কিছুটা বাড়ল মনে হলো না? চোখ মেলল কিশোর। হরিণটার জন্যে প্রথমে চোখে পড়ল না, তারপর দেখল ওটাকে। নড়ছে। সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত। পলকে ঘুম দূর হয়ে গেল। অ্যানাকোণ্ডা আসছে, কোন সন্দেহ নেই। ডাঙার চেয়ে পানিতে থাকে বেশিক্ষণ ওই সাপ. তাই পানিতে থাকার মত করেই তৈরি হয়েছে শরীর। নাকটা ওপর দিকে ঠেলে তোলা, পুরো মাথাটা-পানির তলায় থাকলেও ফুটো দুটো ওপরে থাকে, শ্বাস নিতে অসুবিধে হয় না।

ঢেউয়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে চোখ দুটো। এমনভাবে বসানো; ওপরে, নিচে, সামনে, পাশে সব দিকেই দেখতে পায় অ্যানাকোণ্ডা, আর কোন সাপের এই সুবিধে নেই। দুই চোখের মাঝের দূরত্ব দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর, সাপটা বিরাট।

হরিণের দিকে এগিয়ে আসছে জীবন্ত পেরিস্কোপ। পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত পানিতে আলোড়ন, মস্ত প্রপেলার চলছে যেন পানির তলায়, পঁচিশ-তিরিশ ফুটের কম হবে না সাপটা।

নিঃশব্দে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের পেছনে চলে এল কিশোর। দড়ি ধরে টেনে সঙ্কেত দিল। মাস্তুলের গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে একজন ইনডিয়ান। সতর্ক হয়ে গেল সে।

তীরে ঠেকল অ্যানাকোণ্ডার থুতনি। বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল। ঘাস খাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল হরিণ, সাপটাকে দেখেই লাফ মারল। দড়ি না থাকলে তিন লাফে হারিয়ে যেত বনের ভেতর। সেটা তো পারল না, দড়িটাকে টেনে টানটান করে রেখে পা ছুঁড়তে লাগল অনবরত। খুরের ঘায়ে মাটি উড়ে গিয়ে লাগছে সাপের মুখে।

দড়ি টেনে সঙ্কেত দিল আবার কিশোর।

টান দিল মাস্তুলের কাছে বসা লোকটা। আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে লাগল হরিণটাকে।

একটু একটু করে হরিণটা সরছে গাছের দিকে, সাপ এগোচ্ছে তার দিকে। কামড় বসাবার জন্যে মাথা তুলেও নামিয়ে ফেলছে, বার বার সরে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে শিকার।

একটা ফাঁস হাতে মুসা তৈরি। তার পেছনে আর আশেপাশে অন্যেরা।

গাছের গোড়ায় চলে এল হরিণ। সাপটা তার থেকে ছয় ফুট দূরে। দ্রুত

আসছে।

'এবার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ফাঁস হাতে গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অন্যেরা বেরোল দু-দিক থেকে। লেজে ফাঁস পরানোর জন্যে ছুটে গেল দু-জন।

মুসাকে দেখে পিছাল না সাপটা, ভীষণ ভঙ্গিতে মাথা তুলল। সামান্যতম ভুল এখন মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ছোবল হানার আগেই সাপের গলায় পরিয়ে দিতে হবে ফাঁস।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশাল মাথাটা, ফাঁক হয়ে গেছে চোয়াল। তীব্র গতিতে এগিয়ে আসবে যে কোন মুহূর্তে। মুসাও ফাঁস ছুঁড়ল, সাপটাও ছোবল হানল। কিন্তু ধরতে পারল না মুসাকে। লাফিয়ে পাশে সরে গেছে সে। ফাঁসটা মাথা গলে গলার কাছে চলে গেছে। হ্যাঁচকা টানে আটকে দেয়া হলো।

দড়ির আরেক মাথা খাঁচার দরজার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আগেই। জাগুয়ারকে যেভাবে টেনে ঢুকিয়েছে, সাপটাকেও সেভাবেই ঢোকানোর ইচ্ছে। লেজে ফাঁস লাগিয়ে টেনে শরীরটাকে সোজা রাখতে পারলে ঢোকানো যাবে ওভাবে।

কিন্তু মোটেই সহজ হলো না কাজটা।

এক জায়গায় থাকছে না লেজ, খালি এপাশ ওপাশ নড়ছে। অনেক চেষ্টায় একটা মাত্র ফাঁস পরানো গেল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না লোকটা, হ্যাঁচকা টানে দড়ি ছুটে গেল তার হাত থেকে।

লেজের বাড়িতে চিত হয়ে গেল জিবা আর দু-জন ইনডিয়ান।

আরেকটা ফাঁস হাতে এগোল মিরাটো। এত বেশি কাছে চলে গেল, দড়ির ফাঁস পরানোর আগে সে নিজেই আটকা পড়ল লেজের ফাঁসে। শরীর মুচড়ে মুচড়ে ফাঁসটাকে ওপরের দিকে সরিয়ে আনছে সাপ। বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে সরে যাচ্ছে মিরাটোর শরীরটা। পুরোপুরি অসহায় সে, কিছুই করতে পারছে না। মুক্তি পাওয়ার জন্যে খালি হাত-পা ছুঁড়ছে।

তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।

মিরাটোকে শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এল সাপ, লেজটা মুক্ত করে ফেলেছে। এদিক ওদিক নাড়ছে আবার আরেকজনকে ধরার জন্যে।

কিশোরের ভাগ্য ভাল, ফাঁসে আটকা পড়ল না, কিন্তু বাড়ির চোটে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। গাছের সঙ্গে ঠুকে গেল কপাল, বেঁহুশ হয়ে গেল সে।

ছুটে গেল রবিন। টেনেহিঁচড়ে সরাল কিশোরকে। দৌড়ে গিয়ে আঁজলা ভরে পানি এনে ছিটাতে লাগল তার চোখেমুখে।

মুসার দিকে এগোচ্ছে সাপটা। পিছাতে গিয়ে শেকড়ে লেগে চিত হয়ে পড়ে গেল সে। এই সুযোগে দ্রুত এগোল বিশাল মাথাটা, বিকট হাঁয়ের ভেতর থেকে বাঁকা, চোখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে লকলক করে বেরোচ্ছে লম্বা জিভ। অ্যানাকোণ্ডার মানুষ আক্রমণের রোমাঞ্চকর সব গল্প মনে পড়ল তার।

কোনমতে সরে এল সে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল লেজের দিকে।

প্যাঁচে আটকে রয়েছে মিরাটো। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। অবশ নিষ্প্রাণ মাথাটা নড়াচড়ায় একবার এদিক ঝুলে পড়ছে, একবার ওদিক। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে সাপের মাথার কাছে।

মুখ ঘোরাল সাপটা।

মিরাটোকে বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। বিপদের পরোয়া না করে ছুটে গিয়ে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়াল সাপের ওপর, বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল দুই চোখ। অ্যানাকোণ্ডার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

যন্ত্রণায় মোচড়াতে শুরু করল সাপের শরীর, চাবুকের মত সপাসপ বাড়ি মারছে লেজ দিয়ে। কিন্তু কারও গায়ে লাগছে না, সবাই রয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। প্যাঁচ থেকে খুলে একটা ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল মিরাটোর দেহটা।

চোখ ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল মুসা। মিরাটোর বুকে কান পেতে শুনল, নাড়ি দেখল। নেই। সব শেষ।

উঠে দাঁড়াল আবার সে। কড়া চোখে তাকাল সাপটার দিকে। মিরাটোর মৃত্যু বৃথা যেতে দেবে না।

কিশোরের জ্ঞান ফিরেছে।

টানাটানিতে সাপের গলার ফাঁসটা আরও চেপে বসেছে। দড়ি ধরে খাঁচার দিকে টানতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাবু হয়ে আসছে অ্যানাকোণ্ডা। লেজে আটকানো ফাঁসের দড়িও টেনে নিয়ে গিয়ে পেঁচিয়ে ফেলা হলো আরেকটা গাছে। দড়িটা ধরে রাখল দু-জন ইনডিয়ান, অন্য দু-জন আরেকটা ফাঁস আটকে দিল লেজে।

এরপর আর বিশেষ অসুবিধে হলো না। মাথার দিক থেকে দড়ি টানতে লাগল কয়েকজন, অন্যেরা লেজের দড়ি একটু একটু করে ছাড়তে লাগল। শরীর মুচড়ে, আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল সাপ, পারল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল খাঁচার দিকে।

অবশেষে বিশাল মাথাটা ঢুকল দরজার ভেতর।

সাপের অর্ধেকটা শরীর খাঁচায় ঢুকে যাওয়ার পর লেজের দড়িতে বেশি করে ঢিল দেয়া হলো। বার দুই এদিক ওদিক নেড়ে মানুষ ধরার চেষ্টা করল লেজটা, তারপর আপনাআপনি ঢুকে গেল ভেতরে। লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা।

খুশি হতে পারল না কেউ। অ্যানাকোণ্ডার জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।

গায়ের ছেঁড়া শার্ট খুলে ভিজিয়ে এনে মিরাটোর রক্তাক্ত মুখ মুছে দিল মুসা। চোখের পানি ঠেকাতে পারল না। ভালবেসে ফেলেছিল তরুণ ইনডিয়ানকে। আজ একজন বড় বন্ধুকে হারাল তিন গোয়েন্দা।

মিরাটো চলে যাওয়ায় বড় বেশি অসহায় মনে হলো নিজেদেরকে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লাশের পাশে বসে রইল তিনজনে।

খাঁচাটা নৌকায় তুলল ইনডিয়ানরা। বাথটাবে পানি ভরল। তারপর ফিরে এল কবর খুঁড়তে।

যে গাছের তলায় জীবন দিয়েছে মিরাটো, সেদিন সন্ধ্যায় সেখানেই কবর দেয়া হলো তাকে।

এগারো

নদীর ভাটির দিকে একটানা চলেছে বজরা-বহর। সবাই বিষণ্ণ। কিশোরের একমাত্র ভাবনা, কি করে এখন ম্যানাও পৌঁছে স্টীমারে জানোয়ারগুলো তুলবে।

তিন গোয়েন্দার কাছে এখন জঙ্গল শুধু মৃত্যু আর আতঙ্ক।

এই সময় মুসার উঠল জ্বর। অবহেলা করে ম্যালেরিয়া নিরোধক ট্যাবলেট খায়নি নিয়মিত, হ্যামকের ওপর মশারী খাটায়নি। এক রাতের মশার কামড়েই ধরে ফেলেছে। ছোট বজরার টলডোর ছাতে শুয়ে রইল সে।

ভ্যাম্পের দেখা নেই। কিশোর আশা করল, ডাকাতটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু একদিন জংলীদের ঢাকের শব্দ কানে এল। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখা গেল গ্রামে আগুন। ভ্যাম্পের দলের কাজ না-তো? ওরা লাগিয়েছে? শিওর হলো কিছুক্ষণ পরই, যখন দেখল, চরের ওপর পড়ে রয়েছে ডাকাতদের নৌকাটা। ভেসে যাওয়ার ভয়ে ডাঙায় তুলে রেখে গেছে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। মুসা অসুস্থ, মিরাটো নেই, এখন যদি এসে ভ্যাম্পের দল আক্রমণ করে, ঠেকাতে পারবে না। ডাকাতদের অলক্ষে এখন কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে।

আরও মাইল পাঁচেক ভাটিতে একটা খালের মুখে থামল সেদিন রাত কাটানোর জন্যে।

বার বার কান পেতে শুনছে লোকেরা। ঢাক এখনও মাঝে মাঝেই বেজে উঠছে। অনেক দূর থেকে জবাব আসছে সে-শব্দের। তারমানে খবর দেয়া হচ্ছে অন্য গ্রামের জংলীদের, দাওয়াত করছে, কিংবা সাহায্যের আবেদন। ঢাকের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে বন।

ভীষণ ভয় পাচ্ছে কিশোরদের সঙ্গের ইনডিয়ানরা। আগুনের কাছে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছে। ফিসফাস করছে। তাদের আরও উত্তেজিত করে তুলছে জিবা।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'কি হয়েছে, জিবা?'

'ঢাক, সিনর। এরা ঢাকের শব্দে ভয় পাচ্ছে।'

'কেন? এক ইনডিয়ান অন্য ইনডিয়ানকে জবাই করবে না।'

'এক গোত্রের না হলে করবে। এখানকার ইনডিয়ানরা ভারি পাজী, বুনো। বিদেশী মানুষকে দেখতে পারে না, তাদেরকে যারা সাহায্য করে, তাদেরকেও না। তোমাকে ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে, সঙ্গে যারা আছে কাউকে ছাড়বে না।'

হাসল কিশোর। 'যতখানি বলছ, ততটা হয়তো নয়। প্রথম থেকেই তো বাড়িয়ে বলা শুরু করেছ।'

নদীর ধারে গেল জিবা আর তার সঙ্গীরা, গাঁয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে। উত্তেজিত হয়ে উজানের দিকে কি যেন দেখাচ্ছে আর বলাবলি করছে। পায়ে পায়ে তাদের কাছে চলে গেল কিশোর, রবিন রইল মুসার কাছে।

রক্তাক্ত সূর্যাস্তের পটভূমিতে জংলীদের জ্বলন্ত গাঁয়ের ধোঁয়া কেমন যেন বিষণ্ন করে তুলেছে পরিবেশ। কিন্তু সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ইনডিয়ানদের, তারা চেয়ে আছে নৌকার দিকে। এদিকেই ভেসে আসছে নৌকাটা। দূর থেকেই যাত্রীদের দেখা গেল। কিশোর গুণল, নয় জন। চুপ করে বসে আছে ওরা, দাঁড় বাইছে না।

একেবারে নড়ছে না, আশ্চর্য তো!

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিশোরের হাত-পা।

আরও কাছে এসে গেছে নৌকা। সাঁঝের আবছা আলোয় এখন কিছুটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নয় জন মানুষকে। কেন কেউ নড়ছে না বোঝা গেল এতক্ষণে। একজনেরও মাথা নেই।

স্রোতের টানে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে এল নৌকা। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে জিবা, থরথর করে কাঁপছে।

নয়টা মুণ্ডশূন্য ধড়! কাপড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা ইনডিয়ান নয়।

নিশ্চয় ভ্যাম্পের ডাকাতদল। এতদিন অন্যের গলা কেটেছে, এবার নিজেদের গলাই কাটা পড়ল। জংলীদের গাঁয়ে আগুন লাগানোর পরিণতি।

আতঙ্কিত যেমন হয়েছে, সেই সাথে স্বস্তিও পাচ্ছে কিশোর।

বারো

সকালে চোখেমুখে রোদ লাগলে ঘুম ভাঙল কিশোরের। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল, মুখের ওপর হাত রেখে পড়ে রইল চুপচাপ।

সকালের এই কয়েকটা মুহূর্ত এখানে উপভোগ করে সে। আগুন জ্বালানোর জন্যে এই সময় কাঠ জোগাড়ে ব্যস্ত হয় ইনডিয়ানরা। তাদের অলস কথাবার্তা, কেটলি আর মগের ঠোকাঠুকির শব্দ, ধোঁয়া আর কফির গন্ধ, ভাল লাগে তার।

কিন্তু আজ এত চুপচাপ কেন? শুধু জঙ্গলের পরিচিত কোলাহল, আর মাঝে মাঝে জংলীদের ঢাকের একঘেয়ে দিড়িম দিড়িম।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কাত হয়ে তাকাল কিশোর। আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে থাকার কথা ইনডিয়ানদের, হাতে মগ।

কিন্তু কেউ নেই। জনশূন্য ক্যাম্প।

এমন তো হওয়ার কথা নয়! হ্যামক থেকে নামল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই যেন হোঁচট খেল। বড় বজরার পেছনে নোঙর করা মনট্যারিয়াটা নেই।

ভয় পেল কিশোর, প্রচণ্ড ভয়। মনকে বোঝাল, নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছে লোকগুলো, নাস্তার জন্যে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, সবাই কেন? বড় জোর, দু-জন যাবে, অন্যেরা থাকবে আগুনের কাছে।

ভাটির দিকে যতদূর চোখ যায়, তাকাল সে। কোন নৌকার চিহ্নও নেই।

নিজেকে প্রবোধ দেয়ার আর কোন মানে হয় না। যা সত্য, সেটাকে মেনে নেয়াই উচিত। ইনডিয়ানদের নিয়ে পালিয়েছে জিবা।

রবিনকে ডেকে তুলল কিশোর। মুসা প্রায় অচেতন।

দেখা গেল, শুধু নৌকাটাই নিয়েছে ওরা, মালপত্র সব আছে। এমনকি মনট্যারিয়ায় সেসব জানোয়ার ছিল, সেগুলোকেও রেখে গেছে বড় বজরায়, বোধহয় ভার কমিয়েছে। ছেড়ে দিল না কেন? খাবার, জাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম, মূল্যবান কাগজপত্র, ওষুধ, বন্দুক, গুলি, সব রয়েছে। ছোঁয়ওনি কিছু।

ভীষণ জঙ্গলে একা এখন তিন গোয়েন্দা, অসহায়। মুসা জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। নরমুণ্ড শিকারীরা খেপে আছে। আগের দিন বিকেলের বীভৎস দৃশ্যটা মনে পড়ল কিশোরের। শিউরে উঠল। কল্পনা করল, বড় বজরায় জানোয়ারের সঙ্গে তিনটি কাটা ধড়···আর ভাবতে পারল না সে।

দুর্বল কণ্ঠে ডাক দিল মুসা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রবিন।

পানি চায় মুসা।

কপালে হাত দিয়ে দেখল রবিন, পুড়ে যাচ্ছে। পকেটেই টেবলেট আছে, পানির সঙ্গে ওষুধও খাইয়ে দিল। সংক্ষেপে জানাল, কি ঘটেছে।

ম্যালেরিয়া চিন্তাশক্তি ঘোলাটে করে দিয়েছে মুসার। রবিনের কথা ঠিকমত বুঝতে পারল না, কিংবা কানেই ঢুকল না। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না কেন?'

উঠে চলে এল রবিন।

ইতিমধ্যে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে কিশোর। নাস্তা বানাতে বসল দু-জনে। কানে আসছে ইনডিয়ানদের ঢাক। ইস্ থামে না কেন? পাগল করে দেবে নাকি?

চামচ দিয়ে ডিম আর কফি খাওয়ানো হলো মুসাকে।

তারপর রাইফেল নিয়ে শিকারে চলল কিশোর আর রবিন। জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে হবে, বিশেষ করে অ্যানাকোণ্ডাকে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠেছে ওটা। লেজের বাড়ি মেরে সমস্ত পানি ফেলে দিয়েছে খোল থেকে। আগে তার পেট ঠাণ্ডা না করে পানি ভরেও লাভ নেই, আবার ফেলে দেবে।

চওড়া খাল। খালের ধার ধরে এগিয়ে চলল দু-জনে। কোন জানোয়ার পানি খেতে এলে গুলি করবে।

হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। রবিনকেও থামাল। হাত তুলে দেখাল সামনে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া ইনডিয়ান দম্পতি, মেয়েটা কোলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

ভালমত আরেকবার দেখে হেসে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান। খুদে চোখ, ভোঁতা নাক আর মোটা ঠোঁট দেখা যাচ্ছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাগরে কত নাবিক যে বোকা বনেছে ওগুলোকে দেখে। সাগর থেকে ফিরে এসে গল্প করেছে, মৎসকন্যার দেখা পেয়েছে তারা। ওগুলোর অর্ধেক শরীর মানুষের মত, অর্ধেক মাছের। সাগরের কিনারে পাথরে বসে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, চুল আঁচড়ায়। যা দেখেছে তার সঙ্গে রঙ চড়িয়েছে অনেক বেশি।

নাবিকদের দোষ দেয়া যায় না। এই তো, এইমাত্র কিশোর আর রবিনও তো বোকা বনল, কাছে থেকে দেখেও।

আরও এগোল দু-জনে। মুখ অনেকটা গরুর মত জীবগুলোর। ম্যানাটি। ব্রাজিলিয়ানরা বলে কাউফিশ, অর্থাৎ গরুমাছ।

ঘন শেওলায় লেজ ডুবিয়ে বসে আছে ম্যানাটি দুটো। মাদীটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, মদ্দাটা পদ্মের কুঁড়ি খুঁটছে। দশ ফুট করে লম্বা হবে একেকটা, হোঁতকা, টনখানেকের কম হবে না ওজন। অ্যানাকোণ্ডার প্রিয় খাবার, কিন্তু এতবড়গুলোকে মেরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

পাখনা আর লেজের ঝাপটা শুনে চোখ ফেরাল কিশোর। আরও ম্যানাটি রয়েছে কাছাকাছি। ছোট একটা দেখল, পাঁচ ফুটও হবে না। হ্যাঁ, এইটা হলে চলে। পাড়ের কাছে অল্প পানিতে জলজ ঘাসের ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে জীবটা।

খুব কাছে থেকে গুলি করল কিশোর।

গুলির শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিল বড় ম্যানাটি দুটো। ছটফট করছে গুলি-খাওয়াটা। তলিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে ছুটে এসে প্রায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার গুলি করল কিশোর। রাইফেল বলে মারতে পেরেছে, বন্দুক হলে পারত না। খুব শক্ত ম্যানাটির চামড়া, ইনডিয়ানরা বর্ম বানায়, শটগানের গুলি হয়তো চামড়াই ভেদ করত না।

দুটো গুলি খেয়েও সঙ্গে সঙ্গে মরল না ম্যানাটিটা। তীরের মাটিতে গরুর মত নাক দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল, তারপর স্থির হয়ে গেল। ডাঙায় তোলার চেয়ে পানি দিয়ে টেনে নেয়া সহজ, খাটনি কম হবে। লেজ ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে চলল দু-জনে।

পিচ্ছিল চামড়া। তাই নৌকায় টেনে তুলতেও বিশেষ অসুবিধে হলো না। খাঁচার দরজার কাছে ম্যানাটিটাকে নিয়ে এল ওরা।

খিদেয় পাগল হয়ে গেছে সাপটা। খাঁচার দরজায় বার বার বাড়ি মারছে মাথা দিয়ে। এরকম চালিয়ে গেলে এক সময় খাঁচা ভেঙে যাবেই। তিরিশ ফুট লম্বা শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে। খুব শয়তান জীব। অ্যানাকোণ্ডা কখনও পোষ মেনেছে বলে শোনা যায়নি। ইনডিয়ানদের বন্ধু বোয়া, কুকুর-বেড়ালের মতই পোষ মানে। কিন্তু সাপের জগতের ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকে এড়িয়ে চলে জংলীরাও। কারও সঙ্গেই ভাব ভাল না দানবগুলোর।

খাবার তো আনা হলো, এখন খাওয়ায় কি করে? খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে

সঙ্গে ছোবল হানবে কুৎসিত মাথাটা, পা কামড়ে ধরে চোখের পলকে কিশোরকে টেনে নেবে ভেতরে, পাকে জড়িয়ে ভর্তা করে ফেলবে।

কুঁই কুঁই করে ছুটে এল নাকু, খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে। ক্ষুধার্ত চোখে তার দিকে তাকাল অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল, খাঁচায় বাঁশের বেড়া না থাকলে নাকুর জীবনের ওখানেই ইতি ঘটত।

উপায় পাওয়া গেল। নাকুকে তুলে নিয়ে খাঁচার কোণার কাছে চলে এল কিশোর। সেদিকে চোখ রেখে খাঁচার ভেতরে অনুসরণ করল অ্যানাকোণ্ডার মাথা, কোণায় চলে এল।

খাঁচার বাইরে কয়েক ফুট দূরে নাকুকে রেখে, রবিনকে ধরতে বলল কিশোর।

স্থির চোখে চেয়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, সম্মোহন করছে যেন। এভাবে সম্মোহন করে নাকি শিকারকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খপ করে ধরে। কিন্তু নাকুর ওপর বিশেষ সুবিধে করতে পারল না সাপ, শক্ত করে ধরে রেখেছে রবিন। তাপিরটাকে নড়তেই দিচ্ছে না।

খাঁচার দরজার কাছে চলে এল কিশোর। অ্যানাকোণ্ডার দৃষ্টি অন্য দিকে, এই সুযোগে খাঁচার পাল্লার কিনারে দড়ি পেঁচাল সে। তারপর বাঁধন খুলল। দড়িটা সামান্য ঢিল রেখেছে, দুই-তিন ইঞ্চি ফাঁক হয় টানলে। ম্যানাটির চ্যাপ্টা লেজ ঢুকিয়ে দিল সেই ফাঁকে। তাপিরটাকে সরিয়ে নিতে বলল।

নিয়ে গেল রবিন।

ম্যানাটির ওপর চোখ পড়ল অ্যানাকোণ্ডার। এক লাফে চলে এল মাথাটা। খপ করে কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল।

পেঁচানো দড়িতে আরেকটু ঢিল দিল কিশোর, খানিকটা ঢুকল ম্যানাটির শরীর। এভাবে ঢিল দিতে দিতে অনেকখানি ফাঁক করে ফেলল দরজা, টান দিয়ে শিকারের পুরো শরীরটাই খাঁচার ভেতরে নিয়ে গেল সাপ। তাড়াতাড়ি আবার দরজা বন্ধ করে বেঁধে ফেলল কিশোর।

অ্যানাকোণ্ডা যখন শিকার ধরে, আর কোন দিকে খেয়াল করে না। কি করে শিকার গিলবে, খালি সেই ভাবনা। দেখতে দেখতে গিলে ফেলল ভারি ম্যানাটিটাকে।

'যাক, কয়েক হপ্তার জন্যে নিশ্চিন্ত,' ভাবল কিশোর। 'পেট খালি না হলে আর গোলমাল করবে না।'

বাকি জীবগুলোকে খাওয়াতে লাগল সে। রবিন সাহায্য করছে বটে, কিন্তু মুসার মত পারছে না। এসবের জন্যে মুসা একাই যথেষ্ট। এই মুহূর্তে সহকারী গোয়েন্দার অভাব খুব অনুভব করছে কিশোর, জানোয়ারগুলোর ভাবভঙ্গিতেও মনে হচ্ছে, ওরা মুসাকে খুঁজছে।

খাওয়াচ্ছে, সেই সঙ্গে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ভ্যাম্পের ডাকাতদলের সবাই কি মারা গেছে? কতজন লোক ছিল দলে? সেদিন রাতে যখন আক্রমণ করছিল, আট-দশজনকে দেখা গেছে। নৌকায় ভেসে গেছে নয়টা ধড়।

দশজন হলে বাকি থাকে একজন। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, একজন জীবিত আছেই, ভ্যাম্প। ভ্যাম্পায়ার মরেনি। এত সহজে মরতে পারে না তার মত শয়তান। দিনের বেলা জেগে জেগেই দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সে। হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। অমাবস্যার রাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর, নির্জন, আর ভূতুড়ে মনে হচ্ছে এখন জঙ্গলটাকে। সঙ্গী আরও দু-জন রয়েছে তবু মনে হচ্ছে বড় একা সে। কালোবনের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাবোধ পাগল করে দিয়েছে অনেক অভিযাত্রীকে।

নৌকা থেকে নামল দু-জনে।

রবিন গেল মুসার কপালে জলপট্টি দিতে। কিশোর বসে রইল একটা গাছের গোড়ায়। কাজ তেমন কিছু করেনি, অথচ সাংঘাতিক ক্লান্তি লাগছে। ম্যালেরিয়া তাকেও ধরছে না-তো?

মাথায় কারও হাতের স্পর্শ লাগল। না, রোগেই ধরছে! আবল-তাবল কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তাই। কিন্তু চাপ বাড়ছে মাথায়, কল্পনা নয়। ফিরে তাকাল সে। হ্যাঁ, কল্পনাই। নইলে ভ্যাম্পের চেহারা দেখবে কেন? কুৎসিত চেহারাটা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন। শার্ট-প্যান্ট শতছিন্ন, রক্তাক্ত। উষ্কখুষ্ক চুল। গালে-মুখে-হাতে কাঁটার আঁচড়।

মাথা ঝাড়া দিয়ে দুঃস্বপ্নটা দূর করতে চাইল কিশোর। পাশে রাখা রাইফেলে হাত দিল। লাফ দিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। রাইফেল তুলল। গুলি করার দরকার হলো না। তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দুর্বল ভ্যাম্প।

আবার মুখ তুলল, 'মেরো না, আমাকে দোহাই তোমার!' করুণ মিনতি। 'ওদেরকে ধরতে দিও না। কেটে ফেলবে আমাকে···ধড় থেকে কল্লা আলাদা করে ফেলবে···'

'সেটাই তোমার উচিত সাজা হবে,' কঠিন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমাদের কাছে এসেছ সাহায্য চাইতে। লজ্জা করে না?'

'শোনো, ভাই,' কেঁদে ফেলল ভ্যাম্প, 'আমরা বিদেশী। শত্রু হলেও এখন বন্ধু। আমাদের একসঙ্গে থাকা উচিত। ওদের হাতে তুলে দিও না আমাকে।'

'ওদের গাঁয়ে আগুন দিয়েছিলে?'

'ভুল করে ফেলেছিলাম।'

'কাউকে মেরেছ?'

'বেশি না। কয়েকটা জংলী মরলে কি এসে যায়, বলো?' উঠে বসল সে, থরথর করে কাঁপছে। 'আমার পিছু নিয়েছে ওরা।'

পুরো এক মিনিট ভ্যাম্পের পেছনে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। ভাবল, কেন সাহায্য করবে খুনে ডাকাতটাকে?

কিন্তু অবশেষে না করে পারল না। নিরস্ত্র একজন মানুষকে মুণ্ড কাটার জন্যে তুলে দিতে পারল না ইনডিয়ানদের হাতে।

'এসো,' ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গে চলল ভ্যাম্প, বার বার বনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। 'ঈশ্বর তোমার ভাল করবেই, ভাই।' কোলা ব্যাঙের ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। 'আমি জানি, আমাকে মারবে না তুমি। খুব ভাল ছেলে। তোমার বন্ধুরা কোথায়, ভাই? ওরাও খুব ভাল। জানি, আমাকে কিছু বলবে না। হাজার হোক, সবাই আমরা বিদেশী। ইনডিয়ানদের সঙ্গে কেন হাত মেলাব?'

ক্যাম্পে এসে এদিক ওদিক তকাল ভ্যাম্প। 'তোমার লোকজন কোথায়?'

'পালিয়েছে।'

'হারামজাদারা। বেঈমান। ইনডিয়ান তো। বিশ্বাস নেই। জানোয়ারগুলো নিয়ে গেছে?'

'না। নৌকায় ওই বাঁকের মুখেই আছে।'

'ফাইন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ভ্যাম্প। 'তোমাদের কপাল খুব ভাল। লোকজন চলে গেছে বটে, কিন্তু আমি এসে পড়েছি। আর কোন চিন্তা নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাব ভাটিতে···তা ভাই, খাবার-টাবার আছে কিছু? চব্বিশ ঘণ্টা পেটে দানা পড়েনি।'

লোকটাকে খেতে দিল কিশোর।

'ওর কি হয়েছে?' মুসাকে দেখাল ভ্যাম্প।

'জ্বর। ম্যালেরিয়া।'

'তাই নাকি? খুব খারাপ, খুব খারাপ। তা সত্যিই তোমরা একা? আর কেউ নেই?'

ঝট করে মুখ তুলল কিশোর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'তাতে কি? কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না। তুমিও একা। আমাদের কাছে বন্দুক আছে, তোমার কাছে তা-ও নেই···তোমার গলাকাটা দোস্তদের ভেসে যেতে দেখলাম কাল বিকেলে, নিজেদেরই গলা কাটা। তুমি পালালে কিভাবে? ওরা যখন লড়াই করছিল, নিশ্চয় ঝোপের মধ্যে চোরের মত লুকিয়েছিলে?'

'আমি হলাম গিয়ে নেতা, কেন ওদের সঙ্গে লড়াই করে মরতে যাব? বেতন খেয়েছে, কাজ করেছে। যাকগে, ওসব ফালতু আলোচনা করে লাভ নেই। যা ছিলাম ছিলাম, এখন ভাল হয়ে গেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কারও কোন ক্ষতি করব না। কারও একটা চুল ছিঁড়ব না, যত টাকাই দিক না কেন আমাকে। অন্যের কাজ করতে গিয়েই তো আজ এই অবস্থা, মরতে মরতে বেঁচেছি। মার্শ হারামীটা বলল জানোয়ার চুরি করতে, আর আমিও রাজি হয়ে গেলাম···ছিহ্!' বিশাল একটুরো মাংস মুখে পুরল সে। 'তোমাদের দেখে যা খুশি হয়েছি না, কি বলব। নিজের মায়ের পেটের ভাইকে দেখলেও এতটা হতাম না।'

'হ্যাঁ, হাবিল-কাবিলের মত ভাই,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

মানেটা বুঝল না ভ্যাম্প। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ।' জঙ্গলের দিকে চাইল। ফিরে তাকাল পানির দিকে।

ফুলে উঠছে খালের পানি। কিশোরও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। আগের দিন

বিকেলে যতখানি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেড়েছে পানি। স্রোত চলেছে নদীর দিকে। ভেসে যাচ্ছে উপড়ানো একটা গাছ। শুধু গাছই নয়, বন্যার সময় 'ভাসমান দ্বীপ'ও দেখা যায় আমাজনে। কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে। তারমানে আসছে প্রচণ্ড বন্যা। প্রতিবছরই এই সময়ে বন্যা হয় এ-অঞ্চলে।

'ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে উজানে,' আনমনে বলল ভ্যাম্প। কিশোরের দিকে ফিরল। 'এখন যেখানে বসে আছি, আর হপ্তাখানেক পরে এটা থাকবে কয়েক ফুট পানির তলায়। কিংবা হয়তো দ্বীপ হয়ে ভেসে যাবে। চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান বড় বড় মাটির টুকরো ভেঙে ভেসে যায় নদী দিয়ে। অদ্ভুত কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। নৌকার সঙ্গে ওগুলোর ধাক্কা লাগলে···না না, তোমাদের চিন্তা নেই। নৌকা আমি সামলাব। যেভাবেই হোক, ম্যানাও পৌঁছে দেব তোমাদের।' খেয়ে-দেয়ে অনেক সুস্থ হয়েছে সে। কুৎসিত হাসিতে হলদে দাঁত বের করে বলল, 'আর ভয় নেই তোমাদের, আমি এসে গেছি।' বুকে হাত রাখল। 'আমি পৌঁছে দেব।'

সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খট করে গাছে বিঁধল একটা তীর।

দুই লাফে ঝোপে গিয়ে ঢুকল ভ্যাম্প। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটল।

'কি হলো?' বলে উঠল রবিন।

মুসাও মাথা তুলেছে।

'জংলী!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'মুসা, শুয়ে থাকো।'

যেদিক থেকে তীর এসেছে সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, 'আমরা বন্ধু!'

লিংগুয়া জেরাল, অর্থাৎ ইনডিয়ানদের সাধারণ ভাষায় কথা বলেছে কিশোর, না বোঝার কথা নয় ওদের। কিন্তু জবাবে আরেকটা তীর উড়ে এল, অল্পের জন্যে তার কাঁধটা বাঁচল।

নয়টা ধড়ের কথা মনে পড়ল কিশোরের। চট করে তাকাল হ্যামকে শুয়ে থাকা মুসার দিকে। পাশে রবিন। ওদেরকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় লড়াইটা এখান থেকে সরিয়ে নেয়া।

ইনডিয়ানরা যেদিকে রয়েছে, একছুটে সেদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। হাতে রাইফেল। ওরা বন্ধুত্ব না চাইলে গুলি খাবে।

'এই কিশোর, এই, কোথায় যাচ্ছে?' শোনা গেল রবিনের চিৎকার।

আরেকটা তীর শিস কেটে গেল কিশোরের কানের পাশ দিয়ে। মাত্র একটা করে তীর আসে কেন? ব্যাপার কি?

কারণটা জানা গেল। মাত্র একজন ইনডিয়ান। দৌড়ে গেল কিশোর।

রাইফেল-বন্দুক চেনা আছে ইনডিয়ানদের। কিশোরের হাতে রাইফেল দেখে ঘুরে দিল দৌড়। চেঁচিয়ে পেছন থেকে ডাকল কিশোর। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গতি আরও বাড়িয়ে দিল জংলীটা।

প্রায় আধ মাইল পিছে পিছে গেল কিশোর। কিন্তু লোকটা থামল না। হারিয়ে গেল ঘনবনের ভেতরে, পোড়া গ্রামটা যেদিকে, সেদিকে।

কিশোর বুঝল, লোকটা গুপ্তচর। ভ্যাম্পের চিহ্ন অনুসরণ করে এসেছে। গ্রামে

ফিরে গিয়ে এখন জানাবে সব, দলবল নিয়ে আসবে।

ছুটে ক্যাম্পে ফিরে এল কিশোর। একটা মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না এখন। মুসাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে বজরায়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নোঙর তুলে পালাতে হবে।

দু-তিন কথায় রবিনকে সব বুঝিয়ে বলল কিশোর। হ্যামক খুলতে শুরু করল। দু-জনে ধরাধরি করে মুসাকে বয়ে নিয়ে এল নদীর পাড়ে।

উত্তেজনায় ভ্যাম্পের কথা ভুলে গিয়েছিল কিশোর, ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে পাড়ের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়েই থমকে গেল। ধ্বক করে উঠল বুক।

বজরাটা নেই আগের জায়গায়!

তীব্র স্রোতে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে ওটা। পাল তোলা। হাল ধরে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে হচ্ছে না ভ্যাম্পকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাল ধরে রয়েছে অলস ভঙ্গিতে।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নাড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'বিদায়, দোস্তরা। নরকে দেখা হবে আবার!'

তেরো

রাইফেল তুলেও নামিয়ে নিল কিশোর। রেঞ্জ অনেক বেশি। তাছাড়া ম্যাগাজিনে একটি মাত্র বুলেট অবশিষ্ট রয়েছে। তিনটে ছিল, দুটো খরচ হয়েছে ম্যানাটি মারতে।

মাথা গরম করলে চলবে না, নিজেকে বোঝাল সে। হ্যামকসহ মুসাকে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে, তার পাশে বসে পড়ল। চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।

কতখানি খারাপ অবস্থায় পড়েছে, বোঝার চেষ্টা করছে। নৌকা নেই। সঙ্গে কোন যন্ত্রপাতিও নেই যে বানিয়ে নেবে। শুধু শিকারের ছুরিটা ঝোলানো আছে কোমরে। চেষ্টা করলে হয়তো একটা ভেলা বানাতে পারবে, কিন্তু তাতে অন্তত এক হপ্তা লাগবে। এত সময় নেই হাতে, আছে বড় জোর এক ঘণ্টা। হয়তো গাঁ পর্যন্ত যেতে হবে না ইনডিয়ান লোকটাকে, ভ্যাম্পকে খুঁজতে আরও লোক যদি বেরিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ধরার জন্যে ছুটে আসবে ওরা। তাহলে এক ঘণ্টার আগেই আসবে।

জঙ্গলে গিয়ে লুকাতে পারে। কিন্তু বনে টিকে থাকার সরঞ্জাম সঙ্গে নেই, সব রয়ে গেছে বড় বজরায়।

কি কি আছে, হিসেব করল কিশোর। তিনজনের পরনের শার্ট-প্যান্ট, জুতো। তিনটে হ্যামক, একটা ছুরি, একটা রাইফেলে একটি মাত্র বুলেট, ব্যস।

এসব নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে টিকতে পারবে না। আর লুকাবে কার কাছ থেকে? ইনডিয়ানদের? চব্বিশ ঘণ্টাও বাঁচতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, জঙ্গলে ঢুকলে ভ্যাম্পের দেখা আর কোন দিনই পাবে না। পাবে না

এমনিতেও, তবে নদী পথে এগোনো গেলে ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

খালের মুখের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা দ্বীপ। ঝিক করে উঠল ভাবনাটা। বিপদের কথা ভাবল না, ঝুঁকি নিতেই হবে, এছাড়া উপায় নেই। বলল, 'রবিন, জলদি!'

কি জলদি, জিজ্ঞেস করল না রবিন। কিশোরকে ঘন ঘন দ্বীপটার দিকে তাকাতে দেখেই অনুমান করে নিয়েছে।

অন্য দুটো হ্যামক গুটিয়ে দিয়ে মুসার হ্যামকে রাখল। তারপর দু-জনে মিলে তাকে বয়ে নিয়ে চলল খালের মুখের কাছে।

ঘোলা হয়ে গেছে নদীর পানি। পাক আর স্রোত বাড়ছে। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে নিশ্চয় অ্যাণ্ডিজের ওদিকে, পানি সরে আসছে নিচের দিকে। অসংখ্য ছোট-বড় ভাসমান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে এখন, ভেসে চলেছে স্রোতে।

সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে একটা দ্বীপ। না, এটাতে ওঠা যাবে না। কচুরিপানার সঙ্গে অন্যান্য লতা আর ঝোপ মিশে বিশাল এক ভেলামত তৈরি হয়েছে। প্রায় পুরোটাই পানির তলায়, ওপরে ভেসে রয়েছে শুধু নীল ফুলগুলো। ফুটখানেক পুরু, ছেলেদের ভার সইবে না। আর যদি সয়ও, অন্য বিপদ আছে। বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে প্রাচীন স্টীমারের চাকার মত, ওগুলোতে লাগলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কচুরি পানার ভেলা।

ওটাতে উঠল না ওরা।

আরেকটা দ্বীপ এল। ঝোপঝাড় লতাপাতা শক্ত হয়ে লেগে তৈরি হয়েছে। বড় একটা ঝোপ উপড়ে আটকে গিয়েছিল হয়তো চোখা পাথরে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও ঝোপ, লতাপাতা, গাছের ডাল, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, পাথরের আর সাধ্য হয়নি আটকে রাখার। ছুটে ভেসে চলে এসেছে ভেলাটা। এটাও ভাসমান দ্বীপ, কিন্তু মাটি নেই এতে।

সবচেয়ে আজব দ্বীপ হলো যেগুলোর মাটি আছে, ঝোপঝাড়, এমনকি গাছও আছে। পুরোপুরি দ্বীপ, ভাসমান, এবং সচল। প্রকৃতির এক আজব খেয়াল। কিশোর শুনেছে, ওগুলোর কোন কোনটা দুশো ফুট লম্বা হয়, বিশ ফুট পুরু। গাছপালা, মাটির বোঝা নিয়ে কি করে ভেসে থাকে, সেটা এক বিস্ময়।

বাছবিচারের সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই। ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়তে হবে একটাতে। তবে কচুরিপানা কিংবা শুধু ঝোপের তৈরি ভেলায় ওঠা চলবে না।

রবিনকে কথাটা বলল কিশোর। রবিনও একমত হলো। মুসাকে কিছু বলে লাভ নেই, সে এখনও জ্বরের ঘোরে রয়েছে।

এগিয়ে আসছে আরেকটা ভেলা, ছোটখাটো একটা মাঠের সমান। তীর ঘেঁষে চলছে, কোণগুলো ঘষা খেতে খেতে আসছে পাড়ের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, ওটাতেই উঠবে।

সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় উঠে পড়ল সে, দু-হাতে ধরে রেখেছে হ্যামকের কোণ। অন্য দুই কোণ ধরে রবিনও উঠে পড়ল। খসে গেল কিনারের মাটি, লাফিয়ে

সরে গেল সে, কিন্তু হ্যামক ছাড়ল না। দ্বীপের ভেতরের দিকে সরে এসে তারপর নামল ওটা।

সামনে নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে গভীর পানিতে সরে এসেছে স্রোত, দ্বীপটাও সরে চলে এল। আজব-যানে চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলল তিন গোয়েন্দা।

দ্বীপে ওঠাটা পাগলামি মনে হচ্ছে এখন কিশোরের। কিন্তু তীরে বসে মুণ্ড কাটা যাওয়ার অপেক্ষায় থাকার চেয়ে এটা ভাল। যা হওয়ার হবে, ভেবে লাভ নেই। আপাতত জংলীদের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল। তাছাড়া, ড্যাম্প যেদিকে গেছে সেদিকেই চলেছে ওরা।

ভাসমান দ্বীপের চেয়ে অনেক দ্রুত এগোচ্ছে ড্যাম্প, সন্দেহ নেই। কারণ সে রয়েছে নৌকায়। দ্বীপের চেয়ে অনেক হালকা, তার ওপর রয়েছে পাল। কিন্তু যদি বাতাস পড়ে যায়? কিংবা কোন বালির ডুবোচরে আটকায়? এমনও হতে পারে, ভেসে যাওয়া কোন গাছের সঙ্গেই আটকে গেল। যদিও সবই অতিকল্পনা, কিন্তু ভাবনাগুলো আসতেই থাকল কিশোরের মাথায়। ক্ষীণ একটা আশা—যদি ঘটে? যদি ঘটে যায় কোন কারণে?

নিজেদের ভাসমান রাজ্যটা ঘুরেফিরে দেখল কিশোর আর রবিন। পায়ের তলায় মাটি খুব শক্ত, খসে পড়ার ভয় নেই। আধ একর মত হবে। বেশির ভাগটাই ঘাসে ঢাকা। ছোট ছোট গাছপালাও আছে—সিক্রোপিয়া, রবার গাছ আর বাঁশ। বাঁশ বেশ লম্বা—দ্রুত গজায় বলে, কিন্তু অন্য গাছগুলো কয়েক ফুটের বেশি না।

হিসেব করে ফেলল কিশোরের হিসেবী মন। দ্বীপটা বছরখানেকের পুরানো। আগের বছরের বন্যায় আধ একর পলিমাটি জমেছিল কোন জায়গায়, বন্যা চলে যাওয়ার পর দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার ওপর গাছের চারা গজিয়েছে। এ-বছর স্রোত ওই দ্বীপের তলা কেটে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে আস্ত দ্বীপটাকে, গাছপালাসহ।

কিন্তু বছরখানেকের পুরানো যদি হবে, দ্বীপের শেষ মাথার ওই মস্ত গাছটা এল কিভাবে? দেখেই বোঝা যায়, একশো বছরের কম হবে না ওটার বয়েস। ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দু-জনে। বিশাল তুলা গাছ। কাণ্ডটা পানির তলায়, কিন্তু ডালপালাগুলো ছড়িয়ে উঠে গেছে পঞ্চাশ ফুট ওপরে।

না, এই গাছ এ-দ্বীপের নয়। ভেসে আসার সময় গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল দ্বীপের, শক্ত হয়ে আটকে গেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। ভাল। হ্যামক টানানোর চমৎকার জায়গা। মাটিতে থাকা নিরাপদ নয়। সাপের ভয় আছে। আরও নানা পোকামাকড়, বিশেষ করে সামরিক পিঁপড়ে। বন্যার সময় সবাই আশ্রয় খোঁজে। শুকনো জায়গা দেখলেই উঠে পড়ে।

কিচির মিচির শোনা গেল।

'বানর,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

কিশোরও মুখ তুলে তাকাল। তাদের দিকেই চেয়ে আছে ছোট প্রাণীটা। বানভাসির শিকার।

যানটা মোটামুটি ভালই, টিকবে ভরসা হচ্ছে। এখন প্রধান সমস্যা হলো খাবারের। আলোচনায় বসল দুই গোয়েন্দা।

বাকি দিনটা খাবার খুঁজে বেড়াল ওরা। বাঁশের কোঁড় খুঁজল, কিন্তু সবই বড় বড়। খাওয়ার মত কচি একটাও নেই। একটা ঝোপে ছোট ছোট জামের মত কিছু ফল পেকে আছে। কয়েকটা খেয়েই বমি করে ভাসাল দু-জনে, খাওয়ার অযোগ্য, বিষাক্ত। ছোট একটা গাছ দেখল, আমাজনের বিখ্যাত কাউট্রি বা গরুগাছ। ছাল কাটলে গরুর দুধের মত সাদা কষ বেরোয়, প্রোটিন সমৃদ্ধ। কিন্তু এই গাছটার ছাল কেটে কয়েক ফোঁটার বেশি রস পাওয়া গেল না, একেবারে চারা।

'সারভাইভাল' এর ওপর যত বই পড়েছে ওরা, প্রায় সবগুলোতেই একটা ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে ঃ জঙ্গল, মেরু অঞ্চল, মরুভূমি, সাগর, সবখানেই বেঁচে থাকা যায় সামান্য কষ্ট করলে। কিন্তু এখন তাদের কাছে মোটেই সামান্য মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। এতক্ষণ চেষ্টা করেও খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারল না।

নদীতে মাছ অনেক আছে। কিন্তু বড়শি বা জাল নেই, ধরবে কি দিয়ে? ইনডিয়ানরা ধরে তীর ধনুক কিংবা বর্শা দিয়ে। ছুরি দিয়ে বাঁশ কেটে, চেঁছে, দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করে একটা বল্লম বানানো গেল। কিন্তু দ্বীপের পাড়ে মাছ ধরতে এসে হতাশ হলো ওরা। যা স্রোত, মাছ দেখাই যায় না। বেশি উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে পানিতে পড়লে শেষ। আর উঠতে পারবে না দ্বীপে।

ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ভিজিয়ে দিয়ে গেল জামাকাপড়। দুটো হ্যামক ঢাকা দিয়ে মুসাকে শুকনো রাখা গেছে কোনমতে।

বৃষ্টির পর এল জোর বাতাস। আট-নয় মাইল চওড়া খোলা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল তুফানের মত, দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি তুলে দিয়ে গেল ছেলেদের। মনে হলো মেরু অঞ্চলে ঢুকেছে ওরা। অথচ রয়েছে বিষুবরেখার খুব কাছাকাছি।

অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত খাবার জোগাড়ের চেষ্টা করল ওরা। কিছুই পেল না। রাতে গাছের ডালে হ্যামক বেঁধে তাতে শোয়াল মুসাকে, আরেকটা দিয়ে ঢেকে দিল, বৃষ্টি এলে যাতে না ভেজে সেজন্যে। বাকি একটা হ্যামকে পালা করে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল রবিন আর কিশোর।

অন্ধকার রাতে এই শীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আগুন। জ্বালাতে পারবে না। ম্যাচ নেই। বিকল্প কোন উপায়ে হয়তো জ্বালানো যায়, কিন্তু জংলীরা দেখে ফেলার ভয় রয়েছে।

ক্ষুধায়, শীতে কাতর হয়ে হ্যামকে গিয়ে উঠল কিশোর।

গাছের ডালে বসে পাহারায় রইল রবিন। ভাসমান দ্বীপে কোন অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে। সাবধান থাকা উচিত। কয়েক ঘণ্টা পরে কিশোর এসে তার জায়গায় বসবে।

অন্ধকারে ছুটে চলেছে দ্বীপ। স্রোতের ওপর ভরসা এখন। সবচেয়ে বড় ভয়, নদীতে গজিয়ে থাকা আসল দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা লাগার। নিমেষে গুঁড়িয়ে যাবে তাহলে এটা। কিন্তু স্রোতের গুণাবলী সম্পর্কে যতখানি জানে রবিন, কোন কিছুর

সঙ্গে ধাক্কা খায় না, পাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যায়। শুনেছে, এসব ভাসমান দ্বীপের সঙ্গে রাতে ক্যানু বেঁধে আরামসে ঘুমায় ইনডিয়ানরা। সকালে উঠে দেখে নিরাপদে পেরিয়ে এসেছে তিরিশ-চল্লিশ মাইল।

হ্যাঁ, ভ্যাম্পের তুলনায় এই একটা সুবিধে তাদের রয়েছে। অন্ধকারে নৌকা চালানোর সাহস করবে না ভ্যাম্প, কোথাও থামতেই হবে। কিন্তু ওরা চলবে। এগিয়ে যাবে অনেক পথ।

কখনও কখনও তীরের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে দ্বীপ। বনের হাঁকডাক কানে আসছে। একবার তো এত কাছে একটা জাগুয়ার গর্জে উঠল, রবিনের মনে হলো, ওটা দ্বীপেই উঠে এসেছে। এমনিতেই বিপদের কূল নেই, তার ওপর জাগুয়ার উঠে এলে···ধ্যাত্তোর! যা হয় হোকগে! ভাগ্যের ওপর কারও হাত নেই। এই যে এই বিপদ পড়েছে, চব্বিশ ঘন্টা আগেও কি ভাবতে পেরেছিল এমন ঘটবে?

মাঝরাতের দিকে কিশোরকে তুলে দিল রবিন।

নিরাপদেই কাটল রাতটা। সকালে বানরটার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল রবিনের। ভোরের নিয়মিত প্রাত্যহিক কোলাহল জুড়েছে ওটা, সঙ্গীসাথী না পেয়ে একাই শুরু করেছে।

মুসার সঙ্গে কথা বলছে কিশোর।

খুশি হলো রবিন। মুসার শরীর তাহলে কিছুটা ভাল। নেমে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বর নেই।

মলিন হাসি হাসল মুসা।

পেটে আগুন জ্বলছে তিনজনেরই। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ করে মুসার জন্যে। এমনিতেই কাহিল, খাবার না পেলে আর মাথাই তুলতে পারবে না। হয়তো জ্বরও ফিরে উঠবে আবার।

কিন্তু কি ব্যবস্থা করবে?

বিশুদ্ধ খাবার পানিও নেই। নদীর কাঁচা পানি খেলেই ধরবে টাইফয়েড কিংবা আমাশয়ে। ফুটিয়ে খেতে হবে। আগুন পাবে কোথায়? আর কেটলি? কোন পাত্রই তো নেই সঙ্গে।

কেটলির ব্যবস্থা করে ফেলল কিশোর। বাঁশ দিয়ে। একটা কচি বাঁশের গোড়ার দিকে একটা গাঁটের ঠিক নিচে থেকে কাটল। গাঁটের ওপরে আট ইঞ্চিমত রেখে বাকিটা কেটে ফেলে দিল। সারভাইভালের বইতে পড়েছে, কাঁচা বাঁশে পানি ফুটানো যায়, ভেতরে পানি ভরা থাকলে বাঁশ পোড়ে না।

কেটিল তো হলো, এবার আগুন?

আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চালাল কিশোর আর রবিন। হ্যামকে শুয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু ক্লান্ত মুসা। কিছুই করার নেই তার। কোন সাহায্য করতে পারবে না।

গোড়াতেই সমস্যা দেখা দিল। আগুন জ্বালানোর জন্যে চাই শুকনো কাঠকুটো। নেই। সব ভিজে আছে আগের দিনের বৃষ্টি আর ভোর রাতের শিশিরে।

তবে জ্বালানীর ব্যবস্থা করা গেল। তুলা ফলের খোসা ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরোল শুকনো পেঁজা পেঁজা তুলা। গাছের ডালের ভেজা বাকল কেটে ফেলে দিয়ে বের করা হলো মোটামুটি শুকনো লাকড়ি। তুলোর ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো ওগুলো। তুলাতে আগুন ধরলে পরে লাকড়িতেও ধরবে।

এবার পাথর আর ইস্পাত দরকার, ঘষা দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ফেলবে তুলায়। ইস্পাত আছে, ছুরিটা। কিন্তু পাথর? আমাজনে পাথরের খুব অভাব, বিশেষ করে বন্যা উপদ্রুত এলাকায়। আর ভাসমান দ্বীপে থাকে পলিমাটি, পাথর থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

সারা দ্বীপ আঁতিপাতি করে খুঁজেও একটা পাথর পেল না ওরা।

অন্যভাবে চেষ্টা করল জ্বালানোর। চ্যাপ্টা কাঠে আরেকটা কাঠির মাথা জোরে জোরে ঘষলে উত্তাপে নাকি আগুন জ্বলে ওঠে। সেই চেষ্টাও করে দেখা হলো। ডলে ডলে দু-জনের হাতের চামড়াই শুধু ছিলল, আগুন জ্বলল না।

ইনডিয়ানরা আরেক কায়দায় আগুন জ্বালায়। চ্যাপ্টা কাঠে একটা খাঁজ কাটে। কাঠির মাথা চোখা করে ওই খাঁজের ওপর জোরে জোরে ডলে খুব তাড়াতাড়ি। সেই একই ব্যাপার—উত্তাপে জ্বলে ওঠে আগুন।

কিন্তু কিশোর আর রবিন চেষ্টা করেও পারল না। আগুন তো দূরের কথা, ধোঁয়াই বেরোল না। এসব কাজের জন্যেও অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দরকার।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হতাশ হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কি যেন লাগল আঙুলে। আনমনেই বের করে আনল।

চকচকে জিনিসটা কিশোরের হাতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'পেয়েছি!'

অবাক হয়ে কিশোরও তাকাল হাতের দিকে। হাসি ফুটল।

ক্যামেরার একটা লেন্স। একটা বদল করে অন্য একটা লেন্স লাগানোর সময় এটা খুলে পকেটে রেখেছিল যে, পকেটেই রয়ে গেছে।

ভেজা ধোঁয়ার গন্ধ জীবনে আর এত ভাল লাগেনি কখনও ওদের কাছে। বুক ভরে টানতে গিয়ে বেদম কাশি উঠল রবিনের।

হ্যামকে শুয়ে হি-হি করে হাসল মুসা। ভারিক্কি ভাবটা কেটে গিয়ে হালকা হলো পরিবেশ। অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটল তিনজনের মুখে।

পানি ফুটিয়ে আগে পিপাসা মেটাল ওরা।

এবার খাবার। মাছ ধরতে হবে, যেভাবেই হোক। আর কিছু পাওয়া যাবে না এখানে। বড়শির কাঁটা হয়তো বানানো যাবে, তবে আগে দরকার সুতা। ঘাস পাকিয়ে বানানোর চেষ্টা করল। শক্ত হয় না, ছিঁড়ে যায়। সমাধান করে দিল একটা ছোট গাছ। এর আঁশ দিয়ে ব্রাশ, ঝাড়ু আর দড়ি তৈরি করা যায়।

দড়ি তো হলো, এবার বড়শি চাই। গাছের বাঁকা ডালের কথা ভাবল কিশোর। সাইজমত কেটে একমাথা চোখা করলে কি হবে? উঁহুঁ। অন্য কিছু দরকার।

আগুন দেখে মাথার ওপর এসে কিচির মিচির শুরু করল বানরটা।

'কিশোর,' দুর্বল কণ্ঠে ডাকল মুসা। ইশারায় বানরটাকে দেখাল।

'দূর, কি বলো?' রবিন মাথা নাড়ল। 'সাপবিচ্ছু তো অনেকই খেলাম এই জঙ্গলে এসে। আর যাই বলো, বানর খেতে পারব না। মনে হবে মানুষ খাচ্ছি।'

এই দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। একেবারে মাথার ওপর, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না অবশ্য। বাঁশ দিয়ে বানানো বল্লমটা তুলে নিল সন্তর্পণে। বানরটা কিছু বোঝার আগেই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারল।

বল্লমে গেঁথে ধুপ করে পড়ল বানরটা।

'খাবে তাহলে!' রবিন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কেন, অসুবিধে কি?' হাসল কিশোর। 'অনেকেই তো খায়। ইনডিয়ানদের প্রিয় খাবার। আফ্রিকার পিগমিরা তো হরহামেশাই খায়। আর চীনারা কি করে জানো না?'

এসব সবই জানে রবিন। আস্ত বানরশিশুর চামড়া ছিলে, দামী ডিশে করে টেবিলে দেয়া হয়। কাঁচা। চীনের কিছু অঞ্চলের মানুষের কাছে এটা খুব প্রিয় খাবার। বিশেষ করে বানরের কাঁচা মগজ। দাম খুব বেশি বলে সাধারণ মানুষেরা খেতেই পারে না, যাদের পয়সা আছে তারাই কেবল পারে। মাথা নাড়ল সে, 'আমি খাব না। মরে গেলেও না। ওয়াক-থুহ্! শেষমেষ বানরের মগজ!'

কিন্তু খাওয়ার জন্যে মারেনি কিশোর। চামড়া ছুলে টুকরো টুকরো করে কাটল মাংস। হাড় দিয়ে চমৎকার কয়েকটা বড়শি হলো। ওগুলো পিয়াসাভার সরু দড়িতে বেঁধে, বাঁশ কেটে ছিপ বানাল। মাংসের একটা টুকরো গেঁথে বড়শি ফেলল পানিতে। দেখা যাক, ভাগ্য কি বলে?

ফেলতে না ফেলতেই টান পড়ল ছিপে। পিরানহা নাকি? তাহলেও চলে। খেতে ভালই।

ছিপ তুলল কিশোর। বিশেষ জোর লাগল না। আরে, এ-কি! আস্ত এক ফুটবল! রবিনও অবাক।

ছুরির মাথা দিয়ে খোঁচা মারল কিশোর। ঠুস করে বেলুনের মত ফাটল ওটা। মাছটা ছোট, পেটটাকেই ফুলিয়ে এত বড় করেছে। 'বেলুন মাছ,' বিড়বিড় করল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। এ-মাছ খাওয়া যায় না, বিষাক্ত।

আবার ছিপ ফেলল।

এবার উঠল বেশ বড়সড় একটা পেইচি। খাওয়া চলে, স্বাদ ভাল।

পেট ঠাণ্ডা হলো।

আর কোন কাজ নেই। আবার মাছ ধরতে বসল কিশোর আর রবিন।

আবার ছিপে টান পড়ল। বেশ জোর লাগল এবার তুলতে।

'সাপ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। শরীর মোচড়াচ্ছে প্রাণীটা।

'বাইন,' বলল কিশোর। 'খাওয়া যেতে পারে।' বুঝতে পারল না ওটা কোন প্রজাতির। বড়শি থেকে খুলে নেয়ার জন্যে ধরতেই চিৎকার করে চোখ উল্টে পড়ল, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা।

চোখ মেলে দেখল, রবিনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

'ইস্, কি ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলে,' বলল উদ্বিগ্ন রবিন। 'কি হয়েছিল?'

মুসাও হ্যামক থেকে মাথা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে।

জবাব না দিয়ে কাত হয়ে বাইনটার দিকে তাকাল কিশোর। বড়শি ছুটে গেছে মুখ থেকে, ঘাসের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে রবিনের দিকে।

উঠে বসল সে। একটা লাঠির জন্যে তাকাল এদিক ওদিক।

রবিনেরও চোখ পড়ল বাইনটার ওপর।

'না না, ছুঁয়ো না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সরানোর জন্যে ছুঁয়ে ফেলেছে রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার, তবে কিশোরের মত চোখ উল্টে পড়ল না। কারণ সে ছুঁয়েছে মাত্র, ধরেনি।

হাতের অবশ ভাবটা কাটল ধীরে ধীরে।

'হলো কি তোমাদের?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আস্ত জেনারেটর,' ভয়ে ভয়ে বাইনটার দিকে তাকাল রবিন। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ওটা। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। হাত ঝাড়ছে এখনও।

গর্ত খুঁড়তে শুরু করল কিশোর।

'কি করছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

জবাব দিল না কিশোর। গর্ত খুঁড়ে তাতে পানি ভরে, একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলল বাইনটাকে। তারপর বলল, 'থাক।'

'কি হবে রেখে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'খাওয়া যাবে?'

'দেখা যাক। আর কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে তো খাবই। বাইন মাছ অখাদ্য নয়।'

'কিন্তু ওটাকে ধরলেই তো চিত হয়ে যাচ্ছ? কি আছে ওর গায়ে?'

'এখনও বুঝতে পারছ না?' রবিন বলল। 'বিদ্যুৎ। ওটা বিদ্যুৎ-বাইন।'

'ও। আচ্ছা, ইলেকট্রিক শক তো বাত সারায় শুনেছি। ম্যালেরিয়া সারায় না?'

'সারায়। চিরতরে,' জবাব দিল কিশোর।

'মানে?'

'এমন সারানো সারাবে, কোনদিন আর ম্যালেরিয়া হওয়ারই সুযোগ পাবে না। সোজা পরপারে পাঠিয়ে দেবে তোমাকে।'

কিশোরের রসিকতা বুঝতে পেরে একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল মুসা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কত ভোল্ট?'

'যে শক খেয়েছি, তিনশোর কম তো হবেই না।'

'যত বেশি বড় হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও নিশ্চয় তত বেশি?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'সেটা নির্ভর করে কোন জাতের বাইন, তার ওপর। বিদ্যুৎ-বাইনেরও অনেক প্রজাতি। কোন কোনটার জেনারেটর সাংঘাতিক শক্তিশালী। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা একটা বাইন ধরা পড়েছিল। পাঁচশো ভোল্ট

বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারত ওটা।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'মানুষ মারা তো কিছুই না!'

'মানুষ কি, ঘোড়াও মেরে ফেলতে পারে। পানিতে নেমে গরুঘোড়া অনেক মারে। বাইন মাছ গায়ে লাগে, শক খেয়ে অবশ হয়ে যায় শরীর। তারপর ডুবে মরে।'

কি মনে পড়ায় লাঠি দিয়ে আবার বাইনটাকে তোলার চেষ্টা করল কিশোর।

'কি হলো? আবার তুলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রকফেলার ল্যাবরেটরিতে দেখেছি, বড় বড় বাইনকে লেজ ধরে পানি থেকে তুলছে। অবাক হয়েছি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি, লাইন কেটে বিদ্যুৎ চলাচল বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ওগুলোর। ডায়নামোটা থাকে বাইনের মাথায়। লম্বা একটা নার্ভ ওখান থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত চলে যায়। ওই নার্ভের কোন জায়গায় কেটে দিলে তার নিচের দিকে আর বিদ্যুৎ যেতে পারে না। তখন ওখানে ধরলে আর অসুবিধে নেই।'

'এক্সপেরিমেন্ট করবে?'

'হ্যাঁ,' বলতে বলতেই লাঠির এক খোঁচায় বাইনটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল কিশোর। লাঠি দিয়ে চেপে ধরল লেজের ছয় ইঞ্চি ওপরে। রবিনকে বলল, 'ধরো তো, লাঠিটা শক্ত করে ধরো।'

ছুরি বের করল সে। কাঠের হাতল, বিদ্যুৎ-নিরোধক। এক পোঁচে কেটে ফেলল বাইনের নার্ভ যে জায়গায় থাকার কথা সেখানটা। সাবধানে আঙুল ছোঁয়াল লেজে। শক লাগল না। জোরে চাপ দিল। না, নেই। মুঠো করে চেপে ধরল লেজ। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'অপারেশন সাকসেসফুল!'

বাইনটাকে আবার গর্তে রেখে দেয়া হলো।

আরও কয়েকটা পেইচি ধরা পড়ল সেদিন। খাবার আর পানির সমস্যা নেই। দ্বীপটা ভেঙে না গেলে এটাতে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মুসার অসাধারণ। দ্রুত সেরে উঠতে লাগল সে।

পরদিন দূরে একটা ক্যানূ দেখা গেল।

তার পরদিন দেখা গেল বড় বজরাকে। তীরে নোঙর করা।

দূর দিয়ে সরে যেতে লাগল ভাসমান দ্বীপ। হতাশ চোখে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। ক্ষোভে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কুমিরের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল মুসা, ঠেকাল কিশোর। কুমির ছাড়াও ভয়ঙ্কর পিরানহা আছে নদীতে।

ভ্যাম্পকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বনে ঢুকেছে জানোয়ারগুলোর খাবার জোগাড় করতে। আচ্ছা, কোনটাকে কি খাওয়াতে হয় জানে তো?—ভাবছে কিশোর। যত্ন নিতে পারছে ঠিকমত?

আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল বজরা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ওরা, ভাটির দিকে চলছে না আর দ্বীপ।

পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে চওড়া একটা খালের মুখের দিকে। মূল স্রোত থেকে কিভাবে যেন সরে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়েছে।

চূড়ান্ত হলো হতাশা। বড় বজরাকে ধরার আশা একেবারে শেষ। চোখের সামনে দিয়ে পাল তুলে শাঁ শাঁ করে পার হয়ে যাবে নৌকাটা, ওরা কিছুই করতে পারবে না। বাঁশ কেটে লগি বানানো যায়, কিন্তু লগি দিয়ে ঠেলে এক চুল নড়াতে পারবে না এত ভারি দ্বীপ।

ভাটির দিকে না গিয়ে পাশে সরে ঘূর্ণাবর্তে পড়েছে কেন দ্বীপটা, বুঝতে পারল কিশোর। বাতাস এখন উজান বইছে। দ্বীপের তুলা গাছে ধাক্কা দিচ্ছে জোরাল বাতাস, ঠেলছে। ভাটিয়াল স্রোতের তোড় কম। বিপরীত স্রোত ঠেলে না পারছে উজানে যেতে, বাতাসের জন্যে না ভাটিতে নামতে পারছে, বেকায়দায় পড়ে পাশে সরতে বাধ্য হয়েছে দ্বীপ।

উজানে বড় বজরাকে আসতে দেখা গেল। পাল নেই। তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই, কারণ বাতাস বিপরীত। স্রোতে ভেসে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নৌকাটা।

আশা জাগল আবার ছেলেদের মনে। দ্বীপের মতই বড় বজরাও যদি বিপথে সরে, ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ে?

ভ্যাম্পের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে হতেই রাইফেলে হাত বোলাল কিশোর।

'জলদি,' বলল সে, 'গাছের আড়ালে লুকাও, সবাই।'

তুলা গাছের ডালপালার আড়ালে লুকাল তিনজনে।

ডালে ঝোলানো হ্যামকগুলোর ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। ভ্যাম্পের নজরেও পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওগুলো খুলে আনল।

সরে যাচ্ছে নৌকা। নাহ্, আশা আর নেই। বিপথে পড়েনি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ইয়াল্লা!'

ঝটকা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরে গেছে। মূল স্রোত থেকে সরে আসতে শুরু করল পাক খেয়ে খেয়ে। পড়েছে ঘূর্ণির টানে!

একটিমাত্র বুলেট রয়েছে রাইফেলে, মিস করতে চাইল না কিশোর। অস্ত্রটা তুলে দিল মুসার হাতে।

ভ্যাম্পকে খুঁজল তিনজোড়া চোখ। নৌকা আরও কাছে এলে দেখা গেল ডেকে শুয়ে আছে সে। নড়ছে না, নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

জন্তু-জানোয়ারের ডাক কানে আসছে। বোঝা যায়, ওরা ক্ষুধার্ত। নাকুর চিঁ-চিঁ, জাগুয়ারের ভারি গোঙানি, আর ময়দার কিচির মিচিরের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাখিগুলোর নানারকম ডাক।

বজরার পরিচিত পরিবেশ দেখে ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার। মাস্তুলে ঝুলন্ত শুকনো কিকামুকেও মনে হচ্ছে যেন পরম আত্মীয়। ধ্যানমগ্ন হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বু বগা, ভাল লাগছে তাকে। সুন্দর খুদে হরিণ, তাকে ভাল লাগছে। এমনকি

ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকেও এই মুহূর্তে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে ওদের।

দ্বীপের কাছাকাছি চলে এল বড় বজরা, চারপাশে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, যেন গ্রহের চারপাশ প্রদক্ষিণ করছে একটা উপগ্রহ। কাছে আসছে ধীরে ধীরে। পানির গভীরতা এখানে কম, মাঝে মাঝেই ঘষা লাগছে দ্বীপের তলায়। দ্বীপ ভেঙে যাওয়ার ভয় করছে ছেলেরা।

তবে ভাঙল না। তীরে ঠেকে আটকে গেল। নৌকাটা নাক সোজা করে এসে ধাক্কা খেল দ্বীপের কিনারে, নরম মাটিতে গেঁথে গেল গলুই।

'দারুণ হয়েছে!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'এবার যাওয়া যায়, নাকি?'

'চলো,' বলল কিশোর।

হ্যামকগুলো নিল রবিন। মুসার হাতে রাইফেল। গর্ত থেকে লেজ ধরে বাইনটাকে তুলে নিয়ে এগোল কিশোর।

নিঃশব্দে এসে নৌকায় উঠল ওরা।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে ভ্যাম্প, কি ঘটছে খবরই নেই।

ভ্যাম্পের মাথা সই করে রাইফেল তুলল মুসা। তার হাত চেপে ধরল কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারায় বোঝাল, না। অ্যানাকোণ্ডার দিকে তাকাল একবার। ঘুমাচ্ছে। পেট ফোলা, ম্যানাটি হজম হতে দেরি আছে। জ্বলন্ত হলুদ চোখে তার দিকে তাকাল বিগ ব্ল্যাক। মৃদু গোঁ গোঁ করল মিস ইয়েলো। নাকু পাগল হয়ে গেছে, দড়ি ছিঁড়ে চলে আসতে চাইছে। বিরাট লাফ দিয়ে মুসার কাঁধে এসে নামল ময়দা, আদর করে ঠাস ঠাস দুই চাপড় লাগাল গালে।

টলডোর ভেতরে উঁকি দিল মুসা। নড়েচড়ে উঠল বোয়া। তারপর আবার কুণ্ডলীর ওপর মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পেট এখনও অনেক ফোলা।

কিশোর তাকাল আবার ভ্যাম্পের দিকে। চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কোমরের খাপে মুসার বাবার ·৪৫ অটোমেটিক। নিচু হয়ে সাবধানে পিস্তলটা খুলে হাতে নিল সে। আরেক হাতে বাইনটা। শরীর মোচড়াচ্ছে ওটা, নিজের শরীর বেয়েই মাথা ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। পারছে না। কয়েক ইঞ্চি উঠেই পড়ে যাচ্ছে আবার।

ভ্যাম্প তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার পাঁজরে আলতো একটা লাথি লাগানোর লোভ সামলাতে পারল না কিশোর।

'আঁউ! কোন হারামীরে···' চোখ মেলেই স্থির হয়ে গেল ভ্যাম্প। চোখে অবিশ্বাস। হাঁ হয়ে গেল মুখ। হাত চলে গেল খাপের কাছে। পিস্তলটা পেল না।

'এই যে, আমার হাতে,' হাসিমুখে পিস্তলটা দেখাল কিশোর।

'তবে রে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যাম্প। পিস্তল ছিনিয়ে নিতে এগোল।

সরে গেল কিশোর। বাইনটা ছুঁড়ে দিল ভ্যাম্পের গলা সই করে।

বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল ডাকাতটা। ঝট করে হাত চলে গেল গলার কাছে। টলছে। কয়েক মুহূর্তের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

চোদ্দ

ভ্যাম্পের গলা থেকে পাটাতনে নামল বাইন। বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল নৌকা
কিনারে।

ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর আটকে রেখে লাভ নেই। লেজ ধরে তুল
কিশোর। 'অনেক কষ্ট দিয়েছি, বাইন, কিছু মনে রাখিস না। অনেক উপকা
করেছিস আমাদের। গুড বাই।' আলতো করে ছেড়ে দিল পানিতে।

সাপের মত কিলবিল করে উঠল একবার ওটা, শরীরটাকে এক মোচড় দিয়ে
তলিয়ে গেল।

'এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়,' ভ্যাম্পকে দেখাল রবিন। 'হুঁশ ফিরলেই তে
গোলমাল শুরু করবে।'

'হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি,' পরামর্শ দিল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'শাস্তি আরেকটু বেশি পাওনা হয়েছে ওর।'

'কি?'

অ্যানাকোণ্ডার খাঁচার দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে বলল
'দুটো তালা আছে না, বড়টা নিয়ে এসো। আর একটা শেকল, জানোয়ার বাঁধা
জন্যে যে এনেছিলাম। তাড়াতাড়ি।'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝল না রবিন। প্রশ্নও করল না। কথা না বাড়িয়ে গি
ঢুকল টলডোর ভেতরে। কি করে দেখতেই পাবে।

চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা খাঁচার মেঝেতে
শরীরের বেশির ভাগ বাথটাবের ভেতরে। আরামে ঘুমাচ্ছে।

আস্তে করে দরজা খুলল কিশোর। তিনজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে ভ্যাম্পকে
খাঁচায় ভরল।

দরজায় শেকল পেঁচিয়ে তালা লাগিয়ে দিল কিশোর।

ভ্যাম্পের মাথার মাত্র এক ফুট দূরে অ্যানাকোণ্ডার বিশাল মাথা।

খুব ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে ভ্যাম্পের, চেহারা রক্তশূন্য। হুঁশ আর ফেরে না
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। মরে যাবে না-তো? বৈদ্যুতিক শক খেলে যা
করতে হয়, সে-সব করা দরকার?'

খাঁচার দরজা আবার খুলতে যাবে কিশোর, এই সময় শিহরণ খেলে গেল
ভ্যাম্পের বিশাল কাঠামোটায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়ল, জোরাল হলো। চো
মেলল সে। চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখল বিশাল কুৎসিত মাথাটা। ভী
চমকে গিয়ে এত জোরে উঠে বসল, খাঁচার বাঁশে ঠুকে গেল তার মাথা।

দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে। দেখল, খাঁচায় আটকা পড়েছে।

দরজায় খামচি মারল সে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খোলো! বেরোব!'

'চুপ,' ঠোঁটে হাত রাখল কিশোর, কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে

'তোমার দোস্ত জেগে যাবে। ধরে টুক করে গিলে ফেলবে তাহলে।'

'বেরোতে পারলে,' খসখসে কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল ভ্যাম্প, 'খুন করব আমি তোদের!'

'জানি। সেজন্যেই তো আটকে রেখেছি।'

বাঁশ ভাঙার চেষ্টা করল ভ্যাম্প। কিন্তু অ্যানাকোণ্ডারই সাধ্যে কুলোয়নি, সে কি করে পারবে? খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

নড়ে উঠল সাপের মাথা। খাঁচার বেড়ায় শরীর মিশিয়ে ফেলতে চাইল ভ্যাম্প, রক্তলাল চোখদুটো ছিটকে বেরোবে যেন কোটর থেকে। সাপটার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই বোঝা গেল, নইলে এত ভয় পেত না। ভরা পেটে ঢোঁড়া সাপের মতই নিরীহ ওই দানব। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে ঘুম থেকেই জাগে না।

গালাগাল শুরু করল ভ্যাম্প।

কান দিল না ছেলেরা।

তাদেরকে ভয় দেখাতে না পেরে সুর পাল্টাল ভ্যাম্প। 'দেখো, রসিকতা অনেক হয়েছে। আর ভাল লাগছে না। আমি জানি, তোমরা খুব ভাল ছেলে। আমি মরে যাই, সেটা নিশ্চয় চাও না?'

'না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'তাহলে পুলিশের হাতে আর তুলে দিতে পারব না। তোমার যা স্বভাব-চরিত্র, ভাল করতে হলে কিছুদিন জেলে বাস করা প্রয়োজন। তবে তাতেও ভাল হবে কিনা কে জানে।'

'দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ, এই জঙ্গলে টিকতে পারবে না আমার সাহায্য ছাড়া। আমি তোমাদের ভালই চাই।'

'তা তো বটেই, আহা!' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল কিশোর। 'আমাদের বাঁচানোর জন্যে কত দরদ। সে-জন্যেই বুঝি ইনডিয়ানদের কাছে ফেলে নৌকা নিয়ে পালিয়েছিলে?'

'দেখো ভাই, আমাকে ভুল বুঝছ তোমরা। তোমাদের নৌকা আর জানোয়ারগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কেবল। ভাল কাজ দেখিয়েছি, তাই না? একটা জানোয়ারও মরেনি। সব ঠিক আছে।'

'তা আছে। মানুষের মত রোজ রোজ খাবার লাগে না বলেই বেঁচে আছে, নইলে কবে মরে ভূত হয়ে যেত। তুমি কি খাওয়ানোর মানুষ?' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'চলো, অনেক কাজ পড়ে আছে। এটার সঙ্গে বকবক করে লাভ নেই।'

আবার রেগে উঠল ভ্যাম্প। গালাগাল শুরু করল। আওয়াজে সাপটা নড়েচড়ে উঠতেই ভয় পেয়ে থেমে গেল।

জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওগুলোর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিচ্ছু খাওয়ায়নি ভ্যাম্প।

'খা,' রক্ত গরম করে রক্তচাটাকে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'এই শেষ। ম্যানাওয়ে পৌঁছার আগে আর পাবি না।'

'এত কাছে চলে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। বাতাস পেলে কালই পৌঁছে যাব।'

দুপুরের পর ভাটিয়াল বাতাস শুরু হলো, বাড়ল স্রোতের বেগ। দ্বীপটা চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটাও। লগি দিয়ে ঠেলে দ্বীপের গা থেকে নৌকাটাকে ছুটাল তিন গোয়েন্দা। দাঁড় বেয়ে এনে ফেলল মূল স্রোতে। পাল তুলে দিতেই তরতর করে ছুটে চলল নৌকা।

জ্বর ছেড়েছে, পেট ভরে খেয়েদেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে মুসা। মঞ্চে উঠে হাল ধরে বসল। গান ধরল গুনগুন করে।

সমস্তটা দিন নানারকম ভাবে ছেলেদের মন গলানোর চেষ্টা করল ভ্যাম্প। ফিরেও তাকাল না ওরা। একবার বিশ্বাস করেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বকাবাহ্যি করে কাহিল হয়ে খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ভ্যাম্প। বড় বড় হাই তুলছে, কিন্তু সাপের ভয়ে চোখ বন্ধ করছে না। ঘুমোলেই যদি সুযোগ পেয়ে তাকে গিলে ফেলে অ্যানাকোণ্ডা।

সাঁঝের বেলা নৌকা পাড়ে ভেড়ালো ছেলেরা। ঘাসে ঢাকা খানিকটা খোলা জায়গা, ক্যাম্প করল সেখানেই।

আগুন জ্বেলে খাবার গরম করে খেল। ভ্যাম্পকেও দিল।

ঠিক হলো, পালা করে পাহারা দেবে রাতে। ভ্যাম্পকে বিশ্বাস নেই। খাঁচার বেড়া খুলে বেরিয়ে আসাটা তেমন কঠিন কিছু না।

হুঁশিয়ার করল কিশোর, 'চুপ করে শুয়ে থাকো। শয়তানী করতে চাইলেই খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেব সাপটাকে।'

চোখের আগুনে তাকে ভস্ম করার জোর চেষ্টা চালাল ভ্যাম্প। তবে চুপ করে রইল।

সকালে উঠে নাস্তা সেরে আবার নৌকা ছাড়ল ওরা।

দুপুরের আগে নদীর পানির রঙ বদলে গেল, এতদিন ছিল বাদামী, হয়ে গেল কালো। তার মানে ওখানে আমাজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কালো নদী রিও নিগ্রো।

'আর দশ মাইল,' বলল কিশোর। নৌকার মুখ ঘোরাতে বলল মুসাকে।

আমাজন থেকে সরে এসে রিও নিগ্রোতে ঢুকল নৌকা। এগিয়ে চলল জঙ্গল শহর ম্যানাওয়ের দিকে। অনেক বছর আগে রবার চাষের স্বর্ণযুগে তৈরি হয়েছিল শহরটা, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হাজার মাইল দূরে। এখন হয়ে গেছে বড় বন্দর।

ছোট-বড় অসংখ্য জলযান দেখতে পেল ছেলেরা। মাল নিয়ে বড় বড় মালবাহী স্টীমার যায় উত্তর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ওগুলোর পাশে বিরাট বজরাটাকে নগণ্য লাগল। গ্লাসগো থেকে আসা একটা দানবীয় জাহাজের পাশে জেটিতে নৌকা বাঁধল ছেলেরা।

নানারকম জন্তু-জানোয়ার, আর বিশেষ করে অ্যানাকোণ্ডার খাঁচায় ডাকাতে

চেহারার বন্দি একজন মানুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকের। ভিড় করে দেখতে এল ওরা।

নৌকা পাহারায় রইল মুসা আর রবিন। কিশোর চলল থানায়।

থানার ইনচার্জকে সব খুলে বলল সে।

প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না ইন্সপেক্টর। শেষে বললেন, 'একটা কাজের কাজই করেছ। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, গাই ক্যাশার। কয়েকটা ডাকাতি আর খুনের মামলার আসামী, হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে পুলিশ। বছর দুই তার কোন খোঁজ পাইনি। শেষবার দেখা গিয়েছিল কোক্যামায়। লোক দিচ্ছি, নিয়ে যাও সঙ্গে। ধরে নিয়ে আসবে ব্যাটাকে।'

খাঁচা থেকে খুলে ভ্যাম্পের হাতে হাতকড়া পরাল পুলিশ।

স্টীমার অফিসে গেল এরপর কিশোর। জাহাজে নিজেদের জন্যে কেবিন আর জানোয়ারগুলোর জন্যে জায়গা ভাড়া করল।

জাহাজ ছাড়বে তিন দিন পরে।

এই কটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল তিন গোয়েন্দার। ভাল খাঁচা বানানো, ওগুলোতে জানোয়ারগুলোকে সরানো, জাহাজে তোলা, অনেক কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ ছাড়ল।

রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কালো নদীর কালো পানি দিয়ে ছুটে চলেছে জাহাজ।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাবছি, জানোয়ার ধরতে এরপর কোথায় যাব।'

'আদৌ যাওয়া হবে কিনা কে জানে। মা কি আর যেতে দেবে?'

'হবে না কেন?' রবিন বলল। 'ব্যবসা যখন, দেবে। তাছাড়া, এবার তো সাকসেসফুল হয়েছি আমরা।'

'বাবার কি অবস্থা, কে জানে?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাবা ভাল হলে যাওয়ার অসুবিধে হবে না। এরপর আফ্রিকা যাব আমরা।'

পাড়ের গভীর অরণ্যের দিকে চেয়ে নীরবে মাথা দোলাল শুধু কিশোর।

*****